পঞ্চদশ অধ্যায়

উনিশ শ' ছয় থেকে ছত্রিশ

উনিশ শ' ছয় থেকে ছত্রিশ—এ তিরিশ বছরের ইতিহাস মুসলমানদের আযাদী আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তবুও বলতে হবে এ তিনটি দশকে তারা ছিল আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে জর্জরিত এবং কখনো কখনো দেখতে পাই তাদের রাজনৈতিক মানস নৈরাশ্যে ঝিমিয়ে পড়েছে।

এ দশকত্রয়ের দুটি প্রান্তসীমা ছিল দুটি বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। ১৯০৬ সালে মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয়তার উন্মেষে আশার উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত এবং ছত্রিশে ভারত শাসন আইন (India Act of 1935) অনুযায়ী স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণে তৎপর। মাঝের সময়কালটুকু কেটেছে প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে দ্বন্দ্ব কলহে, আত্ম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতায়, ব্রিটিশ সরকারের কাছে মুসলমানদের আত্মপ্রত্যয় বিশ্লেষণে এবং তার সাথে সাথে চলেছে আযাদী আন্দোলনও।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বংগ বিভাগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্যে। কিন্তু বংগ বিভাগ যখন হলো এবং মুসলিম অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলের অবহেলিত মানুষের শিক্ষাদীক্ষা ও বৈষয়িক উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হলো, তখন এ বিভাগের তীব্র বিরোধিতা শুরু করলো গোটা হিন্দু সমাজ। তাদের এ অন্ধ বিরোধিতায় এ সত্যটিই উদঘাটিত হলো যে হিন্দু মুসলমান দুটি স্বতন্ত্র জাতি, তাদের আশাআকাঙ্খা, ধর্মকর্ম, জীবনের দৃষ্টিভংগী, সমাজ সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির গতিধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক। এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯০৬ সালে একটি শক্তিশালী মুসলিম প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে পৃথক নির্বাচনের দাবী সরকার সমীপে পেশ করা হয়। জাতীয় স্বাতন্ত্রের জন্যে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য অপরিহার্য বিধায় ১৯০৬ সালে 'মুসলিম লীগ' নামে ঢাকার বুকে মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—নতুন রাজনৈতিক ও জাতীয় চেতনার অবশ্যম্ভাবী ফল।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গালভরা বুলি ছিল এক-জাতীয়তাবাদের। কিন্তু বংগভংগ রদের জন্যে সমগ্র হিন্দুজাতির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন তাদের এক-

জাতীয়তাবাদের মুখোশ উন্মোচন করে দেয়। হিন্দু মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়ে পড়ে, পারস্পরিক তিক্ততা উত্তরোত্তর বর্ধিত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের রূপ ধারণ করে। পলাশীর বিয়োগান্ত নাটকের পর থেকে উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদ পর্যন্ত ইংরেজ কর্তৃক যে মুসলিম দলন চলেছিল, তাতে হিন্দুরা উল্লাসবোধ করতো এবং এটা একথারই প্রমাণ বহন করে যে হিন্দুরা ছিল ইংরেজদের একান্ত বশংবদ ও প্রিয়পাত্র। পক্ষান্তরে মুসলমানরা ছিল তাদের কাছে অবিশ্বাস্য ও শত্রু। কিন্তু বংগভংগ, পৃথক নির্বাচন প্রভৃতির দ্বারা তাদের মনে যখন এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশের মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে এবং তারা হয়েছে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, তখন হিন্দুদের আক্রোশ তাদের ব্রিটিশ প্রভুদের উপরেও পড়ে। তারপর শুরু হয় ব্রিটিশ বিরোধী সন্ত্রাসবাদ।

রাজা পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরী ১৯১১ সালে ভারত ভ্রমণে আসেন।তাঁদের আগমন উপলক্ষে দিল্লীতে বিরাট আড়ম্বরপূর্ণ এক দরবার অনুষ্ঠিত হয়। দরবার শেষে রাজা সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়ে ঘোষণা করলেন, ভারতের রাজধানী কোলকাতা থেকে স্থানান্তরিত হবে দিল্লীতে। পরের ঘোষণাটি অধিকতর বিস্ময়কর ও অপ্রত্যাশিত। তিনি ঘোষণা করেন যে, বংগভংগ রদ করা হলো। এ ছিল মুসলামানদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের চিরাচরিত মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। এতে মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধিতা তীব্রতর হয়ে উঠে।

পক্ষান্তরে বংগভংগ রদে হিন্দুরা আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ে। এর ফলে একদিকে যেমন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আদর্শিক ও রাজনৈতিক পার্থক্য ও দূরত্ব বাড়তে থাকে, তেমনি বাড়তে থাকে মুসলমানদের ব্রিটিশ বিরোধিতা। মুসলিম লীগের তিন দফা উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথম দফাতেই ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টির উল্লেখ। কিন্তু রাজা পঞ্চম জর্জের দ্বিতীয় ঘোষণাটি তাদের চিন্তাধারাকে প্রবাহিত করলো ভিন্ন খাতে। ১৯১২ সালে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংগঠনের উদ্দেশ্যকে প্রসারিত করার প্রস্তাব গৃহীত হলো। এ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। এ পরিবর্তিত প্রস্তাব লীগের সম্মুখে পূর্ণ আযাদী অর্জনে স্থির লক্ষ্যকে প্রতিষ্ঠিত করলো। ফলে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট হলো।

উল্লেখ্য যে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ লীগের উক্ত অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। তবে লীগের সংগঠন সম্পর্কে তাঁর মধ্যে তখনো কোন উৎসাহ উদ্দীপনা দেখতে পাওয়া যায়নি। লীগের প্রতি তাঁর অনীহা প্রদর্শনের কারণ এই ছিল যে, তখন পর্যন্ত তাঁর মনে এ ধারণা ছিল যে লীগের নীতি ছিল সম্প্রদায় কেন্দ্রিক। তিনি ছিলেন কংগ্রেসের একজন অত্যুৎসাহী সদস্য এবং বিশ্বাসী ছিলেন হিন্দু মুসলিম ঐক্যে। তিনি রাজনীতিতে দীক্ষা গ্রহণ করেন গোপাল কৃষ্ণ গোখেলের কাছে। গোখেল মন্তব্য করেছিলেন, "হিন্দু মুসলিম ঐক্যের দূত হওয়ার যোগ্যতা জিন্নাহ্র আছে।"

আনুষ্ঠানিকভাবে লীগের সদস্য হওয়াকে তিনি কংগ্রেসের সদস্য থাকার বিরোধী মনে করেননি বলে লীগেরও সদস্য হন। তাঁর একান্ত বাসনা ছিল লীগ ও কংগ্রেসের সদস্য থেকে তিনি হিন্দু মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করবেন। আপ্রাণ চেষ্টাও করেন তিনি। কিন্তু তাঁর অক্লান্ত মিলন প্রচেষ্টায় তিরি লক্ষ্য করেন যে, হিন্দু মুসলমানের মিলন ত দূরের কথা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মাধ্যমে তাদের স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাদের উভয়ের রাজনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পৃথক এবং তাদের কর্মধারাও পৃথক পৃথক খাতে প্রবহমান।

উনিশ শ' চৌদ্দতে প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ শুরু হলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই এ সময়ে ব্রিটিশকে সাহায্য করে। এ সময়ে হিন্দু মুসলিম মিলনের প্রচেষ্টা খুব জোরদার হয়। ১৯১৬ সালে কংগ্রেস–লীগের এক যুক্ত কমিটিতে লক্ষ্ণৌ চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তির দুটি ফল হয়েছিল। এক– এ চুক্তি পরবর্তীকালের খেলাফত আন্দোলন কালীন কংগ্রেস লীগ ঐক্যের পূর্বসূত্র চিহ্নিত করে। দুই– এ চুক্তির ভিতর দিয়ে একজাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস লীগের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ও গুরুত্ব স্বীকার করে নেয়। কংগ্রেস ভারতীয় আইন পরিষদের মোট নির্বাচিত সদস্যদের একতৃতীয়াংশ মুসলমানদেরকে দিতে রাজী হয়। বাংলাদেশে তারা পাবে শতকরা ৪০টি, পাঞ্জাবে ৫০টি, বিহারে ২৫টি, যুক্ত প্রদেশে ৩০টি, এর সাথে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা মেনে নিয়ে কংগ্রেস মুসলিম জাতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নেয়।

কিন্তু লক্ষ্ণৌ চুক্তির বিরুদ্ধে হিন্দুদের পক্ষ থেকে প্রবল বিরোধিতা শুরু হয় এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক হাংগামাও শুরু হয়।

এ জিনিসটি কয়েকবার লক্ষ্য করা হয়েছে যে, যখনই কোন কিছুর ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিলনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে তখনই সংখ্যাগুরু দল সাম্প্রদায়িক হাংগামার সূত্রপাত করে মিলন প্রচেষ্টাকে বানচাল করেছে।

এ কালের তিনটি ঘটনা ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। খেলাফত আন্দোলন, মোপলা বিদ্রোহ ও হিজরত আন্দোলন। তার পটভূমিকা বর্ণনা করাও প্রয়োজন বোধ করি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ব্রিটিশের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে। তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তারা আশা করেছিল ব্রিটিশ সরকার তাদের নিম্নতম দাবীসমূহ মেনে নিবে। ১৯১৭ সালে হাউস্ অব্ কমন্সে তদানীন্তন সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ যে ঘোষণা পাঠ করে শুনান, তাতে ভারত উপমহাদেশে একটি দায়িত্বশীল সরকারের ক্রমপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু ১৯১৯ সালে যে মন্টেগু চেমন্ ফোর্ড সংস্কার পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়, তা ছিল লক্ষ্ণৌ চুক্তির বিশ্লেষিত দাবীসমূহের পটভূমিতে খুবই অপ্রতুল। এ সালের আর একটি বিধিবদ্ধ আইন, যা বড়োলাট আইন বলে পরিচিত, ভারতীয়গণকে বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ করে। এ আইনে জুরীর পরামর্শ ব্যতিরেকেই রাষ্ট্রবিরোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার সরকারকে দেয়া হয়েছিল। ভারতে যে কোন আন্দোলন দমন করার জন্যেই যে এ আইন পাশ করা হয়েছিল, তা আর কারো বুঝতে বাকী রইলো না। যুদ্ধকালীন অকুণ্ঠ সমর্থনের এই পুরস্কার দেয়া হলো ভারতবাসীকে। এ আইন পাশ হলো ১৮ই মার্চ, গান্ধী তার প্রতিবাদে দেশব্যাপী হরতাল আহবান করলেন ৩০শে মার্চ। হরতাল করতে গিয়ে প্রচন্ড সংঘর্ষ হলো পাঞ্জাবে। তার ফলে নৃশংস হত্যাকান্ড অনুষ্ঠিত হলো জালিয়ানওয়ালাবাগে। জেনারেল ডায়ার নির্মমভাবে ১৬৫০ রাউন্ড গুলী চালিয়ে ৩৭৯ জনকে নিহত ও ১১৩৭ জনকে আহত করে এ দেশে ব্রিটিশ শাসনের এক অতি কলংকময় অধ্যায় সংযোজন করে।

খেলাফত আন্দোলন

এসব ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত খেলাফত আন্দোলন। তবে এ সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলে রাখা দরকার। ভারতীয় মুসলমানরা এ দেশের শাসনক্ষমতা হারিয়ে মনোবেদনা ও আত্মাভিমানে দিন কাটাচ্ছিল। তারা তাদের এ

মনোবেদনায় কিছুটা সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করেছিল তুরস্কের সুলতানকে অবলম্বন করে। তুরস্ক শুধু মুসলিম রাষ্ট্রমাত্র ছিলনা, বরঞ্চ তুরস্কের সুলতানকে মুসলিম জাহানের খলিফা ও মুসলিম জাহানের ঐক্যের প্রতীক মনে করা হতো। অবশ্য যতোদিন ভারতে মুগল সাম্রাজ্য শক্তিশালী ছিল, ততোদিন তুরস্কের সুলতানকে এ মর্যাদা দেয়া হয়নি। যাহোক, পরবর্তীকালে মুসলমানদের মধ্যে প্যানইসলামী চেতনা তুরস্ককে মুসলিম ঐক্যের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ব্রিটিশের বিপক্ষ দলে যোগদান করে। ভারতীয় মুসলমান আশা করেছিল, ব্রিটিশকে তাদের অকুণ্ঠ সমর্থনের কারণে তুরস্ককে কোন প্রকার শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে। লয়েড্ জর্জ সে ধরনের আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের ঐক্যপ্রতীক বিনষ্ট করাই ছিল ব্রিটিশের উদ্দেশ্য। তার জন্যেই লরেন্সকে পাঠানো হয় আরবদের মধ্যে আরব জাতীয়তার বিষাক্ত মন্ত্রপ্রচারক হিসাবে। মক্কার শেরিফ শরীফ হুসাইন হাশেমী লরেন্সের প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে 'আরবদের জাতীয় স্বাধীনতার' নামে বিশ্বমুসলিম ঐক্য উপেক্ষা করে মুসলমানদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ শুরু করে এবং এভাবে তুরস্কের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করে। ভাষাভিত্তিক সংকীর্ণ আঞ্চলিক জাতীয়তার বিষবাষ্পে তুরস্কের সুলতানাত তথা মুসলিম বিশ্বের ঐক্যপ্রতীক বিনষ্ট করাই ছিল ব্রিটিশের লক্ষ্য এবং তা ফলপ্রসূ হলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সম্মিলিত শক্তির জয় হলো এবং তারা যুদ্ধে জয়ী হবার সাথে সাথেই একটি গোপন চুক্তির মাধ্যমে বিরাট তুরস্ক সাম্রাজ্যকে বাঁদরের পিঠা বন্টনের ন্যায় ভাগ বন্টন করে ফেলে। ১৯১৯ সালের মে মাসে উস্মানী রাজধানীতে নামসর্বস্ব সুলতান রয়ে গেলো। আল্জিরিয়া থেকে বাহ্রাইন পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল খন্ডবিখন্ড করে ফ্রান্স, গ্রীস ও বৃটেনের মধ্যে বিতরণ করা হলো।

এভাবে উস্মানীয়া রাষ্ট্রকে খন্ডবিখন্ড করার কারণে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। মুসলিম নেতৃবৃন্দ ভারতের ভাইসরয়ের কাছে তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর এবং সাইয়েদ সুলায়মান নদ্ভী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের একটি প্রতিনিধি দল লন্ডন গমন করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকটে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করেন। প্রত্যুত্তরে বলা হলো যে, শুধু তুরস্কের ভূখন্ড ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চল তুরস্ককে দেয়া যাবে না। তার জন্যে তুরস্কের খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে ভারতে শুরু হয় প্রচন্ড খেলাফত আন্দোলন।

ভারতে শক্তিশালী খেলাফত কমিটি গঠিত হলো। মুসলমানদের দেড় শতাব্দী ব্যাপী পুঞ্জিভূত ব্যথা-বেদনা খেলাফত সংকটকে সম্মুখে রেখে প্রচন্ড বিক্ষোভের অগ্নিশিখা লেলিহান করে। মুসলিম মানসের জাগরণ প্রচেষ্টার পথিকৃৎ ছিলেন মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর। তিনি ছিলেন 'মুক্ত ভারতে মুক্ত ইসলাম' প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদিশারী। তিনি Comrade নামক একটি ইংরাজী পত্রিকার মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণ সঞ্চারে সচেষ্ট ছিলেন। খেলাফত আন্দোলনে সাড়া দেয়াকে তিনি প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য বলে উল্লেখ করেন।

কংগ্রেস ও কংগ্রেস সমর্থক জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ্ খেলাফত আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করলো। ১৯১৯ সালের ১০ই আগস্ট সারা দেশে খেলাফত দিবস পালনের আহবান জানানো হলো। সারাদেশে হরতাল, বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সভাসমিতির মাধ্যমে অভূতপূর্ব ও অপ্রতিহত প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হলো। এক মাসের মধ্যে বিশ হাজার মুসলমান কারাদন্ডের জন্যে নিজেদেরকে পেশ করলো। হাটে ঘাটে মাঠে, শহরে বন্দরে গ্রামেগঞ্জে মানুষের মুখে শুধু খেলাফত আন্দোলনের কথা এবং তার জন্যে যে কোন ত্যাগ ও কুরবানী করার প্রস্তুতি।

নভেম্বর মাসে দিল্লীতে খেলাফত কমিটির অধিবেশন শুরু হয়। মিঃ গান্ধী এতে যোগদান করেন। তিনি তার বক্তৃতায় ব্রিটিশ সরকারের সাথে 'অসহযোগিতার' নীতি অবলম্বনের পরামর্শ দেন।

১৯২০ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত খেলাফত কমিটির সম্মেলনে 'অসহযোগ আন্দোলন' (Non-Cooperation Movement) করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ তীব্রতর হতে থাকে।

আমি বাংলাদেশের একটি প্রত্যন্ত পল্লীর বিদ্যালয়ে ১৯২২ সালে সর্বপ্রথম হাতেখড়ি গ্রহণ করি। যতোটা মনে পড়ে, সেই শৈশবকালে দেখেছি ছাত্র শিক্ষক, চাষীমজুর ও ইতরভদ্রের মধ্যে খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংকল্পে আপামর জনসাধারণ সুদৃঢ় ও অবিচল। যে কোন ত্যাগ স্বীকার এবং হাসিমুখে জীবন দান করতে সদাপ্রস্তুত।

কিন্তু এতকিছুর পরেও এ প্রাণবন্ত খেলাফত আন্দোলন অপমৃত্যুর সম্মুখীন হয়। তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে ইংরেজদের হাত হতে বহু অঞ্চল পুনর্দখল করেন। তুর্কীজাতিকে করেন ঐক্যবদ্ধ এবং তুরস্ককে পুনরায় গৌরবের মর্যাদায় ভূষিত করেন। কিন্তু ক্ষমতা লাভ করার সাথে সাথেই ১৯২২ সালের নভেম্বরে সুলতান মুহাম্মদ হাশেমকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে তুরস্কের সর্বশেষ ও কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ খলিফা সুলতান আবদুল মজিদকে দেশ থেকে নির্বাসিত করে খেলাফতের উচ্ছেদ সাধন করেন। ভারতে খেলাফত আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মুসলমানদের মধ্যে নেমে আসে হতাশা। ডক্টর মঈনুল হক বলেন, "ভারত উপমহাদেশে খেলাফত আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট মুসলমানদের প্রাণে চরম আঘাত করে কামাল আতাতুর্কের পদক্ষেপ। সকলের চেয়ে বেশী প্রাণে আঘাত পান মওলানা মুহাম্মদ আলী। কারণ তিনিই ছিলেন এ আন্দোলনের উৎস ও প্রাণকেন্দ্র। যে শরীফ হুসাইন ছিল ব্রিটিশের তাবেদার এবং যে তার কার্যকলাপের দ্বারা মুসলিম বিশ্বের নিকটে অপ্রিয় হ'য়ে পড়েছিল, সে এখন খেলাফতের দাবীদার বলে ঘোষণা করলো। এ ব্যাপারে ব্রিটিশ তাকে কোন প্রকার সাহায্য করলোনা। ওদিকে ওহাবী নেতা ইবনে সউদের অভিযান ব্যাহত করার শক্তিও তার হলোনা। বছর শেষ হবার সাথে সাথেই ইবনে সউদ মক্কা ও তায়েফের উপর অভিযান চালিয়ে তা হস্তগত করেন এবং এভাবে হেজাজের অধিকাংশ অঞ্চলের উপরে তিনি অধিকার বিস্তার করেন।"

—(Dr. Moyenal Huq, History of Freedom Movement Vol.-III, Part 1; আবুল আফাক— একটি জীবন, একটি চিন্তাধারা, একটি আন্দোলন– (উর্দুগ্রন্থ), পৃঃ ৬৯)

হিজরত আন্দোলন

খেলাফত আন্দোলনের সময়ে ভারতে হিজরত আন্দোলন শুরু হয়। মওলানা আবুল কালাম আজাদ রাঁচী জেল থেকে মুক্তিলাভের পর হিজরত আন্দোলন শুরু করেন। আলেমগণ ফতোয়া দেন যে ভারত দারুল হরব এবং এখান থেকে হিজরত করে কোন দারুল ইসলামে যেতে হবে। আফগানিস্তানের বাদশাহ আমীর আমানুল্লাহ্ খান এক জনসভায় ঘোষণা করেন যে, "ভারতীয় মুসলমানগণ

হিজরত করে অবশ্যই আমাদের দেশে আসতে পারেন।" মওলানা আজাদের প্রস্তাবে একেবারে চক্ষু বন্ধ করে মুসলমানগণ হিজরতের জন্যে বদ্ধপরিকর হয়। দিল্লীতে হিজরত কমিটি প্রতিষ্ঠিত হলো এবং যথারীতি অফিস খোলা হলো। এ আন্দোলনের ফলে, যার প্রেরণাদানকারী ছিলেন স্বয়ং মওলানা আবুল কালাম আজাদ, হাজার হাজার মুসলমান তাদের যথাসর্বস্ব বিক্রি করে আফগানিস্তানের পথে রওয়ানা হলো। ১৯২০ সালের কেবলমাত্র আগস্ট মাসেই আঠারো হাজার লোক হিজরত করে চলে যায়। পাঁচ লক্ষ থেকে বিশ লক্ষ মুসলমান এ আন্দোলনের ফলে বাস্তুহারা হয়েছে এবং তাদের ভাগ্যে জুটেছে বর্ণনাতীত দুর্গতি।

কিন্তু এ আন্দোলনের মূলে ছিল নিছক একটি ঝোঁকপ্রবণতা। কোন একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছাড়াই এবং হিজরতের ফলাফল বিচার বিশ্লেষণ না করেই এ আন্দোলনে ঝাঁপ দেয়া হয়েছিল।

আলী সুফিয়ান আফাকী বলেন, "মওলানা মওদূদী এবং তাঁর ভাই হিজরত করতে মনস্থ করেন। হিজরত কমিটির সেক্রেটারী মিঃ তাজাম্মল হোসেন ছিলেন তাঁদের আত্মীয়। তিনি ভ্রাতৃদ্বয়কে হিজরতের জন্যে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু আলোচনায় জানা গেল যে হিজরত কমিটির এ ব্যাপারে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই। দলে দলে লোক আফগানিস্তানে চলে গেলেও আফগান সরকারের সাথে এ ব্যাপারে কোন কথা বলা হয়নি। মুফতী কেফায়েতুল্লাহ্ ও মওলানা আহমদ সাঈদ এ ব্যাপারে ছিলেন অগ্রগামী। মওদূদী সাহেব এ দুজনের সাথে দেখা করে একটি পরিকল্পনাহীন আন্দোলনের ত্রুটি বিচ্যুতির প্রতি অংগুলি সংকেত করেন। তাঁরা ত্রুটি স্বীকার করার পর মওদূদী সাহেবকে একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্যে অনুরোধ করেন। মওদূদী সাহেব বলেন যে, সর্বপ্রথম আফগান সরকারের নিকটে শুনতে হবে যে তাঁরা হিন্দুস্তান থেকে হিজরতকারীদের পুনর্বাসনের জন্যে রাজী আছেন কিনা এবং পুনর্বাসনের পন্থাই বা কি হবে। আফগান রাষ্ট্রদূতের সংগে আলাপ করা হলো। তিনি বলেন যে 'তাঁর সরকার বর্তমানে খুবই বিব্রত বোধ করছেন। যাঁরা আফগানিস্তানে চলে গেছে তাদেরকে ফেরৎ পাঠাতে অবশ্য সরকার দ্বিধাবোধ করছেন। কিন্তু তথাপি তাদের বোঝা বহন করা সরকারের সাধ্যের অতীত।' এভাবে হিজরত প্রশ্নটির এখানেই সমাপ্তি ঘটে।"

—(আবুল আফাকঃ 'একটি জীবন, একটি চিন্তাধারা একটি আন্দোলন', পৃঃ ৭৭-৭৮)।

এভাবে ভারতে খেলাফত আন্দোলন ও হিজরত আন্দোলনের প্রবল গতিবেগ হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেল এবং দুটি আন্দোলনই ব্যর্থ হলো। এ ব্যর্থতার জন্যে ভারতীয় মুসলমানরা দায়ী ছিলনা মোটেই। তুরস্কের জন্যেই তাদের এ ব্যর্থতা। কামালপাশা শুধু খেলাফতেরই অবসান করেননি। দু'বছর পর খলিফাকেও নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন। ভারতে খেলাফত আন্দোলনকে উপলক্ষ করে যে লেলিহান শিখা জ্বলে উঠে ভারত সরকারকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল তা অনেকটা ধূম্রজালের ভিতর দিয়েই নিভে গেল মুসলমানদের আশা ও উদ্দীপনাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে।

এ আন্দোলনের ভিতর দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে ঐক্যপ্রচেষ্টা চলছিল, আন্দোলনের ব্যর্থতার সাথে তাও ব্যর্থ হ'য়ে গেল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আবার শুরু হলো রক্তাক্ত সংঘর্ষ। খেলাফত আন্দোলনে গান্ধীর সহযোগিতার মধ্যে আন্তরিকতা থাক বা না থাক, এ আন্দোলনকে মন দিয়ে সমর্থন কংগ্রেসের অনেক হিন্দু সদস্যই করতে পারেননি। তাঁদের অনেকের মনেই এ প্রশ্ন ছিল যে মুসলমানদের খেলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তাদের কি লাভ! তাই খেলাফত আন্দোলন তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ প্রবণতা কিছু দিনের জন্যে দাবিয়ে রাখলেও খেলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার পর তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। মসজিদের সামনে জোরজবরদস্তি বাজনা বাজানোর উপলক্ষ করে, দাংগা-হাংগামার সূত্রপাত করলো তারা এবং এ দাংগা রক্তাক্ত সংঘর্ষের রূপ ধারণ করে চারদিকে বিস্তার লাভ করতে লাগলো। সম্প্রদায়গত পার্থক্যটা তাদের মধ্যে স্পষ্টতর হতে লাগলো। বিগত দেড় শতাব্দীর অবহেলিত ও পশ্চাদপদ মুসলমান জীবনক্ষেত্রে কোন সুযোগ সুবিধা চাইতে গেলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ও শক্তিশালী সম্প্রদায়ের সাথে বিরোধ হ'য়ে পড়তো অপরিহার্য। বাংলার হিন্দু জমিদারগণ এবং পাঞ্জাবের ব্যবসায়ীগণ এ সময়ে তাদের মুসলমান প্রজা ও খাতকদের উপর চরম নির্যাতন শুরু করেছিল। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন মানুষের মনে যে বিক্ষোভ প্রকাশের প্রেরণা জাগিয়েছিল, আন্দোলন দুটি স্তব্ধ হ'য়ে যাওয়ার পর সে বিক্ষোভ প্রেরণা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে প্রকাশ লাভ করলো।

মোপলা বিদ্রোহ

খেলাফত আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত তৎকালীন মোপলা বিদ্রোহ। এই মোপলা বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ শাসকদের হিংস্ররূপ যেমন একদিকে পরিস্ফুট হয়েছে, তেমনি মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদেরও হিংসাত্মক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

গ্রন্থের প্রারম্ভে মোপলাদের কিছু পরিচয় দেয়া হয়েছে। তারা ছিল দাক্ষিণাত্যের মালাবার অঞ্চলের মুসলমান অধিবাসী, তারা নিজেদেরকে আরব বণিকদের বংশসম্ভূত বলে দাবী করে। তারা ছিল অত্যন্ত সাহসী ও ধর্মভীরু। তারা ইংরেজদের দ্বারা শোষিত নিষ্পেষিত হওয়ার কারণে ১৮৭৩, ১৮৮৫, ১৮৯৪ এবং ১৮৯৬ সালে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফলে ব্রিটিশদের হাতে বার বার নির্যাতিত হয়। চাষ ও মৎস্য ব্যবসা ছিল তাদের প্রধান উপজীবিকা। শিক্ষাদীক্ষায় তারা ছিল অনগ্রসর এবং হিন্দু জমিদার, মহাজন ও তহসিলদার তাদের উপর চরম অত্যাচার উৎপীড়ন করতো। ব্রিটিশ শাসকদের কাছে আবেদন নিবেদন করেও তারা কোন ফল পায়নি। অতএব তাদের নির্যাতনের কাহিনী দীর্ঘদিনের। ব্রিটিশ ও হিন্দু জমিদার মহাজনের নিষ্পেষণে তারা যুগ যুগ ধরে ধুঁকে ধুঁকে মরছিল। তারপর বিংশতি শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষে ভারতে শুরু হলো খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন। এ আন্দোলনের ঢেউ মালাবারেও গিয়ে পৌঁছলো। আগেই বলা হয়েছে মোপলাগণ ছিল স্বাধীনচেতা, সাহসী ও ধর্মভীরু। ইসলামী খেলাফতের পুনরুদ্ধার ও সেইসংগে ভারতে স্বাধীনতা অর্জনের ফলে তাদের দীর্ঘদিনের নির্যাতন নিষ্পেষণের অবসান হবে মনে করে তারাও প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে। তারপরই তাদের সংঘর্ষ শুরু হয় শাসকদের বিরুদ্ধে। প্রতিবেশী হিন্দু জনসাধারণ তাদের দমন করার কাজে সর্বতোভাবে সাহায্য করে শাসকশ্রেণীকে। ফলে মোপলাদেরকে একসংগে শাসকগোষ্ঠী ও হিন্দুসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়।

মোপলা দমন করতে গিয়ে ব্রিটিশ সরকার যে বর্বরতা ও নৃশংসতা প্রদর্শন করেছিল, সে লোমহর্ষক ও মর্মন্তুদ কাহিনী বর্ণনা করার ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাদের উপর অত্যাচার নির্যাতন চলাকালে সরকার সমগ্র মালাবারে জনসভার অনুষ্ঠান, বাইর থেকে সংবাদ ও সংবাদপত্রের প্রবেশ এবং মালাবার থেকে

বাইরে বিনা সেন্সারে সংবাদাদি, টেলিগ্রাম ও পত্রাদি প্রেরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। মালাবারকে এক লৌহ যবনিকার অন্তরালে রাখা হয়। তবুও যদি কোন প্রকারে তাদের নির্যাতনের কাহিনী বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং বহির্জগতের মানুষ বিশেষ করে মুসলমান তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে, তার জন্যে মোপলাদের বিরুদ্ধেই স্বার্থান্ধ মহল তীব্র প্রচারণা শুরু করে। সেসব প্রচারণা ছিল অমূলক, বানোয়াট ও কল্পনাপ্রসূত। ১৯২২ সালে সাহরানপুর ও অমৃতশহর থেকে হিন্দুদের দ্বারা দু'খানি প্রচার পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

অমৃতশহর থেকে প্রকাশিত 'দাস্তানে জুলুম' শীর্ষক পুস্তিকায় মোপলাদের পক্ষ থেকে হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার–কাহিনী বর্ণনা করে হিন্দু সম্প্রদায়কে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, হিন্দু নারী হরণ, বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিতকরণ প্রভৃতি অভিযোগ করা হয় মোপলাদের বিরুদ্ধে। বিবরণে বলা হয়েছে যে—উৎপীড়নের শিকার যদি হিন্দু পুরুষ হয় তাহলে তাকে প্রথমতঃ গোসল করিয়ে তার মুসলমানী ধরনে চুল কেটে দেয়া হয় অতঃপর তাকে মসজিদে নিয়ে কালেমা পাঠ করতে বাধ্য করা হয়, খৎনা করানো হয় এবং মুসলমানী পোষাক পরিধান করানো হয়। মহিলা হলে শুধু তাকে এক ধরনের রঙিন মোপলা পোষাক পরিধান করানো হয় এবং এক ধরনের কানবালা পরিয়ে দেয়া হয়।

সাহরানপুর থেকে প্রকাশিত 'মালাবার কি খুনী দাস্তান' পুস্তিকায় বলা হয়েছে যে, মোপলাগণ প্রতিবেশী হিন্দুদেরকে খেলাফত আন্দোলনে যোগদানের আহবান জানায়। যোগদান করলে ভালো, নচেৎ অস্বীকারকারীকে মোপলাদের ঘরে আবদ্ধ করে তাকে বলপ্রয়োগে গোমাংস ভক্ষণ করানো হয়। অতঃপর তার আত্মীয় স্বজনকে তার সম্মুখে হত্যা করা হয়। এতেও রাজী না হলে তাকে হত্যা করে তার খন্ডবিখন্ড মৃতদেহ কোন কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয় এবং তার বাড়ীঘর ভস্মীভূত করা হয়।

একদিকে যেমন হিন্দু–মুসলিম মিলনের প্রচেষ্টা চলছিল, হিন্দু–মুসলিমের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের মনমানস তৈরীর কাজ চলছিল, অপরদিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায়কে ক্ষিপ্ত করে শুধু খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন থেকেই তাদেরকে নিবৃত্ত করা হচ্ছিল না, বরং সারাদেশে পাইকারী হারে

মুসলিম নিধনযজ্ঞের আহবান জানানো হচ্ছিল। স্বাধীনতা অর্জন অপেক্ষা মুসলিম নিধন একশ্রেণীর লোকের কাছে অধিক প্রিয় ছিল। তাই তারা কাল্পনিক কাহিনী প্রচার করে সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া বিষাক্ত করে তোলে, যার ফলে নতুন আকারে ভারতব্যাপী দাংগাহাংগামার সূত্রপাত হতে থাকে।

এসব মারাত্মক প্রচারণা খেলাফত আন্দোলনকারী মুসলমানদের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। কেন্দ্রীয় খেলাফত কমিটি মোপলাদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্যে একটি কমিটি নিয়োগ করে পাঠান এবং তারা যে রিপোর্ট পেশ করেন তাতে মোপলা বিদ্রোহের জন্যে স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদেরকে প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ দায়ী করেন। তারা বলেন যে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও শান্ত ছিল এবং বিদ্রোহের কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হয়নি। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের ন্যায় মোপলা মুসলমানগণও খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করে এবং স্থানীয় সরকার তা কঠোর হস্তে দমন করার জন্যে উঠেপড়ে লাগে। পুলিশের বর্বরতা তাদেরকে বিদ্রোহ করতে বাধ্য করে। সংঘর্ষের সূচনা এভাবে হয় যে, স্থানীয় খেলাফত কমিটির সেক্রেটারীকে পুলিশ গ্রেফতার করে একটি গাছের সাথে বেঁধে রাখে। অতঃপর তার স্ত্রীকে তাঁর সম্মুখে এনে বিবস্ত্র করা হয় এবং তিনি অসহায়ের ন্যায় সেদিকে তাকিয়ে থাকেন। পুলিশের এমন ধরনের অশ্লীল আচরণ আদিম যুগের বর্বরতাকেও ম্লান করে দেয়। তারপর তুচ্ছ অপরাধের জন্যে মোপলাদের জনৈক শ্রদ্ধেয় পীরের মুখে একজন পুলিশ কনস্টেবল চপেটাঘাত করে। অতঃপর অন্য একজন খেলাফত কর্মীকে অস্ত্র নির্মাণের কল্পিত অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। অবশেষে পুলিশ মোপলাদের বাড়ীঘরের উপর চড়াও হয়, তাদের যাবতীয় জিনিসপত্র লুণ্ঠন করে এবং কোথাও বাড়ীর লোকজনের উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। এতেও নিরস্ত্র না হয়ে তারা মোপলাদের উপর বেপরোয়া গুলীবর্ষণ করে। মোপলাগণ স্বভাবতঃই ছিল স্বাধীনচেতা, সাহসী ও বীর যোদ্ধা। তাদের উপর যখন এরূপ নির্মম অত্যাচার চালানো হয়, তখন তারা মরণপণ করে পুলিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত সংগ্রামের জন্যে বদ্ধপরিকর হয়। অতঃপর যে সংগ্রাম শুরু হয়, সে সংগ্রামে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মিলিত শক্তি পরাজয় বরণ করে এবং কর্মস্থল থেকে বিতাড়িত হয়। তারা বহু অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে পলায়ন করে। অতঃপর পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে মোপলাদের আয়ত্তাধীন হয়। এযাবত হিন্দুদের সাথে

তাদের সম্পর্ক ছিল ভালো। উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে মোপলাগণ হিন্দুদের জীবন ও ধনসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। ১৯২১ সালের আগস্ট মাসে মোপলাগণ দস্তুরমত স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বিদ্রোহ শুরু হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই মোপলাগণ ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে এরনা এবং ওয়ালুভানাদ নামক দুটি বৃহৎ তালুক ছিনিয়ে নিয়ে সেখানে একটি স্বাধীন খেলাফত রাজ্য স্থাপন করে।

দু'সপ্তাহ পরে ব্রিটিশ সরকার মালাবারে শত শত সৈন্য, ছোটবড়ো ট্যাংক, কামান, বোমা, কয়েকখানি গানবোট এবং রণপোত প্রেরণ করে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে যেন কোন বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে এক মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। প্রথম সংগ্রামের সময় পুলিশের ন্যায় কয়েকজন অত্যাচারী জমিদার মহাজন জনতার রুদ্ররোষে পড়ে প্রাণ হারায়। ব্রিটিশ সরকার একে সম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে হিন্দুদেরকে মোপলাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। তখন হিন্দু জনসাধারণ ও জমিদার মহাজন সৈন্য ও পুলিশের সহায়তায় এগিয়ে আসে। হিন্দুদের অধিকাংশই মোপলাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি শুরু করে এবং অন্যায়ভাবে তাদেরকে ধরিয়ে দিতে থাকে। ফলে ব্রিটিশ এবং হিন্দু উভয়ের বিরুদ্ধেই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। কিন্তু হতভাগ্য মোপলাগণ বিরাট সুসংহত ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে কতক্ষণই বা লড়তে পারে? ভারত থেকে আর্যসমাজের শত শত স্বেচ্ছাসেবক সাহায্য বিতরণের নাম করে মালাবারে গিয়ে পুলিশ ও সৈন্যদেরকে নানাভাবে সাহায্য করতে থাকে।

মোপলাগণ অসীম সাহসিকতার সাথে একমাস কাল ব্রিটিশ ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম চালায়, সরকার মোপলা এলাকাসমূহের উপর আকাশ থেকে বোমা, রণতরী ও কামান থেকে নির্বিচারে গোলাবর্ষণ করে প্রায় দশ হাজার নরনারীর প্রাণনাশ করে, তাদের বাড়ীঘর, দোকান পাট ও ক্ষেতখামার ধ্বংস্তূপে পরিণত করে। তারপর হিন্দু জনসাধারণের সহায়তায় শুরু হয় পাইকারী হারে ধরপাকড়, পৈশাচিক অত্যাচার ও নির্যাতন। সরকারের পৈশাচিকতা ও বর্বরতার দৃষ্টান্ত একটি ঘটনার দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রায় একশ' জন বিশিষ্ট মোপলা নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে একটি মালগাড়ীতে বোঝাই করা হয় এবং দরজা বন্ধ করে তাদেরকে কালিকট প্রেরণ করা হয়। গন্তব্যস্থানে দরজা খোলা হলে দেখা গেল ষাটজন মৃত্যুবরণ করেছে এবং

অবশিষ্টজন মুমূর্ষু অবস্থায় রয়েছে। তাদের মৃতদেহের প্রতিও কোন সম্মান প্রদর্শন করা হয়নি, মানুষের প্রতি মানুষের এ ধরনের পৈশাচিক ও নৃশংস ব্যবহার সভ্যযুগে ত দূরের কথা আদিম যুগের ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ ও সৈন্যদের অত্যাচার নির্যাতনের পর যারা বেঁচে রইলো তাদের বিচার শুরু হলো। প্রায় বিশ হাজার মোপলা নরনারীকে গ্রেফতার করা হয়। জেল হাজতেও এদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। তাদের বিচারের জন্যে সরকার স্পেশাল কোর্ট গঠন করে। বাইরে থেকে কোন আইনজীবীকে মালাবারে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি বলে হতভাগ্য মোপলাগণ আত্মপক্ষ সমর্থনেরও সুযোগ পায়নি। বিচার চলাকালে বিচারাধীন আসামীদের ঘরে ঘরে অন্নবস্ত্রের হাহাকার শুরু হয়। অন্নাভাবে বহু নরনারী ও শিশু মৃত্যুবরণ করে। এ সময়ে উৎপীড়িতের মর্মন্তুদ হাহাকার ও ক্রন্দন রোলে মালাবারের আকাশ বাতাস ধ্বনিত ও মথিত হয়। প্রায় এক হাজার লোকের প্রাণদন্ড হয়। যাবজ্জীবন কারাদন্ড, দীর্ঘমেয়াদী সশ্রম কারাদন্ড প্রাপ্ত ও দ্বীপান্তরিত মোপলার সংখ্যা দু'হাজারের উপর। অতি অল্প সংখ্যক মোপলাকে খালাস দেয়া হয়। পাঁচ থেকে দশ বছর সশ্রম কারাদন্ড লাভ করেছিল প্রায় আট হাজার মোপলা। অবশিষ্টদের মধ্যে কারও কারাদন্ড ছয় মাসের কম ছিলনা। উপদ্রুত এলাকাসমূহের মসজিদগুলির প্রায় সকল ইমামই রাজদ্রোহিতায় অভিযুক্ত হন। এভাবে মসজিদগুলিকেও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হয়। দন্ডপ্রাপ্ত মোপলাগণ দ্বীপান্তরে কয়েক বৎসর বর্ণনাতীত দুঃখকষ্ট ভোগ করার পর সরকার তাদের পরিবারবর্গকে আন্দামান গিয়ে তাদের সংগে বসবাসের অনুমতি দেয়। এভাবে মালাবার থেকে মোপলাদের একেবারে প্রায় উচ্ছেদ করে ব্রিটিশ সরকার আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

ভারতের খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ইতিহাসে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক মোপলাদের উপর অত্যাচার নির্যাতনের কাহিনী সর্বাপেক্ষা মর্মন্তুদ ও হৃদয়স্পর্শী। গান্ধী ও কংগ্রেস এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকা পালন করে।

খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল প্লাবনে সে সময়ে মুসলিম জীবন্মৃত অবস্থায় ছিল এবং তাদের ক্ষীণকণ্ঠের আওয়াজ ব্রিটিশ সরকারের কর্ণকুহরে পৌছায়নি। বহু কষ্টে একমাত্র খেলাফত কমিটি অসহায় মোপলাদের কিছু

সাহায্যদান করতে পেরেছিল। নতুবা আরও বহু মোপলা নরনারী ও শিশু অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো। মোপলাদের প্রতি কংগ্রেসের আচরণে কংগ্রেসের বহু মুসলিম সদস্য বেদনাবোধ করে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। তাদের ধারণা মোপলাদের উপর নির্যাতনের প্রতি কংগ্রেসের সমর্থন ছিল বলেই কংগ্রেস নীরবতা অবলম্বন করে।

ব্রিটিশ সরকার ও হিন্দু মুসলিমকে পাশাপাশি রেখে বিগত কয়েক শতাব্দীর ভারতের ইতিহাস আলোচনা করে একথাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ ও হিন্দুসম্প্রদায় মুসলমানদের পরম শত্রুরূপে তাদের ভূমিকা পালন করতে কোন দিক দিয়ে ত্রুটি করেনি। এ উপমহাদেশ থেকে মুসলিম জাতির উচ্ছেদ সাধনই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। পরবর্তী ইতিহাস আলোচনায় এ সত্য অধিকতর সুস্পষ্ট হবে।

(Muslim Separatism in India, Abdul Hamid এবং আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, মুহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ দ্রষ্টব্য)।

চরম নৃশংসতার সাথে মোপলা বিদ্রোহ দমন, খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং মোপলাদের প্রতি কংগ্রেস ও গান্ধীর সম্পূর্ণ উদাসীনতা হিন্দুমুসলিম সম্পর্কে পুনরায় ফাটল সৃষ্টি করে। ১৯২৪ সালে মিঃ গান্ধী কর্তৃক প্রেরিত ডাঃ মাহমুদ মালাবারের হিন্দুসম্প্রদায়ের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গান্ধীকে যে রিপোর্ট দেন তাতে বলা হয় যে মোপলাদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের অভিযোগ অতিমাত্রায় অতিরঞ্জিত। হিন্দুদের বিরুদ্ধেও মোপলাদের অভিযোগ আছে। হিন্দুদেরকে বলপ্রয়োগে মুসলমান করার অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। তদুত্তরে গান্ধী বলেন, "প্রকৃত সত্য কারোই জানা নেই।"

—(The Indian Quarterly Register, 1924, Vol. 1, No. 2, p. 645; Muslim Separatism in India, A Hamid. p. 160)

গান্ধীর উপরোক্ত উক্তিতে এ কথারই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মুসলমানদের কোন কথাই তাঁর বিশ্বাস্য নয় এবং হিন্দু যা কিছুই বলুক তা তিনি বেদবাক্যরূপে গ্রহণ করতে রাজী।

এসব দুঃখজনক ঘটনার পর যা ঘটলো, তা অধিকতর দুঃখজনক। ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুলতানে মহররমকে কেন্দ্র করে হিন্দুরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়। পরের বছর অবস্থার চরম অবনতি ঘটে সাহরানপুরে যেখান

থেকে—আগের বছর 'মালাবার কি খুনী দাস্তান' শীর্ষক পুস্তিকা বিতরণের মাধ্যমে হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেয়া হচ্ছিল। সাহরানপুরের এ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে ৩০০ জন নিহত হয় এবং তার অধিকাংশ ছিল মুসলমান। ১৯২৪ সালে বিভিন্ন স্থানে ১৮টি দাংগাহাংগামা সংঘটিত হয়। এ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দ্রুত গতিতে বিহার ও বাংলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং ১৯২৬ সাল পর্যন্ত ব্যাপক আকার ধারণ করে।

ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের উপর সুপরিকল্পিত হামলা

ভারতীয় মুসলিম লীগ ক্রমশঃই তাদের জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলছিল। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে তারা জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে আগেই পিছিয়ে পড়েছিল। সারাদেশে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাংগাহাংগামার সময় পুলিশ সাহায্যপুষ্ট হিন্দুদের সাথে তারা পেরে উঠছিল না। অতএব হাংগামায় মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য সাহায্য করাও তাদের সাধ্যের অতীত ছিল। এদিকে অহিংসাবাদী ও সাম্প্রদায়িক মিলনে আস্থাবান বহু কংগ্রেসী সদস্য দাংগা-হাংগামায় উস্কানী দিতে থাকায় কংগ্রেসও মুসলমানদের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়ে পড়ে। মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক মিলনের আশায় অতিরিক্ত উদারতা প্রদর্শন করতে গিয়ে ইসলামের চিরাচরিত নীতি ভংগ করে। আর্যসমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে তারা দিল্লী জামে মসজিদের পবিত্র মিম্বর থেকে বক্তৃতা করার অনুমতি প্রদান করে। মসজিদের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করে তাঁকে তথা হিন্দুসমাজকে মুসলমানরা যে অভূতপূর্ব উদারতা প্রদর্শন করলো তার প্রতিদান স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এমনভাবে দিলেন যে তা বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাসে এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে অটুট রইলো।

উল্লেখ্য যে এই আর্যসমাজী নেতা কংগ্রেসেরও একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেন। লাহোর জেলে থাকাকালীন পাঞ্জাবের জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর সাথে তাঁর গোপন শলাপরামর্শ হয় এবং মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই মুক্তিলাভ করেন। জেল থেকে মুক্তিলাভ করেই তিনি মুসলমানদেরকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করার সংকল্প প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করে তাদেরকে এক নতুন অস্পৃশ্য নিম্নজাতিতে পরিণত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এভাবে মুসলমান জাতিকে একটা

অপবিত্র জাতির পর্যায়ে ঠেলে দিবার প্রচেষ্টায় তিনি মেতে উঠলেন। গুরগাও, আলোয়ার, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানে বহু সংখ্যক অশিক্ষিত মুসলমানকে নানা প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শন করে ধর্মান্তরিত করা হতে থাকে। ধর্মান্তরের পূর্বে মুসলমানদেরকে গোবরের পানি খেতে এবং গোবর পানিতে আপাদমস্তক ধুয়ে অবগাহন করতে বাধ্য করা হতো। বলপ্রয়োগে এভাবে নিরীহ ও নিরক্ষর মুসলমানদেরকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করার কাজ পূর্ণউদ্যমে চলতে লাগলো।

মুসলমান এবং তাদের ধর্মের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের কোনকালেই কোন শ্রদ্ধার মনোভাব ছিলনা। নতুবা ইচ্ছা করলে এ ধর্মীয় উৎপীড়ন তারা অনায়াসেই বন্ধ করতে পারতো। কিন্তু তারা সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করে রইলো। আর্যসমাজীদের এ অশুভ তৎপরতা, (সম্ভবতঃ কতিপয় শক্তিশালী ইংরেজ রাজকর্মচারীর ইংগিতে) মুসলমানদেরকে এতখানি বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করে তুলেছিল যে, জনৈক আবদুর রশীদ প্রকাশ্য দিবালোকে শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করে এ অশুভ তৎপরতার সমাপ্তি ঘটায়। বিচারে এই অজ্ঞাতকুলশীল আবদুর রশীদের প্রাণদন্ড হলে সে হাসিমুখে ফাঁসিমঞ্চে আরোহণ করলো।

এ ঘটনার পর স্বয়ং গান্ধীজি প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্মের প্রতি কটূক্তি করা শুরু করেন। তিনি প্রকাশ্যে জনসভায় বলতে থাকেন, "ইসলাম অন্য ধর্মাবলম্বীকে হত্যা করার মন্ত্রে দীক্ষা দেয় এবং এটাকে মুসলমানরা মনে করে পরকালের মুক্তির উপায়।"

গান্ধীর উপরোক্ত উক্তিতে মুসলিম ভারত মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। মওলানা মুহাম্মদ আলী দিল্লীর জামে মসজিদে একদা বক্তৃতা প্রসঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, "গান্ধীজির এ উক্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া দরকার। কারণ তাঁর এ উক্তিতে ইসলামের পবিত্র ও মহান জেহাদের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে।"

অতঃপর মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী "আল জিহাদু ফিল্ ইসলাম" নামক একখানি অতীব যুক্তিপূর্ণ প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থে তিনি ইসলামের মূলনীতি, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, ইসলামী যুদ্ধ ও সন্ধি, আন্তর্জাতিক নীতি ও সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে বিশদ পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন এবং ইসলাম ও ইসলামী জেহাদ সম্পর্কে গান্ধীজি তাঁর উক্তির দ্বারা যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করেন তা খন্ডন করা হয়।

এ গ্রন্থটি সম্পর্কে কিছু কথা পাঠকবর্গের গোচরীভূত করা অপ্রাসংগিক হবেনা বলে মনে করি।

এ বিরাট গ্রন্থখানির প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে ইসলামী জিহাদের মর্যাদা, আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ, সংস্কারমূলক যুদ্ধ, ইসলাম প্রচার ও তরবারী এবং যুদ্ধ ও সন্ধি সম্পর্কে ইসলামী আইন কানুনের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মের যুদ্ধ নীতি।

সপ্তম অধ্যায়ে বর্তমান সভ্যতার অধীনে পরিচালিত যুদ্ধ ও সন্ধিকে আলোচনার বিষয়বস্তু করা হয়েছে। এ কথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে যে, বিষয়টির ওপর এমন তথ্যবহুল, যুক্তিপূর্ণ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোন ভাষায় কারো দ্বারা লিখিত হয়নি।

এ সম্মান আল্লাহ তায়ালা দান করেন, একমাত্র মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে।

অল্লামা ইকবাল গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৯২।

সংগঠন আন্দোলন

'সংগঠন আন্দোলনের' নেতা লালা হরদয়াল প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, মুসলমানদেরকে হয় হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হতে হবে, নতুবা তাদেরকে পাততাড়ি গুটিয়ে ভারত ত্যাগ করতে হবে।

১৯২৫ সালে জনৈক হিন্দুনেতা সত্যদেব ঘোষণা করেন, "আমরা যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে শক্তিশালী, তখন মুসলমানদের নিকটে নিম্ন শর্তাবলী পেশ করব ঃ

"কোরআনকে ঐশীগ্রন্থ হিসাবে মানা চলবে না, মুহাম্মদকে নবী বলেও স্বীকার করা হবে না। মুসলমানী উৎসবাদি পরিত্যাগ করে হিন্দু উৎসব অনুষ্ঠান পালন করতে হবে। মুসলমানী নাম পরিহার করে রামদীন, কৃষ্ণখান প্রভৃতি নাম রাখতে হবে। আরবী ভাষার পরিবর্তে হিন্দী ভাষায় উপাসনা করতে হবে।"

—(A History of Freedom Movement , Bengali Muslim Public

Opinion as Reflected in the Bengali Press—1901–30 Mustafa Nurul Islam.)

আর্যসমাজীদের শুদ্ধি আন্দোলনের সমসাময়িককালে ডঃ মুঞ্জে ও ভাই পরমানন্দ 'সংগঠন' আন্দালনের মাধ্যমে হিন্দুদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলেন। ফলে বিভিন্নস্থানে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের উৎপত্তি হয়। অবস্থা চরম অবনতির দিকে ধাবিত হলে ডাঃ সাইফুদ্দীন কিচ্‌লু 'তানজীম' এবং আম্বালার সাইয়েদ গোলাম ডিক্ নায়রঙ্ 'তাবলিগ্' আন্দোলনসহ ময়দানে নেমে পড়েন। তাঁদের অক্লান্ত 'প্রচেষ্টায়, 'শুদ্ধি' ও 'সংগঠন' আন্দোলনের মারাত্মক গতিবেগ খানিকটা প্রশমিত হয়।

কিন্তু হিন্দুদের অন্তর থেকে সাম্প্রদায়িক অগ্নিশিখা নির্বাপিত হয়নি কিছুতেই। লাহোরের রাজপাল নামক জনৈক আর্যসমাজী মুসলিম-বিদ্বেষাগ্নি পুনরায় প্রজ্জ্বলিত করে। 'রঙ্গিলা রসূল' নামে একখানি পুস্তক সে প্রকাশ করে যার মধ্যে বিশ্বনবী মুহাম্মদ মুস্তাফার চরিত্রে জঘন্য ও কুৎসিত কলংক আরোপ করা হয়। এর দ্বারা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতির উপর চরম আঘাত করা হয়। এবার ইলমুদ্দীন নামক জনৈক মুসলমান রাজপালকে হত্যা করে সহাস্যে ফাঁসীর মঞ্চে গমন করেন।

মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের স্বাতন্ত্র দাবী

সাম্প্রদায়িক দাংগা-হাংগামার গতিবেগ প্রশমিত না হয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এক ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ১৯২৭ সালে কানপুরের মওলানা হস্‌রত মোহানী ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের স্বাতন্ত্রের দাবী সম্বলিত একটি প্রস্তাব সংবাদপত্রে বিবৃতির মাধ্যমে পেশ করেন। একে বলা যেতে পারে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রথম পথের দিশারী।

সর্বদলীয় সম্মেলন

এদিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে মওলানা মুহাম্মদ আলী, মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খান, মিসেস সরোজিনী নাইডো, রাজা গোপালাচারিয়া, ডাঃ আনসারী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু দাংগা প্রতিরোধের কোন উপায় খুঁজে

পাচ্ছিলেন না। অবশেষে ১৯২৮ সালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে এক সর্বদলীয় সম্মেলন আহূত হয়। ভারতের নেতৃস্থানীয় হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সম্মেলনে যোগদান করেন। কংগ্রেসের বিদায়ী সভাপতি ডাঃ মুখতার আহমদ আনসারী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। কিন্তু উগ্রপন্থী হিন্দুদের হঠকারিতায় সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মুসলমানরা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির আইন পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে তাদের প্রাপ্য আসন সংখ্যার কিছু সংখ্যক আসন অমুসলমানদেরকে ছেড়ে দিতে আগ্রহী হয় এবং এর বিনিময়ে কেন্দ্রীয় আইন সভায় তাদের ন্যায্য প্রাপ্য আসন অপেক্ষা শতকরা তিনটি আসন অতিরিক্ত দাবী করে। এ ছিল অধিক সংখ্যক আসন ছেড়ে দিয়ে কেন্দ্রে সামান্য কিছু লাভ করার দাবী। কিন্তু সম্মেলনের হিন্দু এবং শিখ নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে বৃহত্তর উদারতার বিনিময়ে সামান্য উদারতা প্রদর্শনের জন্যে মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র পুনঃ পুনঃ আবেদন ব্যর্থ হয়। ফলে সর্বদলীয় সম্মেলন কোন সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকেই চরম ব্যর্থতার সাথে শেষ হয়।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঐতিহাসিক চৌদ্দ দফা

মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রথমে কংগ্রেসের একজন অতি উৎসাহী ও একনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন এবং তিনি ছিলেন হিন্দু মুসলিম মিলনের দূত। কিন্তু তাঁর দীর্ঘদিনের মিলন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি কংগ্রেসের হিন্দু সদস্যদের আচরণ এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের বৈরী নীতিতে অত্যন্ত ব্যথিত হন। অতঃপর ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে কংগ্রেসের সাথে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কিন্তু ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনের পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশ্যে কংগ্রেসের বিরোধিতা থেকে বিরত থাকেন। এ সম্মেলনে হিন্দু ও শিখদের বিদ্বেষাত্মক মনোভাব লক্ষ্য করে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। তার পর পরই দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম কন্‌ফারেন্সে তিনি তাঁর চৌদ্দ দফা প্রস্তাব পেশ করেন। এ চৌদ্দ দফার বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বোম্বাই থেকে সিন্ধুকে পৃথক করে সিন্ধুপ্রদেশ গঠন, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশে শাসন সংস্কার

প্রবর্তন, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির আইন পরিষদে জনসংখ্যার অনুপাতে আসন বন্টন এবং দেশের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রতিনিধি নির্বাচনে মুসলমানদের জন্যে পৃথক নির্বাচন প্রবর্তন। তখন থেকে মিঃ জিন্নাহ্ (পরবর্তীকালে কায়েদে আজম) কংগ্রেস বিরোধিতায় হ'য়ে পড়েন সোচ্চার। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে (Communal Award) 'চৌদ্দ দফার' অধিকাংশ দফা স্বীকৃতি লাভ করে। এ চৌদ্দ দফার বাইরে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ উড়িষ্যা এবং আসাম দুটি পৃথক প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে।

সাইমন কমিশন

ভারত শাসন সম্পর্কে ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে অথবা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন দাবিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার ১৯২৮ সালে ভারতে একটি রয়েল কমিশন প্রেরণ করেন। এ কমিশনের সভাপতি ছিলেন স্যার জন সাইমন। কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য নেয়া হয়নি বলে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি এ কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত করে। কমিশনের সদস্যগণ বোম্বাইয়ে অবতরণ করলে তাঁদেরকে কৃষ্ণ পতাকা দেখানো হয়। যাহোক, সাইমন কমিশন লন্ডনে একটি গোলটেবিল বৈঠকের সুপারিশ পেশ করে।

গোলটেবিল বৈঠক

সাইমন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৩০ সালে লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠক আহূত হয়। কংগ্রেস এ বৈঠকে যোগদান করা থেকে বিরত থাকে। আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন মওলানা মুহাম্মদ আলী, মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মিঃ এ, কে, ফজলুল হক, স্যার মুহাম্মদ ইসমাইল, আগা খান, স্যার আবদুল কাইয়ুম, স্যার আবদুল হালিম গজনবী, স্যার আকবর হায়দারী, স্যার মুহাম্মদ শফি, স্যার শাহ নওয়াজ ভুট্টু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। মুসলিম সদস্যগণ লন্ডনে পৌঁছে মহামান্য আগা খানকে তাঁদের নেতা নির্বাচিত করেন।

প্রায় দু'মাসকাল বৈঠক স্থায়ী হয়। মওলানা মুহাম্মদ আলী ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে বৈঠকে যোগদান করেন এবং অসুস্থ অবস্থায় আসনে উপবেশন করেই তাঁর নব্বই

মিনিটব্যাপী দীর্ঘতম ভাষণ দান করেন। এই অগ্নিপুরুষের জ্বালাময়ী ভাষণ যেমন একদিক দিয়ে ছিল একটি উচ্চাংগের সাহিত্য, তেমনি অপর দিক দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম অবদান। তিনি সম্রাট পঞ্চম জর্জের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যে ভাষায় ব্রিটিশ সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন, তা শুধুমাত্র তাঁর মতো একজন নির্ভীক মুজাহিদের পক্ষেই ছিল সম্ভব। ভারতের স্বাধীনতা তাঁর কাছে ছিল জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু। তিনি তাঁর বক্তৃতার এক পর্যায়ে অতি আবেগময় কণ্ঠে বলেন, "আমি ভারতের স্বাধীনতার সারাংশ নিয়ে স্বদেশে ফিরে যেতে চাই। যদি তোমরা স্বাধীনতা না দাও, তাহলে তার পরিবর্তে এখানে আমার জন্যে রচনা করো সমাধি। কারণ একটি গোলামীর দেশে ফিরে যাওয়ার চেয়ে একটি স্বাধীন দেশে মৃত্যুবরণকে আমি শ্রেয়ঃ মনে করি।"

তাঁর এ আন্তরিকতাপূর্ণ উক্তি ছিল একটি ভবিষ্যদ্বাণী যা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হতে মোটেই বিলম্ব হলো না। তাঁকে আর তাঁর প্রিয় জন্মভূমিতে ফিরে আসতে হয়নি। ভারতের স্বাধীনতা হয়নি, হয়েছে তাঁর জীবনের অবসান লন্ডনের বুকেই ক'দিন পরে।

মওলানা মুহাম্মদ আলী বারবার কারাবরণ করে এবং দীর্ঘদিন কারাগারে অতিবাহিত করে একেবারে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যু ভারতের কোটি কোটি নরনারীকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করে। ১৯৩০ সালে ৪ঠা জানুয়ারী তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং এ নিদারুণ সংবাদ তড়িৎগতিতে সারা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর সুধী সমাজ মর্মাহত হয়ে ভারতের এ সিংহপুরুষের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে তারবার্তা প্রেরণ করতে থাকেন।

মওলানা মুহাম্মদ আলীর অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁর মৃতদেহকে পরাধীন ভারত ভূমিতে না এনে বায়তুল মাক্‌দেসে অবস্থিত খলিফা ওমরের মসজিদ প্রাংগণে সমাধিস্থ করা হয়।

দেশপ্রেমিক, কবি ও সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বাগ্মী মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহরের মৃত্যুতে ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তা আর পূরণ হয়নি। তবে লন্ডন যাত্রাকালে তাঁকে যখন স্ট্রেচারের সাহায্যে বোম্বাই বন্দরে জাহাজে তোলা হয়, তখন অনেকেই অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন—"ভারতে আপনার স্থলাভিষিক্ত কে হবে।" তখন তিনি বলেছিলেন "তোমাদের

জন্যে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ রইলো।" তাঁর এ অন্তিম ইচ্ছাও পূরণ হয়েছিল। পরবর্তীকালে মুসলমানদের আশা-আকাংখার বাস্তবায়ন হয়েছিল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র অক্লান্ত প্রচেষ্টায়।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক

প্রথম গোলটেবিল বৈঠক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বর্জন করেছিল। উপরন্তু মিঃ গান্ধী লবণ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে ভারতে ব্রিটিশ সরকারকে বিব্রত করে তোলেন। সরকারও আন্দোলনকারীদেরকে কঠোর হস্তে দমন করার চেষ্টা করেন। এমতাবস্থায় সরকারের সাথে একটা আপোষ নিষ্পত্তিতে উপনীত হবার জন্যে স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু, ভূপালের নবাব হামীদুল্লাহ্ খান, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এবং শ্রী জয়াকর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ মিঃ গান্ধীর সাথে আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনায় একটি আপোষের ক্ষেত্র তৈরী হয়। বড়োলাটের সাথে গান্ধীজির সরাসরি আলাপ আলোচনার পর কংগ্রেস দ্বিতীয় গোলটিবিল বৈঠকে যোগদান করতে সম্মত হয়।

১৯৩১ সালের আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিতব্য গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ গান্ধী লন্ডন যাত্রা করেন। লন্ডনে পৌঁছে তিনি জানতে পারেন যে সরকার মুসলমানদের ন্যায় তফশিলী সম্প্রদায়কেও একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসাবে গণনা করতে বদ্ধকর। গান্ধী তা মেনে নিতে রাজী ছিলেন না এবং তিনি তার প্রতিবাদে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। গান্ধী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকারীদের সাথে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

গান্ধীর গোলটেবিল বৈঠক ত্যাগের পর দু'মাসকাল যাবত বৈঠক চলে এবং বৈঠকে অনেকগুলি সাব কমিটি গঠিত হয়। এসব কমিটির রিপোর্ট বিবেচনার জন্যে পরবর্তী বৎসরের আগষ্ট মাসে গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশন আহূত হয়।

তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক

বিভিন্ন আইন সভায় মুসলমানদের আসন সংখ্যা ও নির্বাচন প্রথা নিয়ে হিন্দু সদস্যগণ তাদের চিরাচরিত বৈরী ভূমিকাই পালন করেন। ১৯২৮ সালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে হিন্দুগণ যে আপোষহীন মনোভাব

ব্যক্ত করে সম্মেলনকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন, গোলটেবিল বৈঠককে অনুরূপভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করার চেষ্টা তাঁরা করছিলেন। কিন্তু আগা খানের সুযোগ্য নেতৃত্বে মুসলমান নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এমন যোগ্যতা ও যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তাঁদের ন্যায্য দাবীদাওয়াগুলি পেশ করেছিলেন যে তার অধিকাংশই ব্রিটিশ সরকার মেনে নিতে রাজী হন। আগা খান ও মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ব্যতীতও স্যার মুহাম্মদ শফি, স্যার আবদুল হালিম গজনভী, স্যার আকবর হায়দারী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের ভূমিকাও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যুক্তিতর্কে হার মেনে নিয়ে পন্ডিত মদনমোহন মালব্য, ডাঃ মুঞ্জে, শ্রীজয়াকর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অন্যান্য হিন্দু সদস্যগণের সাথে পরামর্শক্রমে উপরোক্ত প্রশ্নটির (আইনসভায় মুসলমানদের আসন বন্টন ও নির্বাচন প্রথা) মীমাংসার ভার অর্পণ করেন তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের উপর।

ম্যাকডোনাল্ড অতীতে হিন্দুপ্রীতির পরিচয় দিয়েছিলেন এবং কংগ্রেসের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন বলে তার উপর হিন্দুদের গভীর আস্থা ছিল। কিন্তু তিনি যে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ (Communal Award) ঘোষণা করেন তাতে বিভিন্ন আইনসভায় মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্যে আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। পৃথক নির্বাচন প্রথাকেও স্বীকৃতি দেয়া হয়। শুধু আসন সংখ্যায় কিছু রদবদল করে উভয়ের গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করা হয়।

ম্যাকডোনাল্ডের ঘোষণায় হিন্দুগণ বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে পড়েন। কারণ তারা কখনো এরূপ আশা করেননি। বিশেষ করে তফশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুদের জন্যেও পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাবে তাঁরা খুব মর্মাহত হয়ে পড়েন। মিঃ গান্ধী তখন জারবেদা জেলে কারাজীবন যাপন করছিলেন। তিনি পৃথক নির্বাচনের প্রতিবাদে আমরণ অনশন ধর্মঘটের কথা ঘোষণা করেন।

পুনাচুক্তি

একদিকে হিন্দু নেতৃবৃন্দ পুনায় গমন করতঃ গান্ধীকে অনশন থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্যে বারবার আবেদন জানাতে থাকেন এবং অপরদিকে বর্ণ হিন্দুগণ তফশিলীদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন বাঁটোয়ারা সংশ্লিষ্ট অংশের রদবদল করতে। কবি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তফশিলী সম্প্রদায়ের নেতা ডঃ আম্বেদকর বর্ণহিন্দুদের কাছে নতি স্বীকার

করেন এবং স্থিরীকৃত হয় যে বিভিন্ন আইন সভায় তফশিলীদের জন্যে আসন সংরক্ষিত থাকবে বটে, তবে মিশ্র নির্বাচন প্রথার সাহায্যে তাদেরকে নির্বাচিত হতে হবে। এ চুক্তিটি ইতিহাসে পুনা চুক্তি নামে খ্যাতি লাভ করে।

উল্লেখ্য যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তথা ভারতীয় বর্ণহিন্দুদের উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র ভারতবাসীকে একজাতীয়তার যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট করে এমন এক জাতীয়তার উদ্ভব করা যার কর্তৃত্ব নেতৃত্ব থাকবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের হাতে। ফলে মুসলিম জাতিকে কৃত্রিম জাতীয়তার সাথে একাকার করে তাদের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করে দেয়া হবে। কিন্তু মুসলমানদের জন্যে সরকার কর্তৃক পৃথক নির্বাচনের স্বীকৃতির মাধ্যমে তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যও স্বীকার করে নেয়া হয়। এতে বর্ণহিন্দুদের বহুদিনের স্বপ্নসাধ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় এবং তাদের সমস্ত আক্রোশটা গিয়ে পড়ে তাদের এককালীন পরম বন্ধু, হিতৈষী ও অভিভাবক ব্রিটিশ সরকারের উপর। তার জন্যে সৃষ্টি হয় সন্ত্রাসবাদের। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, রাজনৈতিক হত্যা প্রভৃতি নিত্যনতুন ঘটনা ঘটতে থাকে। এ সময়ের কয়েক বছরের উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা হলো হিন্দু সন্ত্রাসবাদী সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, গোয়েন্দা বিভাগের অন্যতম অফিসার খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ্‌র হত্যা, ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ ও কয়েকজন নর-নারীর হত্যা, মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হত্যা, ডিনামাইট ষড়যন্ত্র প্রভৃতি। লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠক চলাকালীন দু'তিন বছরের মধ্যেই এ সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী ঘটনাগুলি সংঘটিত হয়।

ভারত শাসন আইন

পরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন। প্রদেশে কিছুটা দায়িত্বশীল সরকার এবং কেন্দ্রে ফেডারেল সরকার প্রতিষ্ঠা ছিল—এ আইনের বিষয়বস্তু বা উদ্দেশ্য। মন্টফোর্ড শাসন সংস্কারে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে যে পরিমাণ ক্ষমতা দিয়েছিলেন, ভারত শাসন আইনে তার চেয়ে অধিক ক্ষমতা তাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু প্রচুর রক্ষাকবচের মাধ্যমে আসল ক্ষমতা বড়োলাট ও প্রাদেশিক গভর্ণরদের হাতে রয়ে যায়। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে এ নতুন ভারত শাসন আইন চালু হবে বলেও ঘোষণা করা হয়।

কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এই সংকুচিত বা নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতায় (Controlled Power) মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তবুও নানান টালবাহানার পর নতুন আইনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে কিভাবে ভারতের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গঠন করে এবং তাদের আড়াই বছরের শাসনে কিভাবে মুসলমানদের উপর অন্যায় অবিচার ও নিপীড়ণ চালায়, যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মুসলমানদের পাকিস্তান আন্দোলনের পথ উন্মুক্ত হয়, পরবর্তীতে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ঘোষিত হলে মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সকলকে মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার উদাত্ত আহবান জানান। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কিছু সংখ্যক সদস্য মুসলিম লীগে নির্বাচিতও হয়েছিলেন। তখন পর্যন্তও মুসলিম লীগের আন্দোলন গণআন্দোলনের রূপ লাভ করেনি। নির্বাচনের পর মিঃ জিন্নাহ কংগ্রেসের সাথে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেন। কিন্তু কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে। জিন্নাহর মতো একজন তেজস্বী ও খ্যাতনামা আইনবিদের পক্ষে কংগ্রেসের উপরোক্ত ঔদ্ধত্যের কাছে নতি স্বীকার করা সম্ভব হয়নি। বহু মানঅভিমানের পর বড়োলাট লিন্‌লিথ্‌গোর আশ্বাসবাণীর পর কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করতে রাজী হলে, মিঃ জিন্নাহ লীগ সদস্যগণকে তার বিরোধিতা করার নির্দেশ দেন।

লীগ-কংগ্রেসের দ্বন্দ্বকলহের মধ্য দিয়েই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন চলতে থাকে। মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের বিমাতাসুলভ আচরণ, মুসলমানদের তাহ্‌জিব তামাদ্দুনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে হিন্দু রামরাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা এবং মুসলমানদের প্রতি হিন্দু কংগ্রেসের অন্যায় অবিচার মুসলমানদেরকে স্বতন্ত্র আবাসভূমি লাভের সংগ্রামে বাধ্য করে। সে সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্মের ভিতর দিয়ে।

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস'–এর প্রথম ভাগে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বাংলায় তথা ভারত উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে মুসলমানদের প্রথম আগমন থেকে শুরু করে তাদের সাড়ে পাঁচ শতাধিক বৎসরব্যাপী (১৩০২–১৭৫৭ খৃঃ) বাংলা শাসনের ইতিহাস। অতঃপর এ ভূখন্ডে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত থেকে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন (Government of India Act, 1935) কার্যকর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কালের ইতিহাস।

এখন এ ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগে আলোচনা করতে চাই ১৯৩৫ সালের উপরিউক্ত আইনের প্রয়োগকাল থেকে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস।

ভারত বিভাগ কতিপয় ব্যক্তির নিকটে দুর্ভাগ্যজনক বিবেচিত হলেও এ ছিল এক অনিবার্য ও স্বাভাবিক বাস্তবতা। যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিম অধিবাসীর উপর মুষ্টিমেয় মুসলমানের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা হাজার বারোশ' বছর চলেছে, এ দীর্ঘ সময়ে মুসলমান অমুসলমান পাশাপাশি শান্তি ও সৌহার্দের সাথে একত্রে বসবাস করেছে, তারা বিংশ শতাব্দীর মাঝখানে এসে আর একত্রে থাকতে পারলোনা কেন? এর সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের অবশ্যই জানা দরকার। ইংরেজ শাসন কায়েম হওয়ার পর থেকে মুসলমানদের প্রতি হিন্দু ও ব্রিটিশের আচরণের ধারাবাহিক ইতিহাস, বিশেষ করে ব্রিটিশ ভারতে কংগ্রেসের আড়াই বছরের কুশাসন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগীসহ আলোচনা করলে এ সত্যে উপনীত হওয়া যাবে যে, ভারত বিভাগ ছিল এক অনিবার্য ও স্বাভাবিক বাস্তবতা।

পঁয়ত্রিশের ভারত শাসন আইন কার্যকর হওয়ার ফলে প্রদেশগুলোতে সীমিত স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস সাতটি হিন্দু সংখ্যাগুরু প্রদেশে অন্য দলের সহযোগিতা ব্যতীতই সরকার গঠন করতে সমর্থ হয় এবং ক্ষমতামদমত্ত হয়ে মুসলমানদের সাথে এমন অমানবিক আচরণ শুরু করে যার দরুন মুসলমানগণ এ উপমহাদেশে তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন মনে করতে থাকে। হিন্দু–মুসলিম সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে, দেশের সর্বত্র লোমহর্ষক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এবং মুসলমানদের জান–মাল ইজ্জৎ–আবরু লুণ্ঠিত হতে থাকে। পরিস্থিতি অবশেষে এমন একদিকে মোড় নেয় যেদিক থেকে প্রত্যাবর্তনের আর কোনই উপায় ছিলনা। ভারত দুটি পৃথক পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ বিভক্তির পশ্চাতে ছিল ভারতীয় মুসলমানদের অদম্য ধর্মীয় বিশ্বাস ও আদর্শ, স্বতন্ত্র জাতীয়তার ধারণা, নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সভ্যতা–সংস্কৃতি এবং এসবসহ জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তির প্রবল আশংকা। এক পক্ষ চাইছিল অপর পক্ষকে গোলাম বানিয়ে রাখতে অন্যথায় তাদেরকে ভারতের বুক থেকে নির্মূল করতে। অপর পক্ষ চাইছিল আত্মমর্যাদা ও সকল অধিকারসহ বেঁচে থাকতে। ইতিহাসের নিরপেক্ষ আলোচনায় আশা করি এ সত্য প্রমাণিত হবে।

ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ (Govt. of India Act, 1935)

এ আইনটি ১৯৩৭ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে কার্যকর করা হয়। ভারতীয় ফেডারেশন সম্পর্কিত আইনের দ্বিতীয় অংশটি কার্যকর হয়নি। কারণ নির্দিষ্ট সংখ্যক ভারতীয় দেশীয় রাজ্য ফেডারেশন মেনে নিতে পারেনি বলে তা কার্যকর হয়নি।

এই আইনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এ সর্বপ্রথম প্রদেশগুলোকে আইনানুগ পৃথক অস্তিত্ব দান করে। সিন্ধুকে বোম্বাই থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক প্রদেশের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। উত্তর–পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে এই সর্বপ্রথম পূর্ণ প্রাদেশিক মর্যাদা দান করা হয়। ভোটদাতার সম্পদের অনুপাত হ্রাস করতঃ ভোটার সংখ্যা বর্ধিত করা হয়।

আইন অনুযায়ী প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে মন্ত্রী পরিষদ থাকবে এবং গভর্ণর তার সুপারিশ মেনে চলবেন। তবে তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে ইচ্ছা করলে আপন বিবেক অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। দ্বৈতশাসন বিলুপ্ত করা হয়। প্রদেশে ব্রিটিশ মডেলের একটি করে মন্ত্রীসভা থাকবে যার পরামর্শ অনুসারে গভর্ণর তাঁর কার্য সম্পাদন করবেন।

প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন

প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হয় ১৯৩৭ এর ফেব্রুয়ারী ও মার্চে। ১৯৩৬ সালের শেষভাগে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস তাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টো ঘোষণা করে। উভয় মেনিফেস্টোর সামাজিক পলিসি ছিল একই রকমের। রাজনৈতিক ইস্যুতেও কেউ একে অপর থেকে বেশী দূরে অবস্থান করছিল না। কিন্তু দুটি বিষয়ে উভয়ের মধ্যে বিরাট মতপার্থক্য ছিল। একটি এই যে, মুসলিম লীগ ওয়াদাবদ্ধ ছিল উর্দূ ভাষা ও বর্ণমালার সংরক্ষণ এবং সমৃদ্ধি সাধন করতে। পক্ষান্তরে কংগ্রেস বদ্ধপরিকর ছিল হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে। দ্বিতীয়তঃ মুসলিম লীগ অটল ছিল পৃথক নির্বাচনের উপর। কিন্তু কংগ্রেস ছিল তার চরম বিরোধী। ১৯১৬ সালে কংগ্রেস পৃথক নির্বাচন মেনে নিয়ে মুসলিম লীগের সাথে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে যা লাখ্‌নো চুক্তি নামে খ্যাত ছিল। অনেক কংগ্রেস নেতা লাখ্‌নো চুক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং এটাকে হিন্দু-মুসলিম মিলনের সেতুবন্ধন মনে করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কংগ্রেস এ চুক্তি অমান্য করে পৃথক নির্বাচনের বিরোধিতা শুরু করে। অবশ্যি কংগ্রেসের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারত বিভাগ পর্যন্ত পৃথক নির্বাচন বলবৎ থাকে।

হিন্দু-মুসলিম মিলনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কোন কথা মুসলিম লীগ মেনিফেস্টোতে ছিলনা। বরঞ্চ তাতে ছিল সহযোগিতার সুস্পষ্ট আহবান। কংগ্রেস মুসলিম লীগের এ সহযোগিতার আহবান ঔদ্ধত্য সহকারে প্রত্যাখ্যান করে। কংগ্রেসের দাবী ছিল যে, সকল ভারতবাসী এক জাতি এবং ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান একমাত্র কংগ্রেস। কিন্তু ১৯৩৭ সালের নির্বাচন তার এ দাবী মিথ্যা প্রমাণিত করে।

নির্বাচনের যে ফল প্রকাশিত হয়, তাতে দেখা যায় সর্বমোট ১৭৭১টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস লাভ করে মাত্র ৭০৬ টি যা অর্ধেকেরও কম। মুসলিম আসনের অধিকাংশ লাভ করে স্যার ফজলে হোসেনের পাঞ্জাব ইউনিয়নিস্ট্ পার্টি। মুসলিম লীগ তখন পর্যন্ত অসংগঠিত ছিল বলে ৪৮২টি আসনের মধ্যে ১০২টি লাভ করে। কিন্তু কংগ্রেস হিন্দুমুসলিম উভয়ের প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসাবে কয়টি মুসলিম আসনে বিজয়ী হয়? ৫৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হয় মাত্র ২৬টি আসনে। পাঞ্জাবে সর্বমোট ১৭৫ আসনের মধ্যে ১৮ এবং বাংলায় ২৫০ এর মধ্যে ৬০ আসন লাভ করে।

(The Struggle for Pakistan. I.H. Qureshi). Return showing the results on election in India-1937, Nov. 1937)

মোট সাড়ে তিন কোটি ভোটের মধ্যে কংগ্রেস প্রায় দেড় কোটি ভোট লাভ করে। অতএব ভারতের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হওয়ার দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

ইউপিতে কংগ্রেস টিকেটে মাত্র একজন মুসলমান নির্বাচিত হন। তিনি বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনী এলাকা থেকে যুক্ত নির্বাচনে নির্বাচিত হন। কংগ্রেসের প্রাদেশিক সভাপতি—একজন মুসলমান নির্বাচনে পরাজিত হন। — (The Struggle for Pakistan I, H. Qureshi)

দেশের এগারোটি প্রদেশের মধ্যে ছয়টিতে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করতে সমর্থ হয়। সে ছয়টি হলো– বোম্বাই, মাদ্রাজ, ইউ পি, সি পি, বিহার ও উড়িষ্যা। কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশগুলোতে বহু চেষ্টা করেও যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান প্রার্থী সংগ্রহ করতে পারেনি। উপরোক্ত ছয়টি প্রদেশের তিনটিতে বোম্বাই, সিপি (মধ্য প্রদেশ) ও উড়িষ্যা–কংগ্রেস মনোনীত কোন মুসলমান প্রার্থী জয়লাভ করতে পারেননি।

নতুন প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক গভর্ণরগণ প্রাদেশিক আইনসভাগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃবৃন্দকে ডেকে পাঠান এবং মন্ত্রীসভা গঠনে সহায়তা করতে অনুরোধ জানান। পাঞ্জাব, বাংলা, সিন্ধু, উত্ত–পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং আসাম—এ পাঁচটি প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠিত হয় এবং পয়লা এপ্রিল থেকে স্বায়ত্তশাসিত ইউনিট হিসাবে কাজ শুরু করে। অবশিষ্ট ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে—যতোক্ষণ না গভর্ণরগণ সংবিধান অনুযায়ী তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ থেকে বিরত থাকার নিশ্চয়তা দান করেন। এ ধরনের নিশ্চয়তা দানে গভর্ণরগণ অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। অতঃপর যেসব দল বা গ্রুপের প্রতিনিধিগণ মন্ত্রীসভা গঠনে ইচ্ছুক তাঁদেরকে নিয়ে অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মুসলমানদের নেতৃত্বে বোম্বাই, বিহার ও ইউপিতে অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভা গঠিত হয় এবং কতিপয় মুসলিম লীগ সদস্যকেও মন্ত্রীসভায় স্থান দেয়া হয়। কিন্তু এসবকে 'মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা' নাম দেয়া হয়নি।

রক্ষাকবচ প্রশ্নে অচলাবস্থা সৃষ্টি

ভারত শাসন আইন ১৯৩৫-এর অধীনে প্রদেশের গভর্ণরগণকে যে নির্দেশনামা প্রদান করা হয় তাতে তাঁদের প্রতি এক বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে আইনে যে রক্ষাকবচের (Safeguard) নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য রাখাই গভর্ণরগণের বিশেষ দায়িত্ব। বলা হয়েছে ঃ

The Instruments of Instructions issued to the Governors under the Government of India Act 1935, placed some special responsibilities on the provincial heads. These included the 'Safeguarding of all the legitimate interests of minorities as requiring him to secure, in general, that those racial or religious communities for the members of which special representation is accorded in the legislature and those classes of the people committed to his charge who, whether on account of the smallness of their number, or their lack of educational or material advantages or from any other cause, cannot as yet fully rely for their welfare upon joint political action in the legislature, shall not suffer, or have reasonable cause to fear neglect or oppression.

উপরোক্ত আইনে সব ধরনের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সকল বৈধ স্বার্থ সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে। তাদের স্বার্থ যাতে সংরক্ষিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্যে প্রাদেশিক গভর্ণরগণকে বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়।

জাতিগত ও ধর্মীয় এমন কতিপয় সম্প্রদায় আছে যাদের সদস্যদের জন্যে আইনসভায় বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়েছে, গভর্ণরের তত্ত্বাবধানে এমন কতিপয় শ্রেণী আছে যারা সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে, অথবা শিক্ষাগত ও বৈষয়িক সুযোগ সুবিধা না থাকার কারণে অথবা অন্য কোন কারণে তাদের কল্যাণের জন্যে আইনসভায় গৃহীত যুক্ত রাজনৈতিক পদক্ষেপের উপর এখনো পুরোপুরি আস্থা পোষণ করতে পারেনা— এসব সম্প্রদায় ও শ্রেণী কোনরূপ দুর্গতি ভোগ করবে না অথবা অবহেলিত অথবা উৎপীড়িত হওয়ার কোন কারণ থাকবে না। এভাবে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব গভর্ণরদের উপরে অর্পিত হয়।

ভারতের সংখ্যালঘু বলতে প্রধানতঃ মুসলমানদেরকেই বলা হয় এবং তারা তাদের সকল প্রকার স্বার্থ সংরক্ষণ তথা রক্ষাকবচের জন্যে দীর্ঘকাল যাবত সংগ্রাম করে আসছে।

এ উপমহাদেশ কয়েকটি জাতির আবাসভূমি ছিল এবং তাদের মধ্যে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুও ছিল। এ বাস্তবতা কংগ্রেস স্বীকার করতোনা। কংগ্রেস দাবী করতো সকল ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন মাত্র একটি এবং তা হলো কংগ্রেস। মিঃ গান্ধী News Chronicle এর প্রতিনিধির কাছে বলেন, এখানে একটি মাত্র দল আছে যে কল্যাণ করতে পারে এবং তা হলো কংগ্রেস। কংগ্রেস ব্যতীত অন্য কোন দল আমি মেনে নেব না।

তিনি আরও বলেন, তোমরা যে নামেই ডাক, ভারতে একটি মাত্র দলই হতে পারে এবং তা হচ্ছে কংগ্রেস- (Muslim Separatism in India, A. Hamid, p. 217)

জওহরলাল নেহরুর মনোভাবও ছিল অনুরূপ। তিনি বলেন, একটি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও আবিষ্কার করা যাবে না যে ভারতে কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আছে। দেশে মাত্র দুটি দল আছে— কংগ্রেস এবং সরকার। আর যারা আছে তাদেরকে আমাদের কর্মপদ্ধতি মেনে নিয়ে আমাদের সাথে থাকতে হবে। যারা আমাদের সাথে নেই—তারা আমাদের বিরোধী।

- পন্ডিত নেহরুর উপরোক্ত উক্তি ফ্যাসিবাদী মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ।- (উক্ত গ্রন্থ)

সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা ১৯৩৫ সালের আইনে রয়েছে এবং প্রাদেশিক গভর্ণরগণকে বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যাতে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন না হয়। কিন্তু পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর কথায় এ দেশে সংখ্যালঘু বলে কোন বস্তুর অস্তিত্বই যখন নেই, তখন কংগ্রেসের মতে গভর্ণরদের বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্যে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের প্রয়োজনও নেই। এর সুস্পষ্ট অর্থ হলো এই যে কংগ্রেস মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে মোটেই রাজী নয়। এ কারণেই কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে

অচলাবস্থার সৃষ্টি করে রাখে।

অবশেষে ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোর সাথে কংগ্রেসের একটা আপস নিষ্পত্তি হয়ে যায় যার ভিত্তিতে ৭ই জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসকে মন্ত্রীসভা গঠনের অনুমতি দান করার প্রস্তাব গ্রহণ করে।

ভাইসরয়ের পক্ষ থেকে গোপনে পূর্ণ নিশ্চয়তা লাভের পর কংগ্রেস সকল মান-অভিমান ত্যাগ করে ১৯৩৭ এর জুলাই মাসে সাতটি প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করে। ১৯৩৮ সালে আসামের প্রধানমন্ত্রী স্যার মুহম্মদ সা'দুল্লাহ এস্তেফা দান করায় আসামে গোপীনাথ বারদলই কর্তৃক কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। যে সকল প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হয়, সেসব প্রদেশে মুসলমানদের স্বার্থ পদদলিত হতে থাকে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।

নির্বাচনের ফলাফল

কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার পর মুসলিম ভারতে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পূর্বে সাইত্রিশ সালের শুরু থেকেই যেসব প্রদেশে সরকার গঠিত হয় তাদের অবস্থা কি ছিল, তা একবার আলোচনা করা যাক।

বাংলা

নির্বাচনের পর বাংলার আইনসভার দলীয় অবস্থান ছিল নিম্নরূপ ঃ

কংগ্রেস	৫৪
অকংগ্রেসী হিন্দু	৪২
স্বতন্ত্র মুসলমান	৪৩
মুসলিম লীগ	৪০
অন্যান্য মুসলমান	৩৮
ইউরোপিয়ান অ্যাংলো ইন্ডিয়ান	৩১
নির্দলীয় মুসলমান	২
মোট=	২৫০

মুসলিম লীগ নন, এমন মুসলমানদের মধ্যে কৃষক প্রজা পার্টির সদস্য ছিল ৩৫। এ দলের নেতা ছিলেন মৌলভী এ কে ফজলুল হক (শেরে বাংলা)। এখানে

কোয়ালিশন ব্যতীত মন্ত্রীসভা গঠনের অন্য কোন পথ ছিলনা। অতএব ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে, মুসলিম লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি, তফসিলী সম্প্রদায় (Scheduled Castes) এবং স্বতন্ত্র অথবা অকংগ্রেসীয় বর্ণ হিন্দুদের নিয়ে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়, যার নেতা ছিলেন শেরে বাংলা ফজলুল হক। তিনি দশ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠন করেন যার মধ্যে পাঁচজন মুসলমান এবং পাঁচজন হিন্দু ছিলেন।

উল্লেখ্য নির্বাচনের পর তেসরা ফেব্রুয়ারী মুন্সীগঞ্জে অনুষ্ঠিত জনসভায় জনাব ফজলুল হক তাঁর দলের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী কৃষক প্রজা পার্টির কার্যনির্বাহী কমিটি উক্ত দলের নেতৃবৃন্দের সাথে মুসলিম লীগের নতুন সংবিধান কার্যকর করার উদ্দেশ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তা অনুমোদন করে। ৬ই মার্চ জনাব ফজলুল হক মন্ত্রীসভা গঠনে সম্মত হন। কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর অনুরোধে হক সাহেব মুসলিম লীগে যোগদান করেন। অতঃপর তিনি সর্বসম্মতিক্রমে লীগ কোয়ালিশন দলের নেতা নির্বাচিত হন যার ফলে তিনি বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।

ফজলুল হক কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা নির্বিবাদে কাজ করতে পারেনি। কারণ কংগ্রেস পদে পদে এ মন্ত্রীসভার চরম বিরোধিতা করে। কিন্তু তার সুফল এই হয় যে, যে পরিমাণে বিরোধিতা হয় সেই পরিমাণে সংসদের ভেতরে ও বাইরে মুসলিম ঐক্য সংহত ও সুদৃঢ় হয়।

কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার পর কৃষক প্রজা পার্টি এবং মুসলিম লীগের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত হয়। ১৮৩৭ সালের সেপ্টেম্বরে লাখনৌতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগ অধিবেশনে তিনি যোগদান করে ঘোষণা করেন যে, তাঁর দলের সদস্যগণ মুসলিম লীগে যোগদান করবেন। তাঁর মন্ত্রীসভায় খাজা নাজিমুদ্দীন ও হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী স্থান পেয়েছিলেন।

ফজলুল হক সাহেবের সাড়ে চার বছরের প্রধানমন্ত্রীত্ব তাঁর জীবনে এবং অবিভক্ত বাংলার মুসলিম রাজনৈতিক শক্তিতে এক নব জোয়ার এনে দেয়। তাঁর মন্ত্রীসভা জনগণের মধ্যে বিরাট আশার সঞ্চার এবং মুসলমানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। তাদের এতদিনের হীনমন্যতা দূরীভূত হয় এবং হিন্দুদেরকে তারা সমকক্ষ মনে করে। সংসদে ফজলুল হক-সুহরাওয়ার্দীর ভাষণ, প্রতিপক্ষের কথার দাঁতভাঙ্গা জবাব দান এবং তাঁদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা নেতৃবৃন্দের তুলনায় অধিকতর উচ্চমানের ছিল। তাঁদের প্রাণশক্তি ও প্রজ্ঞা, জ্ঞানবুদ্ধির প্রখরতা, অনর্গল বাগ্মিতা ও সাংগঠনিক যোগ্যতা এবং কঠোর পরিশ্রম ও ধীশক্তির দ্বারা তাঁরা সংসদে হিন্দু সদস্যদের উপর তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন।

বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যে নবজীবনের সঞ্চার হয় তা সংসদ ভবনের চার দেয়ালের মধ্যেই সীমিত ছিলনা। মানবীয় কর্মশীলতার সকল ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংগঠন, সাহিত্য, শিল্প, সাংবাদিকতা, খেলাধূলা প্রভৃতিতে তা দৃষ্টিগোচর হলো। মুসলিম লীগ একটি শক্তিশালী জীবন্ত সংগঠনে পরিণত হচ্ছিল এবং মুসলমানদের মধ্যে এক নতুন জীবন ও আস্থার সঞ্চার করছিল।

প্রায় এক শতাব্দী যাবত যে বাংলা সাহিত্যের উপর হিন্দু কবি সাহিত্যিক তাঁদের প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিলেন, সাহিত্য গগনে কাজী নজরুল ইসলামের উদয়ের ফলে তার অবসান ঘটে। তিনি শুধু একাকী নন, কবি জসিম উদ্দীন, গোলাম মোস্তফা, বেনজীর আহমদ প্রমুখের কাব্যজগতে অমর অবদানও অনস্বীকার্য। সংগীত সম্রাট আব্বাসউদ্দীনের মনমাতানো সুরে গাওয়া ইসলামী, মুর্শেদী, ভাটিয়ালী সংগীত মুসলমানদের মনে ইসলামী প্রেরণা সঞ্চার করে।

এ মুসলিম নবজাগরণে নতুন মুসলিম প্রেসের উত্থান বিরাট অবদান রেখেছে। সাংবাদিকতার জগতে কোলকাতা থেকে কতিপয় মাসিক ও সাপ্তাহিক প্রকাশিত হলেও নিয়মিত কোন দৈনিক পত্রিকা ছিলনা। ১৯৩৬ সালে মওলানা আকরাম খাঁ দৈনিক আজাদ প্রকাশিত করে মুসলমান জাতির বিরাট খেদমত আঞ্জাম দেন এবং ফজলুল হক কোয়ালিশন মন্ত্রীসভাকে সক্রিয় সমর্থন দান করেন। এ সময়ে আবদুল করিম গজনবী কর্তৃক প্রকাশিত দৈনিক ষ্টার অব ইন্ডিয়া এবং খাজা নূরুদ্দীন কর্তৃক প্রকাশিত দৈনিক মর্নিং নিউজ মুসলমানদের আশা আকাংখার প্রতিনিধিত্ব করে।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রীসভা— (১৯৩৭ থেকে ১৯৪১) বাংলার সংসদীয় সরকারের ইতিহাসের এক স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। এ সময়ে তিনি বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশগুলোতে সফর করে মুসলিম লীগ সংগঠিত করেন এবং একে একটি শক্তিশালী সংগঠনে রূপান্তরিত করেন। তিনি ১৯৩৭ সালে লাখনৌতে, ১৯৩৮ সালে করাচীতে এবং ১৯৩৯ সালে কটকে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ সম্মেলনগুলোতে ভাষণ দান করেন। ১৯৪০ সালে

কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে লাহোরে ২২, ২৩ ও ২৪শে মার্চ মুসলিম লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তার ২৩শে মার্চের অধিবেশনে তিনি ঐতিহাসিক পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করেন।

ফজলুল হক এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, মুসলিম জাতির উন্নতি অগ্রগতির চাবিকাঠি হচ্ছে শিক্ষা। এ কারণেই তিনি তাঁর কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় নিজে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের উন্নতির জন্যে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। যথা লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ (মহিলা কলেজ), কোলকাতা; ইডেন গার্লস কলেজ, ঢাকা; কৃষি কলেজ (তেজগাঁ, ঢাকা); ফজলুল হক মুসলিম হল, ঢাকা; ফজলুল হক কলেজ, চাখার, বরিশাল।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ব–ঔদ্ধত্য তিনি কিছুটা খর্ব করতে চেয়েছিলেন। এ ছিল প্রকৃতপক্ষে হিন্দুদের এক সুরক্ষিত বিদ্যামন্দির। হিন্দু রেনেসাঁর এবং বাংলায় হিন্দুর বুদ্ধিবৃত্তিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এক শক্তিশালী হাতিয়ার। এ ছিল এক বিরাট দুর্দমনীয় প্রতিষ্ঠান যা প্রবেশিকা এবং মাধ্যমিক পরীক্ষাগুলোও নিয়ন্ত্রণ করতো। অতএব উচ্চশিক্ষার উপর তার প্রভাব ছিল শিক্ষামন্ত্রী ও তাঁর বিভাগ অপেক্ষা অনেক বেশী। এ প্রভাব থেকে পরীক্ষার্থীদের রক্ষা করার জন্যে তিনি সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড গঠনের উদ্দেশ্যে আইন পরিষদে একটি বিল উত্থাপনের চেষ্টা করেন। ফলে গোটা হিন্দু সম্প্রদায় ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং পারস্পরিক সকল বিভেদ ভুলে গিয়ে উক্ত প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৯০৫ সালের বংগভংগের পর এমন প্রচন্ড বিক্ষোভ আর দেখা যায়নি। ১৯৪০ সালে কোলকাতায় স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো এক বিশ্বজন ব্যক্তির সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র প্রদেশ থেকে প্রায় দশ হাজার প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন বার্ধক্যজনিত পীড়ায় ভুগছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি উক্ত সম্মেলনে তাঁর নাম ও মর্যাদা ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ করেন। সম্মেলনে তিনি যে বাণী পাঠান তার শেষাংশে বলেন ঃ

আমার বার্ধক্য এবং স্বাস্থ্য আমাকে সম্মেলনে যোগদানে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু যে বিপদ আমাদের প্রদেশের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছে, তা আমাকে ভয়ানক বিচলিত করেছে। সে জন্যে আমি আমার রোগশয্যা থেকে সম্মেলনে একটি কথা না পাঠিয়ে পারলাম না।

হিন্দুদের চরম বিরোধিতার কারণে বাংলার প্রধানমন্ত্রী সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড গঠনের যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা কার্যকর করা যায়নি।

তবে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শেরে বাংলা ফজলুল হক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা এই যে, প্রদেশের সকল সরকারী চাকুরীতে হিন্দু ও মুসলমান সমান সুযোগ লাভ করবে। অর্থাৎ চাকুরীর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হিন্দু ও পঞ্চাশ ভাগ মুসলমান লাভ করবে। সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে হিন্দুদের চিরাচরিত একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলমানের প্রতি যে চরম অবিচার করা হচ্ছিল, উপরোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে মুসলমান শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে জীবন ক্ষেত্রে বিরাট আশা ও আনন্দের সঞ্চার হয়। মুসলমান জাতির জন্যে এ ছিল এক বিরাট খেদমত।

পাঞ্জাব

যে কয়টি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হতে পারেনি তার মধ্যে ছিল পাঞ্জাব, সিন্ধু ও আসাম। নির্বাচনের ফলে পাঞ্জাবে দলীয় অবস্থান ছিল নিম্নরূপ ঃ

কংগ্রেস	১৮
অকংগ্রেস হিন্দু ও শিখ	৩৬
মুসলিম লীগ	২
অন্যান্য মুসলিম	৪
ইউনিয়নিস্ট	৮৮
নির্দলীয়	২৭
মোট =	১৭৫

পরে আটজন সদস্য ইউনিয়নিস্ট পার্টিতে যোগদান করার ফলে এ দলে মোট সদস্য সংখ্যা হয় ৯৬। খালসা ন্যাশনালিস্ট শিখ দলও স্যার সেকেন্দার হায়াতের প্রতি তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করে এবং এ সুযোগে তিনি মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ১৯৪২ সালে তাঁর মৃত্যুর পর মালিক খিজির হায়াত খান প্রধানমন্ত্রী হন এবং ১৯৪৫ সালে সকল প্রাদেশিক পরিষদ বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত এ মন্ত্রীসভা বলবৎ থাকে।

সিন্ধু

সিন্ধু প্রদেশের দলীয় অবস্থান ছিল নিম্নরূপ ঃ

কংগ্রেস	৮
অকংগ্রেসীয় হিন্দু	১৪
মুসলিম স্বতন্ত্র	৯
অন্যান্য মুসলমান	৭
সিন্ধু ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি	১৮
নির্দলীয়	৪
মোট =	৬০

এখানে কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারায় গোঁজামিল দিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করতে হয়। ফলে কোনটাই স্থিতিশীল হতে পারেনি। ভাঙা–গড়ার ভেতর দিয়েই এখানে মন্ত্রীসভাগুলো চলতে থাকে। প্রথমে স্যার গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লাহ মন্ত্রীসভা গঠন করেন। পরে আল্লাহ বখশ্ ও মীর বন্দে আলী খানের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীত্বের পালাবদল হতে থাকে।

আসাম

দলীয় অবস্থান এখানে নিম্নরূপ ঃ

কংগ্রেস	৩২
অকংগ্রেসীয় হিন্দু	৯
মুসলিম স্বতন্ত্র	৩০
মুসলিম লীগ	৪
নির্দলীয়	৩৩
মোট =	১০৮

এখানেও কোন স্থিতিশীল সরকার গঠিত হতে পারেনি। স্যার মুহাম্মদ সা'দুল্লাহ মন্ত্রীসভা গঠন করেন এবং ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বরে এস্তেফা দান করেন। অতঃপর গভর্ণরের আমন্ত্রণে কংগ্রেস নেতা গোপীনাথ বারদলই মন্ত্রীসভা গঠন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সকল মন্ত্রীসভার সাথে গোপীনাথ

মন্ত্রীসভাও পদত্যাগ করে। অতঃপর পুনরায় স্যার মুহাম্মদ সা'দুল্লাহ মন্ত্রীসভা গঠনের সুযোগ পান। কিন্তু ১৯৪১ সালের শেষভাগে তাঁর মন্ত্রীত্বের পতন ঘটে এবং গভর্ণর ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের ৯৩ ধারার বলে প্রদেশের শাসনভার নিজহস্তে গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রদেশগুলোতে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা

এখন স্বল্পকালীন কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোর হালহকিকত পর্যালোচনা করে দেখা যাক মুসলমানদের প্রতি তাদের পক্ষ থেকে কোন্ ধরনের আচরণ করা হয়।

ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে গভর্ণরগণকে আইন অনুযায়ী যে বিশেষ ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল, তা প্রয়োগ না করার নিশ্চয়তা না দিলে কংগ্রেস সরকার গঠনে সম্মত হবে না। অর্থাৎ তাদের পরিষ্কার কথা এই যে, সংখ্যালঘু তথা মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে তারা মোটেই রাজী নয়। ভারত শাসনে বৃটিশ পলিসির মর্মকথা এই যে, কংগ্রেস তথা ভারতীয় হিন্দু জাতিকে যে কোন মূল্যে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। মুসলিম স্বার্থ পদদলিত করে হিন্দুদেরকে তুষ্ট করার দৃষ্টান্ত অতীতে বহু দেখা গেছে। এবারেও ভাইসরয় লর্ড লিন্‌লিথগো কংগ্রেসকে সরকার গঠনে সম্মত করার জন্যে গোপনে এ নিশ্চয়তা দান করেন যে, গভর্ণরগণ তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না যা ১৯৩৫ সালের আইনে তাঁদেরকে দেয়া হয়েছে। এ নিশ্চয়তা দানের পরই কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনে রাজী হয়।

সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করে এবং সকল প্রাদেশিক দলীয় নীতি পুরোপুরি কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

মাদ্রাজে কংগ্রেস ৭৪টি আসন লাভ করে এবং রাজা গোপালাচারিয়া মন্ত্রীসভা গঠন করেন। বোম্বাইয়ে কংগ্রেস মাত্র ৪৮টি আসন লাভে সমর্থ হয়। অন্যান্য ছোটখাটো কয়েকটি সমমনা দল নিয়ে বি. জে. খের [B.J. Kher] মন্ত্রীসভা গঠন করেন।

যুক্তপ্রদেশে শতকরা ৫৯ আসন কংগ্রেস লাভ করে এবং জিবি প্যান্ট্ প্রধানমন্ত্রী হন। বিহারে শতকরা ৬২ আসন লাভ ক'রে শ্রীকৃষ্ণ সিন্‌হা সরকার গঠন করেন। মধ্যপ্রদেশে শতকরা ৬৩ আসন লাভের পর ডাঃ খারে এবং পরবর্তীকালে শুকলা প্রধানমন্ত্রী হন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস শতকরা মাত্র ৩৮ আসন পেলেও ডাঃ খান সরকার গঠন করেন।

উড়িষ্যায় কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটে। কংগ্রেস মন্ত্রীসভার পূর্বে পার্লাকিমেদীর মহারাজা চার মাসের জন্যে (এপ্রিল-জুলাই) স্বল্পকালীন সরকার গঠন করেন। বিশ্বনাথ দাস জুলাই ১৯৩৭ থেকে অক্টোবর ১৯৩৯ পর্যন্ত কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পরিচালনা করেন। কংগ্রেস মন্ত্রীসভার পদত্যাগের পর গভর্ণর শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৯৪১ এর শেষভাগে গোদাবরী মিশ্রর নেতৃত্বে কতিপয় সংসদ সদস্য কংগ্রেস হাই কমান্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং পার্লাকিমেদীর মহারাজাকে মন্ত্রীসভা গঠনে সহায়তা করেন। মহারাজা তিনজনকে নিয়ে—তিনি স্বয়ং, মিশ্র এবং একজন মুসলমান মন্ত্রীসভা গঠন করেন। কংগ্রেস হাই কমান্ডের চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও মন্ত্রীসভা কাজ চালিয়ে যায়।

প্রদেশগুলোতে কংগ্রেস শাসন

ভারতের এগারোটি প্রদেশের মধ্যে সীমান্ত প্রদেশসহ সাতটিতে কংগ্রেসের প্রায় আড়াই বছরের শাসন (জুলাই ১৯৩৭ থেকে অক্টোবর ১৯৩৯) হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের এক অতি বেদনাদায়ক ইতিহাস। এসব প্রদেশে সকল ক্ষমতার চাবিকাঠি ছিল কংগ্রেসের হাতে। এ ক্ষমতার ব্যবহার কংগ্রেস কিভাবে করেছিল এবং তা রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে কি অশুভ পরিণাম ডেকে এনেছিল তা-ই এখন আলোচনা করে দেখা যাক।

কোয়ালিশন সরকার গঠনে অস্বীকৃতি

সাইত্রিশ সালের নির্বাচনের পর পরই মুসলিম লীগ সভাপতি মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

সংবিধান এবং মুসলিম লীগ পলিসি আমাদেরকে অন্যান্য দলের স্বার্থে সহযোগিতা করতে বাধা দেয় না। আমরা যে কোন দলের সাথে সহযোগিতা করতে পারি আইনসভার ভেতরেও এবং বাইরেও।

কিছু সংখ্যক কংগ্রেসপন্থীসহ সকলেই এ আশা পোষণ করছিলেন যে, হিন্দু প্রধান প্রদেশগুলোতে কংগ্রেস-মুসলিম লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠিত হবে। কিন্তু মুসলিম লীগের সাথে কোন প্রকার সহযোগিতা করতে কংগ্রেসের

অস্বীকৃতি এ আশা ফলবতী হতে দেয়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ যুক্ত প্রদেশের অবস্থা এখানে বর্ণনা করা যেতে পারে। এখানে আইন সভায় মোট ২২৮ আসনের মধ্যে মুসলমানদের জন্যে ৬৪ আসন ছিল। তার মধ্যে কংগ্রেস লাভ করে একটি, মুসলিম লীগ ২৬, স্বতন্ত্র মুসলমান ২৮ এবং জাতীয় কৃষি দল ৯। এখানে কংগ্রেস-মুসলিম লীগ কোয়ালিশন গঠনের বিষয় নিয়ে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা হয়। অবশেষে কংগ্রেস হাই কমান্ডের অন্যতম সদস্য মাওলানা আবুল কালাম আজাদ মুসলিম লীগ নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে জানিয়ে দেন কোন্ কোন্ শর্তে প্রাদেশিক সরকারগুলোতে মুসলিম লীগ যোগদান করতে পারে। শর্তগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. ইউপি আইন পরিষদে মুসলিম লীগ কোন পৃথক দল হিসাবে কাজ করবে না।

২. ইউপি আইন পরিষদের বর্তমান মুসলিম লীগ দল কংগ্রেসের অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে, কংগ্রেস পার্টির সদস্য হিসাবে তারা পার্টির অন্যান্য সদস্যদের সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। পার্টির আলোচনায় অংশগ্রহণের অধিকারও তাদের থাকবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। প্রত্যেক সদস্যের একটি মাত্র ভোট দানের অধিকার থাকবে।

৩. আইন পরিষদের সদস্যদের জন্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে নীতি নির্ধারণ করবে এবং যেসব নির্দেশ দিবে, তা কংগ্রেস সদস্যগণ এবং এসব সদস্য মেনে চলবেন।

৪. ইউপি এবং মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড ভেঙ্গে দিতে হবে। ভবিষ্যতে কোন উপ-নির্বাচনে সে বোর্ড কোন প্রার্থী দিতে পারবে না। কোন আসন শূন্য হলে, কংগ্রেস যাকে নির্বাচনের জন্যে প্রার্থী মনোনীত করবে তাকেই সমর্থন করতে হবে।

৫. মন্ত্রীসভার সদস্যপদ এবং আইন সভার সদস্যপদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত যদি কংগ্রেস করে, তাহলে সে সিদ্ধান্ত মুসলিম লীগ থেকে আগত সদস্যগণ মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

কংগ্রেস হাই কমান্ডের পক্ষ থেকে মুসলিম লীগকে প্রদত্ত উপরোক্ত শর্তগুলো ছিল হাস্যকর ও অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ফ্যাসিবাদী মানসিকতার

পরিচায়ক। সামান্যতম আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন কোন ব্যক্তি বা দল উপরোক্ত শর্তগুলোর কোন একটিও গ্রহণ করতে পারতো না। কারণ তা হতো আত্মঘাতী।

কংগ্রেসের এ অবিবেচনাপ্রসূত ঔদ্ধত্যের কারণ নির্ণয় করা মোটেই কষ্টকর নয়। মিঃ গান্ধী এবং জওহরলাল নেহরু ভারতে একমাত্র কংগ্রেস ব্যতীত অন্য দলের অস্তিত্ব স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। এ দেশে কোন হিন্দু–মুসলিম সমস্যা আছে—একথাও তাঁরা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। জওহরলাল নেহরু ১২ই মে, ১৯৩৭ সালে চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে বলেন যে, তাঁর বিশ্বাস ভারতে হিন্দু–মুসলিম সমস্যাটি শুধুমাত্র অল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবী, জমিদার ও পুঁজিপতিদের মধ্যে সীমিত, যাঁরা এমন এক সমস্যা সৃষ্টি করছেন যা জনগণ স্বীকার করেনা। আইনসভার ভেতরে মুসলমানদের একটা আলাদা দল থাকবে এমন ধারণার প্রতি তিনি বিদ্রূপ বান নিক্ষেপ করেন।

কংগ্রেস ঘোষিত নীতি অনুযায়ী নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের প্রতি আহবান জানানো হয় মন্ত্রীসভার সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্যে নিজেদের দল ভেঙ্গে দিয়ে কংগ্রেসে যোগদান করতে। যুক্ত প্রদেশে হাফেজ মুহাম্মদ ইব্রাহীম এবং বোম্বাইয়ে এম, ওয়াই, নূরী কংগ্রেস শপথনামায় স্বাক্ষর করে কংগ্রেস মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। উড়িষ্যায় কোন মুসলমানকে মন্ত্রীসভায় নেয়া হয়নি। মধ্য প্রদেশে জনৈক শরীফকে নেয়া হলেও পরবর্তীকালে তাঁকে সরিয়ে একজন হিন্দু নেয়া হয়।

কংগ্রেস প্রধান প্রদেশগুলোতে কোয়ালিশন সরকারের তো কোন প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু অকংগ্রেস প্রধান প্রদেশগুলোতে কংগ্রেসকে কোয়ালিশনে যোগদানের অনুমতি দেয়া হয়। এর ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টির পথ করে দেয়া হয়। বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক ১৯৩৮ সালে কোলকাতা মুসলিম লীগ সম্মেলনে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে বলেন, কংগ্রেস বারবার এই বলে চাপ সৃষ্টি করছিল যে মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে কংগ্রেসের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করলে তা হবে অধিকতর স্থিতিশীল। সিন্ধুতে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের (Communal Award) বদৌলতে হিন্দুরা যে কৌশলগত সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিলেন, তার ফলে সিন্ধু আইন পরিষদে মুসলিম লীগ দল গঠনে তাঁরা বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অকংগ্রেস মন্ত্রীসভা কংগ্রেসের খপ্পরে পড়ে অপসারিত হয়। কংগ্রেস চাচ্ছিল অন্যান্য সকল দল ভেঙ্গে

দিয়ে দেশের একমাত্র দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে। কংগ্রেস 'একদেশ–একদল–এক নেতার' নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। এ নেতৃত্ব ছিল মিঃ গান্ধীর হাতে। সকল কংগ্রেস সরকার প্রতিটি নীতি নির্ধারণে গান্ধীর শরণাপন্ন হতো এবং তাঁর নির্দেশ বেদবাক্যের মতো মেনে নিত। কোন সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হোক, গভর্ণরের সাথে কোন দ্বন্দ্ব–কলহ হোক, অথবা সাধারণ কোন নীতি পলিসি গ্রহণের বিষয় হোক, কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোর প্রধানমন্ত্রীগণ তাঁর (গান্ধীজির) শরণাপন্ন হতেন নির্দেশ–উপদেশ লাভের উদ্দেশ্যে। মিঃ গান্ধী ভাইসরয়ের সাথে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আলাপ আলোচনা করতেন। কিন্তু নিজেকে দেখাতেন একজন নিরপেক্ষ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক হিসাবে। কংগ্রেসের উপর তাঁর একনায়কসুলভ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রকাশিত থাকলেও কংগ্রেসের সদস্য তালিকায় তাঁর নাম ছিলনা। তাঁর জনৈক গুণগ্রাহী শেঠ গোবিন্দ দাস বলেন, কংগ্রেসীদের নিকটে গান্ধীর পদমর্যাদা ছিল ফ্যাসিস্টদের নিকটে মুসোলিনির, নাৎসীদের নিকটে হিটলারের এবং কমিউনিস্টদের নিকটে স্টালিনের পদমর্যাদার মতোই (Muslim Separatism in India, Abdul Hamid p. 218)

কংগ্রেসের মধ্যে সংসদীয় মানসিকতা অক্ষুণ্ন থাকবে—কংগ্রেসের এ দাবী ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। কারণ কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ না নির্বাচকমন্ডলীর কাছে, আর না আইনসভার কাছে দায়ী ছিলেন। তাঁরা ছিলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বশংবদ প্রজার ন্যায়। মধ্য প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ খারের এবং কোলকাতার সুভাস চন্দ্র বোসের সাথে কংগ্রেস হাই কমান্ডের আচরণ তার একনায়কত্বই প্রমাণ করে।

সুভাস চন্দ্র বোস ১৯৩৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। পরবর্তী বছরেও তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যথারীতি নির্বাচিত হন। কতিপয় কংগ্রেস নেতা তাঁর পদপ্রার্থিতার বিরোধিতা করেন এবং নির্বাচনে চরম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। অনেকের ধারণা মিঃ গান্ধীর নির্দেশেই এ প্রতিবন্ধকতা করা হয়। মিঃ বোসের বিজয়কে গান্ধীজির পরাজয় মনে করা হয়। কংগ্রেসের কার্যকরী সংসদের সদস্যগণ একযোগে পদত্যাগ করেন। অবশেষে গান্ধীকে খুশী রাখার জন্যে কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতিকে অপসারিত করা হয়।

কংগ্রেস শাসন এবং মুসলমান

হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে কংগ্রেস মন্ত্রীসভার শাসন মুসলমানদের জন্যে ছিল এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। এসব প্রদেশে মুসলিম লীগকে নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠনে কংগ্রেসের অস্বীকৃতি মুসলমানদের জন্যে ছিল সাবধান বাণী। কিন্তু বাস্তবে কংগ্রেস যখন এসব প্রদেশে তাদের পরিকল্পিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কার্যকর করে, তখন মুসলমানগণ যা ভয় করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশী দুর্বিষহ অবস্থার সম্মুখীন হয়। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সভ্যতা সংস্কৃতি বিলুপ্তির চরম আশংকা দেখা দেয় এবং সামাজিক প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকেও পরিকল্পিতভাবে তাদেরকে অপসারিত করার অভিযান শুরু হয়। এমনকি কংগ্রেস শাসনের অধীন তাদের জানমাল ইজ্জত আবরুও একেবারে লুণ্ঠিত হতে থাকে।

কংগ্রেস সরকার ও হিন্দু জনসাধারণের যেসব আচরণ মুসলমানদের ধর্মীয় ভাবাবেগ মারাত্মকভাবে আহত করে তা হলো— 'বন্দে মাতরম' সংগীত, নামাজের আজানে বাধা দান, নামাজরত অবস্থায় নামাজীদের উপর আক্রমণ, মসজিদের সম্মুখ দিয়ে বাদ্যসহ শোভাযাত্রা পরিচালনা, গরুর গোশত নিষিদ্ধকরণ প্রভৃতি।

আইনসভার দৈনিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার প্রাক্কালে মুসলমানদের বাধাদান সত্ত্বেও অনিবার্যরূপে 'বন্দে মাতরম' সংগীত গাওয়া হতো। বংকিম চন্দ্র চ্যাটার্জি ১৮৮২ সালে প্রকাশিত তাঁর 'আনন্দ মঠ' নামক উপন্যাসে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের রণধ্বনি হিসাবে 'বন্দে মাতরম' সংগীত রচনা করেন। ১৯০৫ সালের পর হিন্দুদের 'বংগভংগ রদ' আন্দোলনে বন্দে মাতরম' জাতীয় সংগীত হিসাবে গাওয়া হয়। এ গানের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা।

যেসব মুষ্টিমেয় মুসলমান সরকারী চাকুরীতে ছিলেন তাঁদের মানসম্মান ও প্রভাবপ্রতিপত্তি শুধু ক্ষুণ্নই করা হলো না, বরঞ্চ তাঁদের চাকুরীর মেয়াদকাল হুমকির সম্মুখীন করা হলো। বহু ঘটনার মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ একটির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। মধ্য প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন যে, তাঁর মন্ত্রীসভা প্রদেশের একমাত্র মুসলমান বেসামরিক জেলা অফিসারের চাকুরী স্থায়ীকরণের বিষয়টির চরম বিরোধিতা করে। এর একমাত্র

কারণ ছিল এই যে তিনি ছিলেন একজন মুসলমান।

মুসলিম জনসাধারণ তাদের হিন্দু প্রতিবেশী এবং প্রশাসনযন্ত্রের চরম স্বেচ্ছাচারিতার শিকার হয়ে পড়েছিল। মধ্য প্রদেশের কোন কোন বস্তিতে মুসলমানদের ঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং মুসলিম মহিলাদের ইজ্জত আবরু লুণ্ঠন করা হয়। একটি গ্রামের দেড়শ' জন পুরুষ মুসলমানকে হত্যার অভিযোগে কয়েকদিন যাবত পানাহারের সুযোগ ব্যতীত থানায় আবদ্ধ রাখা হয়, নানানভাবে অপমানিত ও নির্যাতিত করা হয়। পরে কোর্ট তাঁদেরকে বেকসুর মুক্তি দান করে। মধ্য প্রদেশের মন্ত্রীগণ কোর্টে অভিযুক্ত মুসলমানদের বিচার চলাকালে (in sub judice cases) মতামত ব্যক্ত করতেন—যার ফলে বিচারকগণ অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতেন। নাগপুর হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি একটি মামলার রায়ে নির্ভিক চিত্তে একথা বলেন যে, পুলিশ, কংগ্রেস নেতা, ম্যাজিস্ট্রেট, হাকিম এবং মন্ত্রী একযোগে নিরপরাধ মানুষকে ফাঁসিমঞ্চের দিকে ঠেলে দিত। এসব হতভাগ্যদের মুসলমান হওয়া ছাড়া আর কোন অপরাধ ছিলনা। (Muslim Separatism in India, Abdul Hamid p. 122)

কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোতে মুসলমানগণ যে নানানভাবে নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছিলেন, তার প্রতিকার কল্পে ২০শে মার্চ, ১৯৩৮ এ অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। পীরপুরের রাজা সাইয়েদ মুহাম্মদ মাহদীকে সভাপতি করে আট সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি উক্ত বছরের ১৫ই নভেম্বর তার পূর্ণাংগ রিপোর্ট পেশ করে। ব্যক্তিগতভাবে সরেজমিনে তদন্ত করেই এ রিপোর্ট পেশ করা হয়।

পরবর্তী বছরের মার্চ মাসে শরীফ রিপোর্ট নামে আর একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। বিহার প্রদেশে মুসলমানদের উপর হিন্দুদের নির্যাতনের কাহিনী বর্ণিত হয় এ রিপোর্টে। কংগ্রেস সরকারগুলোর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগপূর্ণ আর একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে। এ রিপোর্টের প্রণেতা ছিলেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক।

এ তিনটি তথ্যপূর্ণ ও মূল্যবান দলিলপত্র এবং সমসাময়িক মুসলিম পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ঘটনাবলীর ফাইল কংগ্রেসের প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলোর অগণতান্ত্রিক ও মুসলিম বিদ্বেষী ভূমিকার বিরুদ্ধে মুসলমানদের অভিযোগের

মৌলিক উপকরণ ও মালমশলা উপস্থাপন করে। যেহেতু কংগ্রেস শাসনের স্বাভাবিক মেজাজ প্রকৃতি পরবর্তীকালে পাকিস্তানের ধারণা–মতবাদকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল এবং অখন্ড ভারতের মতাদর্শ থেকে মুসলমানদেরকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল, সেজন্যে তদন্ত রিপোর্টে উদ্‌ঘাটিত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করার এবং তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রয়োজন আছে।

পীরপুর রিপোর্ট

পীরপুর রিপোর্টে নিম্ন বিষয়গুলোর উপর জোর দেয়া হয়েছে ঃ

১. কংগ্রেস সরকার সংখ্যালঘুদের (মুসলমানদের) ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা দানে ব্যর্থ হয়েছে।

২. কংগ্রেস একটি হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন বলে প্রমাণিত।

৩. ক্ষমতামদমত্ত কংগ্রেসের রুদ্ধদ্বার নীতি (Closed door policy) অবলম্বন এবং কোয়ালিশন সরকার গঠনে অস্বীকৃতি হিন্দু–মুসলিম সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটিয়েছে।

৪. কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদের ধারণা অনুযায়ী সংখ্যাগুরুর শাসন ও অবিচার উৎপীড়ন থেকে অধিকতর উৎপীড়ন আর কিছু হতে পারেনা।

৫. মুসলিম লীগের কাছে অত্যন্ত অবমাননাকর প্রস্তাব পেশ ঃ যেমন মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি ভেঙ্গে দাও, আইনসভায় লীগদল ভেঙ্গে দিয়ে দ্বিধাহীনচিত্তে কংগ্রেস শপথনামায় স্বাক্ষর কর, ইত্যাদি।

৬. মুসলমানদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে গণসংযোগ আন্দোলন (Mass Contact Movement) এবং কতিপয় মুসলমানকে নানানভাবে খরিদ করে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লাগানো এবং

৭. কংগ্রেস শাসনাধীন প্রদেশগুলোতে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এবং মুসলমানদের জান–মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি।

ফজলুল হক সাহেবের বিবৃতি

কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলোর পদত্যাগের পর পরই বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব এ, কে, ফজলুল হক যে বিবৃতি দান করেন তা একটি প্রচারপত্রের আকারে পুনঃ প্রকাশিত হয়। তিনি তাঁর বিবৃতিতে বলেন ঃ

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দেয়ার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস মারমুখো হিন্দুদেরকে চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের জন্যে মাঠে নামিয়েছে। সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর কংগ্রেস তার ইচ্ছা ও সংকল্প চাপিয়ে দেয়ার জন্যে এ কাজ শুরু করেছে। কংগ্রেস কি চায়? চায় যে, গোমাতা সংরক্ষিত হোক, মুসলমানদেরকে গোমাংস ভক্ষণ করতে দেয়া যাবেনা। মুসলমানদের ধর্মকে অবনত ও দমিত করে রাখতে হবে। কারণ এটা কি হিন্দুদের দেশ নয়?

তারপর শুরু হলো আযানের উপর বাধা নিষেধ। মসজিদে নামাযীদের উপর আক্রমণ। নামাযের সময়ে মসজিদের সম্মুখ দিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে বাজনা বাজিয়ে মিছিল পরিচালনা। দুঃখজনক ঘটনা পাল্টা দুঃখজনক ঘটনা ডেকে আনবে এতে আশ্চর্যের কি আছে?

তারপর বিবৃতিতে বিহারে সংঘটিত বাহাত্তরটি, যুক্ত প্রদেশে তেত্রিশ এবং মধ্য প্রদেশের কতকগুলি দুর্ঘটনার উল্লেখ করা হয়। কোন মুসলমান কোথাও একটি গরু কুরবানীর জন্যে জবাই করলে মুসলমানদের হত্যা করা হয়, তাদের বাড়ি–ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং মুসলিম নারী ও শিশুর উপর নির্যাতন চালানো হয়। এসবের কোন প্রতিকার করা হয় না। ফলে সংখ্যালঘু মুসলমানগণ বড়ো দুঃসহ জীবন যাপন করতে থাকে।

কংগ্রেস শাসনের অধীন মুসলমানদের চরম দুর্দশা বর্ণনা করে জনাব ফজলুল হক যে বিবৃতি দেন, হিন্দু পত্রিকাগুলো তা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে। বরঞ্চ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কল্পিত অভিযোগ ফলাও করে প্রকাশ করতে থাকে। (I. H. Qureshi—The Struggle for Pakistan, A. Hamid—Muslim Separatism in India)

শিক্ষার অংগনেও মুসলমানদের উপর চরম অন্যায় অবিচার শুরু হয়েছিল যার জন্যে মুসলিম সুধীবৃন্দ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হয়ে পড়েন। ব্রিটিশ শাসন আমলে মুসলমানগণ শিক্ষা ক্ষেত্রে খুবই পশ্চাদপদ ছিলেন যার জন্যে তাঁদেরকে নানান অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো। কংগ্রেস শাসন আমলে তাদের শিক্ষানীতি তাদেরকে দারুণভাবে শংকিত ও বিচলিত করে। ১৯৩৮ সালের শেষভাগে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিলভারত মুসলিম এডুকেশনাল কন্‌ফারেন্সের (All India Muslim Educational Conference) ৫২–তম অধিবেশনে নবাব কামাল ইয়ার জং বাহাদুরের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

উদ্দেশ্য ছিল ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা এবং মুসলিম শিক্ষার একটি স্কীম তৈরী করা যাতে তাদের সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যাবলী সংরক্ষিত হয়। বাংলার আইন পরিষদের স্পীকার এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার স্যার আজিজুল হকের নেতৃত্বে একটি সাব কমিটি গঠিত হয়। সাব কমিটি সঠিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থান সফর করেন এবং ১৯৪২ সালে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করেন। বিদ্যামন্দিরগুলোতে যে ওয়ার্ধা স্কীম অব এডুকেশন চালু করা হয়েছিল, রিপোর্টে তার তীব্র সমালোচনা করা হয়। বিশেষ করে মধ্যপ্রদেশে এ এক জঘন্য আকার ধারণ করে। মুসলমানদের চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী এ শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখা হয়। এ শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকর করার জন্যে মধ্য প্রদেশ আইনসভায় একটি বিল পেশ করা হয়। সকল মুসলিম সদস্য এবং ডাঃ খারে সহ কতিপয় হিন্দু সদস্য বিরোধিতা করেন। সকল বিরোধিতা উপেক্ষা করে বিলটি পাশ করা হয়।

এ ব্যবস্থার অধীনে যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচিত হবে। মুসলিম স্কুলগুলোর জন্যে কোন বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মিঃ গান্ধীর প্রতিকৃতির সামনে হিন্দুদের পূজা অর্চনার ভংগীতে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াতে হতো এবং তাঁর (মিঃ গান্ধীর) বন্দনা গাইতে হোত। এ মূল পরিকল্পনা—ওয়ার্ধা স্কীম ছিল গান্ধীমানসিকতার সৃষ্টি। শিশুদের মনে হিন্দু ধর্মীয় ভাবধারা অংকিত করা এবং হিন্দু পৌরাণিক মনীষীদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার মনোভাব সৃষ্টি করা। এভাবে মুসলমানদেরকে তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও পরম্পরাগত ঐতিহ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখাই ছিল এ শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য। কংগ্রেস শিক্ষা ব্যবস্থার মূলনীতি ছাড়াও এর কিছু খুঁটিনাটি বিষয়ও মুসলমানদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বোম্বে প্রদেশে স্কুলগুলোতে বহু নতুন প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তক প্রচলিত করা হয়। স্থানীয় শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এসব পুস্তক থেকেই পাঠ্যতালিকা তৈরী করতেন। মুসলমানদের প্রবল আপত্তি ছিল এই যে, এসব পুস্তকে হিন্দু ঐতিহ্য ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির প্রশংসা করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র হিন্দুয়ানি শব্দমালা ব্যবহার করা হয়েছে।

বোম্বে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ এর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে যে, এ ধরনের প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের দ্বারা কংগ্রেস মুসলমানদের ভবিষ্যত

প্রজন্মকে তাদের সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রেখে এবং তাদের কচিকাঁচা মনকে হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতির ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে ভারতে মুসলিম সভ্যতা সংস্কৃতি ধ্বংস করতে চায়।

বোম্বে মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের মুসলমান সদস্যগণ প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রত্যাহার করার জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করলে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। প্রতিবাদে মুসলিম লীগ সদস্যগণ অধিবেশন থেকে 'ওয়াক আউট' করেন। কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলোর পদত্যাগের পর, উর্দু টেক্সট বুক কমিটি পুনরায় উক্ত পাঠ্য পুস্তকগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তা পাঠের উপযোগী নয় বলে রিপোর্ট দেন এবং তার ফলে সেগুলো অনুমোদিত তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। (Times of India, dt. 11 and 26 July and 14 December, 1939)

উপমহাদেশের এগারোটির মধ্যে সাতটি প্রদেশে আড়াই বছরের কংগ্রেস শাসন এ কথাই প্রমাণ করে যে এখানে কংগ্রেস শাসনের অধীনে সংখ্যালঘু মুসলমানদের সভ্যতা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যসহ অস্তিত্বই মুছে ফেলার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। ১৯৩৮ সালের অক্টোবরে মিঃ জিন্নাহ বলেন, কংগ্রেস সমগ্র উপমহাদেশে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানের সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, যে কেউ ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত সময়কালের ভারতের রাজনৈতিক দৃশ্যপট পর্যবেক্ষণ করলে তিনি দেখতে পাবেন যে, কংগ্রেসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এ দেশ থেকে অন্য সকল সংগঠন নির্মূল করে একটি অতি নিকৃষ্ট ধরনের ফ্যাসিবাদী সংগঠন কায়েম করা। এমতাবস্থায় ভারতে একটি সংসদীয় সরকার পরিচালনা করা অসম্ভব। এখানে গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে হিন্দুরাজ। এ অবস্থা মুসলমানগণ কিছুতেই মেনে নিতে পারেনা। [Jamiluddin Ahmad (Ed.) —Some Recent Speeches & Writings of Mr. Jinnah (Lahore, 1952]

কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলোর মুসলিম বিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে নিরপেক্ষ মহলও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, এখানে সংখ্যাগুরুর শাসনে মুসলমানদের আশংকা অমূলক নয়। জনৈক ভারতীয় খৃষ্টানের মতে কংগ্রেস হচ্ছে জার্মানীর নাৎসী পার্টির ভারতীয় সংস্করণ। (Rev. Pitt Banarjee—Letter of Manchester Guardian. 18 August 1942; I.H. Qureshi —The Struggle for Pakistan)

বিভিন্ন পত্রিকার অভিমত

কংগ্রেসের সাতটি প্রদেশে সরকার গঠনের ফলে হিন্দু জাতীয়তা কেমন উগ্ররূপ ধারণ করে ও সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বৃদ্ধি পায় সে সম্পর্কে কোলকাতার স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা লেখে ঃ প্রত্যেক ভারতপ্রেমিক বিচলিত হবেন এই দেখে যে, প্রাদেশিক অটোনমি স্থাপিত হওয়ার দরুন কী ভয়ানক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইকনমিস্ট পত্রিকা মন্তব্য করেন, প্রদেশগুলোকে সরাসরি দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—মুসলিম ভারত ও কংগ্রেস ভারত। টাইমস্ অব ইন্ডিয়ার একজন প্রাক্তন সম্পাদক বলেন—সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের সন্দেহ শংকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৩৯ সালে ভারত সচিব বেসরকারীভাবে ভারত ভ্রমণ করে বলেছিলেন, হিন্দু মুসলিম বিরোধ কেবল ধর্মীয় কারণে নয়, জীবনধারায় দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়ানক পার্থক্য রয়েছে। কংগ্রেসী প্রাদেশিক সরকারগুলো সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে শাসন চালাতে থাকে। এজন্যে এমন সার্বিক কংগ্রেসী প্রতাপের অভিব্যক্তিতে বৃটেনের কংগ্রেস সমর্থকগণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। কংগ্রেসের হিন্দুকরণ নীতি, বন্দে মাতরম সংগীত ও গান্ধীর প্রতিকৃতি পূজা শিক্ষাংগনে প্রবর্তন প্রভৃতি সহজেই প্রমাণ করে যে নতুন শাসন ব্যবস্থায় পুরোপুরি হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। (The British Achievement in India : A Survey, Rawlinson; p. 214; মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, আবদুল মওদূদ, পৃঃ ২৮৭)

হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ অন্য কোন সম্প্রদায় এবং বিশেষ করে মুসলমানদের কিছুতেই বরদাশ্‌ত করতে রাজী নয়। যার কারণে ভারতে হিন্দু–মুসলিম মিলন সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে মুসলমানগণ মোটেই দায়ী নন। মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে হিন্দুভারত সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত করে। কিন্তু এ কথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবেন যে তিনি ছিলেন হিন্দু মুসলিম মিলনের অগ্রদূত? তিনি বহু বছর ধরে এ মিলনের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে নিরাশ হয়ে ভারতভূমি ত্যাগ করেন এবং আর কোন দিন ভারতে আসবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু পরে তাঁকে মুসলমানদের ন্যায্য দাবী ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামের লক্ষ্যে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হয়।

হিন্দু মুসলিম মিলন তো দূরের কথা হিন্দুদের চরম মুসলিম–বিদ্বেষের কারণে ১৯২০ সাল থেকে সাত আট বছর সাম্প্রদায়িক দাংগায় সারা দেশ জর্জরিত হয়। ১৯২৩ সালে ১১টি, ১৯২৪ সালে ১৮টি, ১৯২৫ সালে ১৬টি, ১৯২৬ সালে ৩৫টি এবং ১৯২৭ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ৩১টি বিরাট দাংগা অনুষ্ঠিত হয়। ফোর্ট নাইট্‌লী রিভিউতে জনৈক ইংরেজ লেখেন, হিন্দু ও মুসলমানের মিলন পৃথিবীর আরও অনেক অসম্ভব জিনিসের মতো একটা অসম্ভব ব্যাপার। এশিয়াটিক রিভিউ পত্রিকায় জনৈক প্যাট্রিক ফ্যাগান লেখেন, পরাধীন ভারতের মুসলমানের দুটি পথ খোলা আছে—হয় হিন্দু জাতিতে লীন হয়ে যাওয়া, না হয় দৈহিক শক্তি বলে ভারতের কোন কোন অঞ্চলে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কায়েম করা। (মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, আবদুল মওদূদ–২৮৬)

ভারতে সাম্প্রদায়িক দাংগা–হাংগামা কোন বছরই বন্ধ থাকেনি। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোতে এসব দাংগা সংঘটিত হয়। একথাও সত্য যে সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায় এসব দাংগার উদ্যোক্তা এবং তারাই মূলতঃ দায়ী। কিন্তু মিঃ গান্ধী চোখ বন্ধ করে সকল ক্ষেত্রেই মুসলমানদেরকে দায়ী করেছেন। ফলে প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

আড়াই বছরের কংগ্রেসী শাসনে যে হিন্দু রামরাজ্যের নমুনা স্থাপিত হয়েছিল এবং মুসলমানদের ভাগ্যে যে চরম দুর্দশা নেমে এসেছিল তার কিঞ্চিৎ আলোচনা উপরে করা হয়েছে। এ সময়ে, ১৯৩৮ সালে সুভাসচন্দ্র বোস কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁকে অন্যান্যের তুলনায় খানিকটা উদারচেতা মনে করা হতো। তাঁর সাথে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর দীর্ঘ পত্র বিনিময় হয়। কায়েদে আজম বারবার মিঃ সুভাসচন্দ্র বোসকে একথা বলেন যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একত্রে মিলিত হয়ে সকল বিবাদ ও মতপার্থক্যের মীমাংসা করা হোক। কায়েদে আজম কংগ্রেস মুসলিম লীগ তথা হিন্দু মুসলিম মিলনের সর্বশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু সুভাস বোস কায়েদে আজমের পত্রের জবাবে বলেন ঃ

লীগের সাথে আলাপ আলোচনার ব্যাপারে ওয়ার্কিং কমিটির করার আর কিছু নেই। (Muslim Political Thought through the Ages 1562-1947- G. Allana Moqbul Academy, Lahore, P-242)

কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৩৮ সালে পাটনায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে বলেন ঃ

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ চান যে মুসলমান ভারতে হিন্দুরাজ শর্তহীনভাবে মেনে নিক। · · · আপনারা অবশ্যই জানেন যে কংগ্রেস ফ্যাসীবাদী প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব করার উদ্দেশ্যে হিন্দু মুসলিম সমঝোতার সকল পথ রুদ্ধ করেছে। তিনি বলেন, ভারতে চারটি শক্তি ক্রিয়াশীল— (১) ব্রিটিশ, (২) ভারতীয় রাজ্যের শাসকবৃন্দ, (৩) হিন্দু এবং (৪) মুসলমান। কংগ্রেস পত্র-পত্রিকা যতোই ফলাও করে প্রকাশ করুক না কেন; সকালে, দুপুরে, বিকেলে ও রাতে তাদের সংস্করণ বের করুন এবং কংগ্রেস নেতারা যতোই গলাবাজি করুন যে, কংগ্রেস একটি জাতীয় সংগঠন, আমি বলি তা মোটেই সত্য নয়। এ একটা হিন্দু সংগঠন ব্যতীত কিছু নয়। এটাই সত্য কথা এবং কংগ্রেস নেতারা তা ভালো করে জানেন। এতে কয়েকজন মাত্র—কয়েকজন বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট—কয়েকজন মুসলমান খারাপ মতলবে সংশ্লিষ্ট থাকলেই তা জাতীয় সংগঠন হয় না, হতে পারে না। কংগ্রেস প্রধানতঃ একটি হিন্দু সংগঠন এবং আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি কেউ তা অস্বীকার করুক দেখি। আমি জিজ্ঞেস করি কংগ্রেস কি মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে?

শ্রোতাগণ সমস্বরে জবাব দেন—না, না, না।

আমি জিজ্ঞেস করি—কংগ্রেস কি খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে? তফ্সিলী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে? অব্রাহ্মণদের প্রতিনিধিত্ব করে? জনগণ প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে সমস্বরে বলে না, না, না।

তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস সকল হিন্দুরও প্রতিনিধিত্ব করেনা। হিন্দু মহাসভা-লিবারাল ফেডারেশন-এদেরও প্রতিনিধিত্ব করেনা। তবে নিঃসন্দেহে কংগ্রেস একটি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। এছাড়া আর কিছু নয়।

তিনি বলেন, দেশের জন্যে দুর্ভাগ্য যে, কংগ্রেস হাইকমান্ড অন্যান্য সম্প্রদায় ও সংস্কৃতি নির্মূল করে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে একেবারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

কায়েদে আজম অতঃপর একটি একটি করে কংগ্রেসের ভূমিকার উল্লেখ করে প্রমাণ করেন যে, কংগ্রেস জাতীয় সংগঠন নয়। তিনি বলেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় এসে কি করে? জাতীয়তাবাদের ভান করলেও 'বন্দে মাতরম' দিয়ে কাজ শুরু করে। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, 'বন্দে মাতরম' জাতীয় সংগীত নয়।

তথাপি তা জাতীয় সংগীত হিসাবে গাওয়া হয় এবং অন্যান্যদের উপরও চাপিয়ে দেয়া হয়। এ শুধু তাদের দলীয় সমাবেশেই গাওয়া হয় না। বরঞ্চ সরকারী ও মিউনিসিপাল স্কুলগুলোতেও তা গাইতে সকলকে বাধ্য করা হয়। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস তা গাইতে অনুমতি দিক না দিক, 'বন্দে মাতরম' জাতীয় সংগীত হিসাবে অবশ্যই মুসলমানদের মেনে নিতে হবে। এ হচ্ছে পৌত্তলিকতা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা উদ্রেককারী স্তুতিগান।

তিনি বলেন, তারপর কংগ্রেস পতাকার কথাই ধরা যাক। এ ভারতের সর্বজনস্বীকৃত জাতীয় পতাকা নয়। তথাপি তার প্রতি প্রত্যেকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে এবং তা সরকারী বেসরকারী সকল গৃহে উত্তোলন করতে হবে। মুসলমানরা এ নিয়ে যতোই আপত্তি করুক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না। কংগ্রেস পতাকা ভারতের জাতীয় পতাকা হিসাবে অবশ্যই উত্তোলন করতে হবে এবং মুসলমানদের উপর তা জোর করে চাপিয়ে দিতে হবে। অতঃপর তিনি হিন্দী হিন্দুস্থানী স্কীম সম্পর্কে বলেন যে, উর্দুকে দাবিয়ে রাখা ও তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য।

ওয়ার্ধা শিক্ষা প্রকল্প

মিঃ গান্ধীর সকপোলকল্পিত ওয়ার্ধা শিক্ষা প্রকল্পের (Wardha Scheme of Education) ভয়াবহ পরিণাম উপরের আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে।

কায়েদে আজম তাঁর ভাষণে বলেন ঃ আজকাল হিন্দু মানসিকতা ও দৃষ্টিভংগী সতর্কতার সাথে পরিপুষ্ট করা হচ্ছে এবং মুসলমানদেরকে তাদের দৈনন্দিন জীবনে হিন্দু আদর্শ ও ভাবধারা অবলম্বনে বাধ্য করা হচ্ছে। মুসলমানরা কি কোথাও এ ধরনের কোন কিছু করছে? কোথাও কি তারা হিন্দুদের উপর মুসলিম সংস্কৃতি চাপিয়ে দিচ্ছে? বরঞ্চ মুসলমানদের উপর হিন্দু সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে তারা সামান্য প্রতিবাদ ধ্বনি করলেই তাদেরকে সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত করা হয়। তাদেরকে বলা হয় শান্তি বিনষ্টকারী এবং সঙ্গে সঙ্গেই স্বৈরাচারী সরকারী প্রশাসন যন্ত্র তাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে পড়ে। বিহারে সংঘটিত ঘটনাবলীর কথাই ধরুন না কেন, কংগ্রেস সরকারের অধীন কাদের সংস্কৃতির উপর আঘাত হানা হয়েছে? মুসলমানদের। কাদের বিরুদ্ধে দমননীতি অবলম্বন করা হয়েছে, নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে এবং কাদেরকে গ্রেফতার

করা হয়েছে? মুসলমানদের বিরুদ্ধেই এসব কিছু করা হয়েছে। কিন্তু এমন একটি দৃষ্টান্তও কি কেউ পেশ করতে পারে যে মুসলিম লীগ অথবা কোন মুসলমান মুসলিম-সংস্কৃতি হিন্দুদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে? (Creation of Pakistan, Justice Syed Shameem Hossain Kadir. pp. 139-143)

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলিম লীগ–কংগ্রেস আলোচনা

উনিশ শ' পঁয়ত্রিশ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময়কাল পর্যন্ত মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে কংগ্রেসের সাথে সমঝোতায় আসার বহু চেষ্টা করা হয়। এতদুদ্দেশ্যে কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের সাথে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর কয়েক দফা বৈঠক হয়। কিন্তু এসব বৈঠকে কোন লাভ হয়নি। সর্বশেষ উভয় নেতার পক্ষ থেকে যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয়, তাতে বলা হয়, সংশ্লিষ্ট সকল দলের নিকট গ্রহণযোগ্য সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান কল্পে যে প্রচেষ্টা চালানো হয় তা অবশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় বলে তাঁরা দুঃখিত।

আটত্রিশের শুরুতে জিন্নাহ–গান্ধীর মধ্যে পত্র বিনিময় হয়। উভয় দলের মধ্যে যে মৌলিক মতপার্থক্য ছিল, তা এ পত্র বিনিময়ের দ্বারা সুস্পষ্ট হয়। কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ তেসরা মার্চ ১৯৩৮ মিঃ গান্ধীর নিকটে যে পত্র লেখেন, তাতে দুটি বাক্যে তিনি তাঁর আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মুসলিম লীগকে ভারতের মুসলমানদের একমাত্র নির্ভরশীল ও প্রতিনিধি মূলক দল হিসাবে মেনে নিন এবং অপর দিকে আপনি কংগ্রেস ও সারা দেশের প্রতিনিধিত্ব করুন। একমাত্র এর ভিত্তিতে আমরা সম্মুখে অগ্রসর হতে পারি এবং অগ্রগতির প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করতে পারি। জবাবে মিঃ গান্ধী ৮ই মার্চ বলেন, যে অর্থে আপনি বলছেন, সে অর্থে আমি কংগ্রেস অথবা হিন্দু কোনটারই প্রতিনিধিত্ব করি না। তবে সম্মানজনক সমাধানে পৌঁছার জন্যে আমি হিন্দুদের প্রতি আমার নৈতিক প্রভাব খাটাব। (The full Text of Jinnah-Gandhi letters in Durlab Singh, pp. 16-32. The Struggle for Pakistan-I.H. Qureshi, p. 109)

মিঃ গান্ধীর উপরোক্ত জবাবে কোন সত্যতা ও আন্তরিকতা ছিলনা। কোন একটি সংগঠনের ঘোষিত নীতি–পলিসি যাই হোক না কেন, তার সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায় তার বাস্তব কার্যকলাপ ও আচার আচরণে। কংগ্রেস যে

পরিপূর্ণ একটি হিন্দু সংগঠন ছিল তা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। কংগ্রেসের আচার আচরণে সর্বদা হিন্দু চেতনা ও স্বার্থেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ভারতে খেলাফত আন্দোলনে কংগ্রেসের সহযোগিতার কারণে কারো মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু সে সহযোগিতায় কোন আন্তরিকতা ছিলনা। তাতে দুরভিসন্ধিই লুকায়িত ছিল, গান্ধীজির নিজের উক্তিই তার প্রমাণ। তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস করি, খেলাফত আমাদের দুজনের নিকট কেন্দ্রীয় বিষয়—মুহাম্মদ আলীর নিকট এটা তাঁর ধর্ম। আর আমার নিকট হচ্ছে খেলাফতের জন্যে জীবনপাত করে আমি গো-নিরাপত্তা নিঃসংশয় করছি। অর্থাৎ আমার ধর্মকে মুসলমানের ছুরিকা থেকে রক্ষা করছি। (S.K. Majumder: Jinnah & Gandhi, p. 61; মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, আবদুল মওদূদ-পৃঃ ১৬৮)

নিজড ক্রনিক্‌ল-এর প্রতিনিধির কাছে মিঃ গান্ধী বলেন, এখানে একটি মাত্র দল আছে যা উন্নতি ও কল্যাণ করতে পারে। আর তা হলো কংগ্রেস। কংগ্রেস ব্যতীত আর অন্য কোন দল আমি মেনে নিতে রাজী না।

তিনি আরো বলেন, যে কোন মন্দ নামেই ডাকুক, ভারতে একটি মাত্র দল আছে এবং তা হলো কংগ্রেস। (Muslim Separatism in India, Abdul Hamid, p. 217)

কায়েদে আজম পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর সাথেও পত্র বিনিময় করেন। উল্লেখ্য যে, প্রাদেশিক আইনসভাগুলোর নির্বাচনের পর পন্ডিত জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেছিলেন, দেশে মাত্র দুটি দল আছে— কংগ্রেস এবং সরকার। আর যারা আছে তাদেরকে অবশ্যই কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। যারা আমাদের সাথে নেই, তারা আমাদের বিরোধী। (Muslim Separatism in India, Abdul Hamid, p. 217)

জওহরলাল নেহরুর ফ্যাসীবাদী মনমানসিকতা জানা সত্ত্বেও কায়েদে আজম উভয় দলের মধ্যে একটা আপোস নিষ্পত্তির জন্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। পন্ডিত নেহরু ৬ই এপ্রিল (১৯৩৮) তারিখে লিখিত দীর্ঘ পত্রে কায়েদে আজমের সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস 'বন্দে মাতরম' সংগীত ত্যাগ করতে রাজী নয়। কারণ একটা জাতীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে এ ধরনের কিছু করা সংগত হবে না। কংগ্রেস পতাকা ব্যবহারেও তো কারো কোন আপত্তি

দেখিনা। মুসলিম লীগ একটি গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক সংগঠন বিধায় তার সাথে আমরা সে ধরনের আচরণই করি। অন্যান্য মুসলিম সংগঠনগুলোকেও উপেক্ষা করা যায় না। অতএব মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র সংগঠন হিসাবে স্বীকার করার প্রশ্নই ওঠেনা।

পত্রে তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস উর্দুকে খর্ব করার কোন চেষ্টা করছে, অথবা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে তা আমার জানা নেই। কে এসব করছে? তিনি আরও বলেন, কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা বলতে কি বুঝায় তা আমার জানা নেই।

তাঁর কথার সহজ সরল অর্থ এই যে, প্রদেশগুলোতে মুসলিম লীগ অথবা অন্য কোন দলের সাথে ক্ষমতার অংশীদারিত্বে কংগ্রেস কিছুতেই রাজি নয়, এ কথায় সে অটল। পত্রের শেষে নেহরু বলেন, কোন চুক্তি বা সমঝোতা এবং এ ধরনের কোন কিছু ব্যক্তিগতভাবে আমি পছন্দ করি না।

সুভাসচন্দ্র বোস ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। গান্ধী-নেহরুর সাথে পত্রালাপে ব্যর্থতার পর কায়েদে আজম সুভাস বোসের সাথে পত্র বিনিময় করেন। মে মাসে কায়েদে আজম মিঃ বোসের লিখিত পত্র আলোচনার জন্যে মুসলিম লীগ কার্যকরী পরিষদে পেশ করেন। এর উপর যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে বলা হয় যে, হিন্দু মুসলিম মতবিরোধের মীমাংসা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে কংগ্রেসের সাথে কোন আলোচনা করতে মুসলিম লীগ রাজি নয় যতোক্ষণ না মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের আস্থাভাজন এবং প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হিসাবে মেনে নেয়া হবে। তদনুযায়ী কায়েদে আজম মিঃ বোসের নিকটে দুসরা আগষ্ট লিখিত পত্রে বলেন,

লাখ্‌নোতে ১৯১৬ সালে যে কংগ্রেস-মুসলিম লীগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাতে মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের আস্থাভাজন ও প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হিসাবে মেনে নেয়া হয়। সে সময় থেকে ১৯৩৫ সালে জিন্নাহ-রাজেন্দ্রপ্রসাদ আলোচনা পর্যন্ত এ নিয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। যেসব মুসলমান কংগ্রেসে আছে, তাঁরা ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনা। মুসলিম লীগের এ কথাও জানা নেই যে, কোন মুসলিম রাজনৈতিক দল ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের দাবী করেছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এর এক বিস্ময়কর জবাব আসে। অর্থাৎ মুসলিম লীগের কোন দাবীই কংগ্রেস মানতে রাজি নয়। (The Struggle for Pakistan, I. H. Qureshi, pp. 107-112)

কংগ্রেস-মুসলিম লীগের আলাপ আলোচনা ও পত্র বিনিময়ের ফলে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্ট হয় যা অতি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমতঃ কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলোর বিরুদ্ধে অত্যাচার অবিচারের অভিযোগ কংগ্রেস অস্বীকার করে। দ্বিতীয়তঃ কংগ্রেস হিন্দু মুসলিম সমস্যাকে কোন সমস্যাই মনে করেনা। তার মতে এ এক সাময়িক ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাস। সময়ের পরিবর্তনে তা বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত হবে। তৃতীয়তঃ কংগ্রেসের দাবী এই যে, তা সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন। কংগ্রেস একমাত্র অকৃত্রিম জাতীয় সংগঠন যা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতিনিধিত্ব করে। অনেক মুসলিম রাজনৈতিক দল কংগ্রেসকে সমর্থন করে। শুধুমাত্র মুসলিম লীগ দূরে অবস্থান করছে। আর কত দিন তারা এভাবে থাকবে? হয়তো সত্বরই কংগ্রেসের সাথে ভিড়ে যাবে। অতএব মুসলিম লীগের দাবীর প্রতি গুরুত্বদানের প্রয়োজন কি?

কংগ্রেসের উপরোক্ত দৃষ্টিভংগী মুসলিম লীগের মধ্যে স্বভাবতঃই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং মুসলিম লীগকে ঐক্যবদ্ধ, সংহত ও শক্তিশালী করে। এ দীর্ঘ আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট হয় যে কংগ্রেস হিন্দু ভারতের প্রতিনিধিত্বকারী একটি দল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে দাবিয়ে রাখাই শুধু তার উদ্দেশ্য নয়, তাদেরকে নির্মূল করাও তার উদ্দেশ্য। বাল গংগাধর তিলকের আন্দোলন, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শুদ্ধি আন্দোলন, কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার রাজনৈতিক দর্শনের একই লক্ষ্য ছিল এবং তা হলো মুসলমানদেরকে দমিত ও বশীভূত করে রাখা অথবা নির্মূল করে হিন্দু রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা।

উল্লেখ্য ১৯০৬ সালে বংগভংগ রদ আন্দোলন চলাকালীন সারা ভারতে হিন্দুধর্ম পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে 'শিবাজী উৎসব' পালন করা হয়। সকল হিন্দু সমাজ নেতা, রাজনীতিবিদ, কবি, সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতী এ উৎসবে সানন্দে যোগদান করেন। এ উপলক্ষে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শিবাজী উৎসব' লিখে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন কর্মে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেন এবং 'শুভশঙ্খনাদে জয়তু শিবাজী' উচ্চারণ করে এ ধ্যানমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন ঃ

ধজা ধরি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী বসন-
দরিদ্রের বল।
এক ধর্মরাজ্য হবে 'এ ভারতে' এ মহাবচন
করিব সম্বল।

রাজনীতি ও হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন অংগাংগীরূপে মিশে গেল। ধর্মীয় বোধের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় রাজনীতিকে গণআন্দোলনে রূপায়িত করার চেষ্টা হলো।

(B. B. Misra : The Indian Class : Their Growth), আবদুল মওদুদ : মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে 'দি টাইম্‌সের' সংবাদদাতা স্যার ভ্যালেন্টাইন চিরলকে তাঁর এক মুসলমান বন্ধু বলেন, তিলক, তাঁর অনুসারিগণ এবং পাঞ্জাব ও বাংলার হিন্দু জাতীয়তাবাদীগণকে প্রকাশ্যে বলাবলি করতে শুনা যায় যে, অতীতে স্পেন থেকে যেভাবে মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করা হয়, ঠিক তেমনি ভারত থেকে মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করা হবে। স্যার ওয়াল্টার লরেন্সও অনুরূপ কথা বলেন। তিনি ছিলেন ভাইসরয় কার্জনের ষ্টাফ সদস্য। তিনি ইদোরের মহারাজা স্যার প্রতাপ সিংকেও অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করতে শুনেন। তিনি বলেন ঃ তিনি (স্যার প্রতাপ সিং) মুসলমানদেরকে ঘৃণা করতেন। কিন্তু আমার ভারত ত্যাগের পূর্বে তাঁর এ ঘৃণার গভীরতা উপলব্ধি করতে পারিনি। লর্ড কার্জন আমার এবং আমার স্ত্রীর সম্মানে শিমলায় যে ডিনার দিয়েছিলেন তাতে যোগদানের জন্যে স্যার প্রতাপও শিমলা আগমন করেন। ডিনার শেষে স্যার প্রতাপ রাত দুটো পর্যন্ত তাঁর আশাআকাংখা ও অভিলাষ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন। তাঁর অভিলাষের মধ্যে একটি হলো ভারতের বুক থেকে মুসলমানদের নির্মূল করা। ... তিনি ভালো ইংরেজী জানতেন, বহু জাতির সাথে মিশেছেন, ছিলেন বিশ্বজনীন সভ্যতায় বিশ্বাসী। কিন্তু তাঁর মহৎ হৃদয়ের তলায় ছিল মুসলমানদের জন্যে দুরপনেয় ঘৃণা।

(Sir Walter Lawrence : The India We Served, p. 209; Abdul Hamid : Muslim Separatism in India, pp. 83-84)

নিরপেক্ষ মন নিয়ে যিনিই উপমহাদেশের হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের চুলচেরা বিশ্লেষণে সক্ষম হয়েছেন, তাঁর কাছে মুসলমানদের সম্পর্কে উক্ত হিন্দু মানসিকতাই ধরা পড়েছে। তাই এশিয়াটিক রিভিউ পত্রিকায় প্যাট্রিক ফ্যাগান তাঁর এক লিখিত প্রবন্ধে বলেন, পরাধীন ভারতে মুসলমানের দুটি মাত্র পথ খোলা আছে, একটি হিন্দু জাতিতে লীন হয়ে যাওয়া অন্যটি দৈহিক শক্তি বলে ভারতের কোন কোন অঞ্চলে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্টি করা। অবশেষে ভারতের দশ কোটি মুসলমানের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রাণপণ সংগ্রাম ব্যতীত উপায়ান্তর রইলোনা।

চতুর্থ অধ্যায়

পাকিস্তান আন্দোলন

এ উপমহাদেশের বুকে 'পাকিস্তান' নামে মুসলমানদের একটি স্বাধীন সার্বভৌম আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সকল যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে অত্যন্ত ন্যায়সংগত। কারণ এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উপরেই ছিল উপমহাদেশের মুসলমানদের অস্তিত্ব একান্তভাবে নির্ভরশীল। পাকিস্তান আন্দোলনের দাবী একদিকে যেমন বৃটিশ সরকার মেনে নিতে পারেননি, অপরদিকে হিন্দুকংগ্রেসও শুধু মেনে নিতেই অস্বীকার করেনি, বরঞ্চ সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বিরোধিতা করেছে। তথাপি উপমহাদেশের দশকোটি মুসলমানের ক্রমাগত সাত বছর যাবত ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ফলে এবং লক্ষ লক্ষ মুসলিম নরনারীর রক্তের বিনিময়ে পাকিস্তান নামে একটি স্বাধীন দেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে। এ পাকিস্তান আন্দোলনের পশ্চাতে যে আদর্শিক ও ইসলামী চেতনা সক্রিয় ও বলবৎ ছিল তা মুসলিম জাতির এক চিরস্মরণীয় বস্তু এবং এর বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস ভবিষ্যৎ মুসলিম প্রজন্মের জানা ও স্মরণ রাখা একান্ত আবশ্যক।

লর্ড কার্জন কর্তৃক শুধুমাত্র প্রশাসনিক কারণে ১৯০৫ সালের বংগভংগ এবং হিন্দুদের বংগভংগ রদ আন্দোলন ও ১৯১১ সালে তা রহিতকরণ, উপমহাদেশের যত্রতত্র এবং যখন তখন মুসলমানদের গায়ে পড়ে হিন্দুদের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সৃষ্টি এবং মুসলমানদের জানমালের প্রভূত ক্ষতিসাধন এবং সাতটি প্রদেশে আড়াই বছর কংগ্রেসের কুশাসন সম্পর্কে এ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনায় এ সত্যটি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, এ উপমহাদেশে হিন্দুজাতি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ও শক্তিশালী হওয়ার কারণে মুসলিম জাতিকে হয় তাদের দাসানুদাস বানিয়ে রাখতে অথবা নির্মূল করতে চায়। এ লক্ষ্য হাসিলের জন্যেই কংগ্রেসের দাবী ছিল এই যে এ উপমহাদেশের অধিবাসীদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ সরকারকে তার হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। এই সাথে কংগ্রেসের আর একটি অদ্ভুত ও অবান্তর দাবী ছিল এই যে, এ উপমহাদেশে

বসবাসকারী সকলে মিলে একজাতি—ভারতীয় জাতি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এ উপমহাদেশ কোন এক জাতির নয় বরঞ্চ বহু জাতির আবাসভূমি। তাদের মধ্যে প্রধান ও উল্লেখযোগ্য হিন্দু ও মুসলিম জাতি। হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ এবং হিন্দুরামরাজ্য স্থাপনই ছিল কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য। কংগ্রেস ও তার কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন আচরণে এ বিশ্বাস মুসলমানদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় এবং এ কারণেই মুসলমানগণ পাকিস্তান আন্দোলন করতে বাধ্য হন।

এখন দেখা যাক কংগ্রেসের ভারতীয় জাতীয়তা ও রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে হিন্দু ঐতিহাসিকগণ কি বলেন।

ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন ঃ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে হিন্দু জাতীয়তা জ্ঞানের উন্মেষ হয়, তার প্রকৃত রূপ ছিল হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন যার একমাত্র লক্ষ্য ছিল 'রামরাজ্য' স্থাপন। তখন বাংলাদেশে হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠায়, পুনায় সার্বজনীন সভা ও মাদ্রাজে মহাজন সভা প্রতিষ্ঠায় মূলত প্রাচীন হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টাই লক্ষিত হয়েছিল। দয়ানন্দের ১৮৮২ সালে 'গোরক্ষিণী সমিতি' প্রতিষ্ঠা ও ১৮৯৬ সালে বালগংগাধর তিলকের 'শিবাজী উৎসব' অনুষ্ঠান একই অনুপ্রেরণা প্রসূত। বংকিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনাও একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাঁর 'আনন্দমঠ' গ্রন্থ ও 'বন্দে মাতরম' মন্ত্র সমস্বরে প্রচারিত করেছে—হিন্দুধর্ম, জাতি ও জাতীয়তা জ্ঞান একই অবিভাজ্য বিষয়—এ তিনের একই চিন্তাধারার অভিব্যক্তি। এ জন্যে মুসলিম শিরে তাঁর অভিশাপ, গালাগালি ও বিদ্বেষ বিষ বর্ষণে কিছুমাত্র কৃপণতা ছিলনা। ··· সেকালে বাংলায় আমাদের মহৎ বীরদের সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায়, রাজপুত, মারাঠা ও শিখ বীরদের জীবনী আমদানী করতে হয়েছে। রাজা প্রতাপের দেশপ্রেম ও শিবাজীর বীরত্বব্যঞ্জক কর্মসমূহ তখন আমাদের ঘরে ঘরে কীর্তিত হতো। অন্য কোনও সাহিত্যে এমন বীর রসাত্মক কবিতার সাক্ষাৎ মিলবেনা, যেমন কবিতা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ শিবাজীর উপর এবং শিখগুরু বান্দা ও গুরু গোবিন্দের উপর। বস্তুতঃ জাতি বৈরিতার যে তীব্র আন্দোলন সমকালীন বাংলা সাহিত্য ও সংবাদপত্রের মারফৎ উত্থিত হয়েছিল ও তীব্ররূপ ধারণ করেছিল, পৃথিবীর কোন দেশের সাহিত্যেই তার তুলনা নেই। (Dr. R. C. Majumdar : History of Freedom Movement. pp. 202-205; আবদুল মওদূদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ২৬৭)

কংগ্রেসের জাতীয়তার অর্থ যে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন এবং হিন্দু রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা তা ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের কথায়ই সুস্পষ্ট হয়ে গেল। এ জাতীয়তার মধ্যে মুসলমানদের স্থান কিভাবে হতে পারে? তার পরেও কংগ্রেসের ভারতীয় জাতীয়তার দাবী চরম প্রতারণা ব্যতীত আর কিছু হতে পারে কি? এ দাবীর উপরেও আলোকপাত করেছেন ডঃ মজুমদার।

তিনি বলেন ঃ ১৮৩৩ সালে কি ভারতীয় জাতীয়তার অস্তিত্ব ছিল? এ প্রশ্নের জবাব হবে না। ··· তখন বাঙালী নেতারা, মায় রামমোহন রায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন অন্যান্য ভারতীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বৃটিশের জয়লাভের জন্যে। ··· ১৮৩৩ সালে বাংলাদেশে দুটি জাতির মানুষ ছিল—হিন্দু ও মুসলমান। যদিও তারা একই দেশের বাসিন্দা ছিল তবুও এক ভাষা ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে ছিল বিভিন্ন। ধর্মে, শিক্ষায়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তারা ছয়শ' বছর ধরে বাস করেছে যেন দুটি ভিন্ন পৃথিবীতে। ··· রামমোহন রায়, দ্বারিকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রমুখ কোলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ মুসলমানদের মনে করতেন হিন্দুদের যতো দুর্গতি ও অলক্ষণের মূল উৎস হিসাবে যা হিন্দুরা নয়শো বছর ধরে সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে। আর তাঁরা বৃটিশ শাসনকে মনে করতেন বিধাতার আশীর্বাদ, যার প্রসাদে হিন্দুরা কুখ্যাত মুসলিম শাসন থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। সমস্ত বাংলাসাহিত্যে ও পত্র-পত্রিকায় মুসলমানদের উল্লেখ করা হতো 'যবন' হিসাবে—তখন বৃটিশকে বিতাড়িত করে হিন্দু বা ভারতীয় শাসন স্থাপনের কোন ইচ্ছাই ছিলনা। এমনকি রাজা রামমোহন রায়েরও এমন ইচ্ছা জন্মেনি। এমনকি প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের মতো বিশিষ্ট নাগরিক প্রকাশ্যে বলতেন যে, যদি ঈশ্বর তাঁকে 'স্বরাজ' ও 'বৃটিশ শাসনের' মধ্যে একটি বেছে নিতে বলেন, তাহলে তিনি শেষেরটাই বিনা দ্বিধায় বেছে নেবেন। (Dr. R. C. Majumdar : History of Freedom Movement, p. 193)

ডঃ মজুমদার হিন্দু ও মুসলমানকে দুটি পৃথক জাতি বলেই প্রমাণ করেছেন। উপরে উল্লেখিত হিন্দু মনীষীগণ মুসলমানদেরকে হিন্দুজাতির শত্রুই মনে করতেন। এ পৃথক ও বিপরীতমুখী দুটি জাতিকে নিয়ে এক ভারতীয় জাতি গঠন কিভাবে সম্ভব? কখন এর উৎপত্তি হয়েছিল এবং এ এক জাতীয়তার উদ্যোক্তা কে ছিলেন?

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ মরহুম কোন যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীতই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেকে হিন্দু কংগ্রেসের সাথে সম্পৃক্ত রাখেন। তিনিও স্বয়ং হিন্দু ও মুসলমানকে দুটি পৃথক জাতিই মনে করতেন। এককালে তাঁর সম্পাদনায় কোলকাতা থেকে প্রকাশিত "দৈনিক আল হেলাল" পত্রিকায় তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন ঃ

'হিন্দু আওর মুসলমানোঁকো আপস্ মে মিলা কর এক কওমিয়ত কি তা'মীর কীয়া চীয্ হ্যায়? কিয়া ইন্‌মে সে এক তেল আওর দুস্‌রা পানি নিহি?"

"হিন্দু ও মুসলমানকে পরস্পর মিলিত করে এক জাতি গঠন কত হাস্যকর! এদের মধ্যে কি একটা তেল এবং দ্বিতীয়টা পানি নয়?

ডঃ মজুমদারও হিন্দু ও মুসলমানের সম্পূর্ণ পৃথক বৈশিষ্ট্যই তুলে ধরেছেন। তাহলে এক ভারতীয় জাতীয়তার ধারণা কাল্পনিক ও প্রতারণামূলকই বলতে হবে। ১৮৫৭ সালে মুসলমান সিপাহীদের প্রচেষ্টায় যে সর্বপ্রথম উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলন শুরু হয় হিন্দুজাতি তারও বিরোধিতা করে। রাজা রামমোহন তো এ স্বাধীনতা যুদ্ধে বৃটিশের জয়লাভের জন্যে 'ঈশ্বরের' কাছে প্রার্থনা করেছেন।

এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিনয় ঘোষ বলেন ঃ সিপাহী বিদ্রোহের (সিপাহীদের আযাদী আন্দোলন) সময় আমাদের জাতীয় প্রেস বিদ্রোহীদের কোনও সহানুভূতি দেখায়নি। ··· তখন সমস্ত প্রেস বৃটিশ শাসনের সুফলের গুণগান করেছে এবং বিদ্রোহীদেরকে সমাজের ইতর শ্রেণীর লোক বলে গালাগালি দিয়েছে। প্রায় সকল সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা এ ভূমিকা পালন করেছে। কারণ তখনকার হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কোনও প্রকার বিদ্রোহ সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলনা। (Benoy Ghosh : History of Bengal 1757-1905, C. U. Contribution, pp. 227-28)

উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলমানকে একত্রে মিলিত করে একভারতীয় জাতীয়তার ধারণা যে কত উদ্ভট তা মিঃ নিরোদ চন্দ্র চৌধুরীর বক্তব্যে প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন ঃ বংগবিভাগ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে চিরন্তন বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে দিল এবং আমাদের মনে তাদের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করে বন্ধুত্বের বাঁধন চিরতরে ছিন্ন করে দিল। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটলো রাস্তাঘাটে, হাটে-বাজারে, শিক্ষাংগনে এবং স্থান করে নিল মানুষের হৃদয়ে।

তিনি আরও বলেন যে, তিনি যে স্কুলে পড়াশুনা করতেন সেখানে মুসলমান সহপাঠীদের সাথে একত্রে বসতে তাঁরা ঘৃণাবোধ করতেন যে, তাদের মুখ থেকে পেঁয়াজের গন্ধ বেরোতো। অতএব হিন্দুদের দাবী অনুযায়ী হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের বসার স্থান পৃথক করে দেয়া হয়েছিল।

মিঃ চৌধুরী বলেন, পাঠাভ্যাস করার আগেই আমাদেরকে বলা হতো যে, একদা এ দেশে মুসলিম শাসনকালে তারা আমাদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করে এবং ভারতে তাদের ধর্ম প্রচার করে এক হাতে কুরআন এবং অন্য হাতে তরবারী নিয়ে। উপরন্তু মুসলিম শাসকরা আমাদের নারী অপহরণ করেছে, আমাদের মন্দির ধ্বংস করেছে এবং আমাদের পবিত্র ধর্মীয় স্থানের অবমাননা করেছে। (N. C. Chaudhury : The Autobiography of an Unknown Indian; Abdul Hamid : Muslim Separatism in India)

এই যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুগ যুগ ধরে অবিরল বিদ্বেষাত্মক অপপ্রচার, হিন্দু কবি সাহিত্যিক কর্তৃক মুসলমানদেরকে 'যবন' ও 'ম্লেচ্ছ' নামে আখ্যায়িত করণ, তারপর তাদেরকে নিয়ে এক জাতি গঠনের অর্থ ছিল এই যে হিন্দুর ধর্মপ্রথা অনুযায়ী মুসলমানদেরকে একটি অতি নিম্নশ্রেণী হিসাবে হিন্দুর দাসানুদাস করে রাখা। অথবা শক্তি বলে তাদেরকে একেবারে নির্মূল করা। মুসলমানগণ এ ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন এবং তাঁরা কিছুতেই একজাতীয়তার ধারণা মেনে নিতে পারেননি।

যে কংগ্রেস উপমহাদেশের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন বলে দাবী করে, এক ভারতীয় জাতীয়তার দাবীদার তার জন্মইতিহাসটা একবার আলোচনা করে দেখা যাক যে সত্যিই সে মুসলমানদের শুভাকাংখী ও প্রতিনিধিত্বকারী কিনা।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা

কংগ্রেসের জন্মের দু'বছর আগে, ১৮৮৩ সালে, জন ব্রাইট 'ইন্ডিয়া কমিটি' গঠন করেন এবং পঞ্চাশজন বৃটিশ এমপিকে তার সদস্য করেন। ১৮৮৫ সালে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত প্রভাবশালী বৃটিশ সিভিলিয়ান এলেন অক্টাভিয়ান হিউম (A.O. Hume) ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস গঠন করেন। তিনি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করার পরও ভারতে রয়ে যান। তিনি ভারতের

সামাজিক পুনরুত্থানের জন্যে একটি সর্বভারতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠার ধারণা পোষণ করতেন যা রাজনৈতিক অগ্রগতির সহায়ক হতে পারে। তদনুযায়ী তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের নিকটে একখানি খোলা চিঠি প্রেরণ করেন। পত্রে তিনি একটি সমিতি ও সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, জনগণের সাথে সরকারের সংযোগ সংস্পর্শ না থাকার কারণে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছেন। পুনর্গঠনের কাজ স্বয়ং দেশবাসীকেই করতে হবে যা বিদেশীদের দ্বারা আশা করা যায় না যতোই তাঁরা এ দেশকে ভালোবাসুক না কেন।

যাই হোক, এলেন হিউমের উপরোক্ত চিন্তাভাবনা ও চেষ্টাচরিত্রের ফলে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস গঠিত হয়। এর পেছনে বড়োলাট লর্ড ডাফরিনের যথেষ্ট আশীর্বাদ থাকলেও তিনি সরাসরি এর সাথে জড়িত হতে চাননি। তবে তিনি আশা পোষণ করতেন যে সংগঠনটি সুদৃঢ় ও সুসংহত হয়ে দায়িত্বশীল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। হিউম প্রস্তাব করেন যে একজন প্রাদেশিক গভর্ণরকে সভাপতিত্ব করার অনুমতি দেয়া হোক। লর্ড ডাফরিন তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। কংগ্রেসের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের পর মাদ্রাজের গভর্ণর প্রতিনিধিবৃন্দকে এক সান্ধ্যভোজে আপ্যায়িত করেন। অতএব সরকার এবং কংগ্রেসের মধ্যে সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণই ছিল। যেহেতু একজন ইংরেজের উদ্যোগেই কংগ্রেস গঠিত হয় সেজন্যে একদল ইংরেজ এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন (WEDDERBURN) জর্জ ইউল (YULE) এবং চার্লস্ ব্র্যাড্‌ল (BRADLAUGH)। চার্লস ব্র্যাড্‌ল (BRADLAUGH) ১৮৮৮ সালে কংগ্রেসের বেতনভুক কর্মচারী নিযুক্ত হন। উইলিয়ম ডিগ্‌বী ছিলেন লন্ডনের বিশেষ প্রচারকর্মী। ইন্ডিয়া পত্রিকা প্রকাশ করে কংগ্রেসের কর্মসূচী এবং ভারতীয় বিষয়াদি বিশেষভাবে ইংরেজ জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়। উইলিয়ম হান্টার ছিলেন কংগ্রেসের বড়ো সমর্থক এবং তাঁর জীবনীকার বলেন, বৃটিশ জনমত প্রভাবিত করার পক্ষে হান্টারের কৃতিত্বই একমাত্র কার্যকর। অধ্যাপক সীলি অক্সফোর্ডের ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেন, ইংল্যান্ড অথবা ফ্রান্সের সংগে ভারতের তুলনা হয় না। ইউরোপের বহু জাতির মতো ভারতে বহু জাতির বাস। স্যার হেনরী জেমসের মতে, ভারতে সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্যে হিন্দুর ধর্মীয়

আচরণই দায়ী। স্যার থিওডোর মরিসন বলেন, মুসলমানরা ইউরোপীয় সংজ্ঞায় জাতি না হলেও অন্য ভারতীয় থেকে নিজেদেরকে স্বতন্ত্র ভাবছে ও জাতি হিসাবে গড়ে উঠছে। (Abdul Hamid : Muslim Separatism in India, p. 29: Justice Syed Shameem Hussain Kadir : Creation of Pakistan, p. 12; আবদুল মওদূদ : মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ; সংস্কৃতির রূপান্তর ঃ পৃঃ ২৭৯-৮০)

একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে কংগ্রেসের চরিত্র বৈশিষ্ট্য কি হতে পারতো, তা কংগ্রেসের দু'জন প্রখ্যাত ও অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতার নীতিপদ্ধতি ও রাজনৈতিক দর্শন ও মূলনীতি থেকে ভালোভাবেই অনুমান করা যেতো। তাঁরা ছিলেন বালগংগাধর তিলক ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী।

তিলক গ্রাজুয়েশনের পর সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করেন এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন বিগত শতাব্দীর আশির দশকের প্রথমদিকে। কিন্তু বংগভংগ রদ আন্দোলনের তিনি ছিলেন পুরোভাগে। তিনি দক্ষ রাজনীতিবিদ ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে (Direct Action) বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি সামরিক মনা মারাঠা জাতির ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করেন এবং কংগ্রেসকে সে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি গো হত্যা নিবারণ সমিতি (Anti-Cow- Slaughter Society) গঠন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এবং মসজিদের সামনে গীতিবাদ্য নিষিদ্ধ করণের প্রতিবাদে আন্দোলন করেন যার ফলে ভারতে সাম্প্রদায়িক হাংগামা শুরু হয়। অতএব তিলকের নেতৃত্বে সকল ক্ষেত্রে হিন্দু পুনরুজ্জীবনের যে তৎপরতা শুরু হয়েছিল তা ছিল অবশ্যই মুসলিম বিরোধী এবং তাঁর 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' এবং 'হিন্দু জাতীয়তাবাদের' মধ্যে কোনই পার্থক্য ছিলনা। (Abdul Hamid : Muslim Separatism in India, p. 30)

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী উনবিংশতি শতাব্দীর ষাটের দশকে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে (ICS) যোগদান করেন। কিন্তু কয়েক বছর পরে চাকুরী থেকে অপসারিত হওয়ার পর রাজনীতিতে যোগদান করেন। তিনি কংগ্রেসের একজন অত্যন্ত প্রভাদশালী কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সকল যোগ্যতা ও দক্ষতা মুসলিম স্বার্থ বিরোধী তৎপরতায় ব্যয়িত করেন।

বংগভংগ আন্দোলনে তিনিই সর্বপ্রথম শিংগা ফুঁকিয়েছিলেন। তিনি বলেন, বাংলা বিভাগের ঘোষণা শুনে মনে হলো যেন আকাশ থেকে আমাদের উপর বজ্রপাত হলো। আমাদেরকে অপমানিত, অপদস্ত ও প্রতারিত করা হয়েছে।

অতঃপর তাঁর উদ্যোগে ১৬ই অক্টোবর (১৯০৫) কোলকাতায় জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। সকল হিন্দু কালো ব্যাজ ধারণ করেন এবং মাথায় ভস্ম মাখেন। অনশন পালন করেন এবং গংগায় স্নান করেন। অতঃপর সন্ধ্যায় আয়োজিত জনসভায় বংগভংগ রহিত করার শপথ গ্রহণ করেন। এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী।

ছ'বছর যাবত হিন্দুদের তীব্র সন্ত্রাসী আন্দোলনের ফলে বংগভংগ ১৯১১ সালে রহিত করা হয়। বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের সান্ত্বনার জন্যে সরকার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেন। সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্তে কতিপয় কংগ্রেস নেতা তাঁদের তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, বাংলায় আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হবে। অতএব সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বড়োলাট লর্ড হার্ডিঞ্জের সাথে সাক্ষাৎ করে। মুখপাত্র সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বলেন, প্রদেশে আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা জাতীয় সম্প্রীতি বিনষ্ট করবে এবং যে দুটি ভিন্ন অঞ্চলে দুটি ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে সে দুটি অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান মতবিরোধ বহুগুণে বেড়ে যাবে। (A Hamid : Muslim Separatism in India, pp. 30, 93)

এসব দৃষ্টান্ত থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, কংগ্রেস একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান। এর লক্ষ্য হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ও রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা।

উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে স্যার সাইয়েদ আহমদ খান ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি কংগ্রেসকে ভালো চোখে দেখতে পারেননি। কংগ্রেসের জন্মইতিহাস, তার কেন্দ্রীয় কাঠামো, পরিচালকবৃন্দ, তার নীতিপলিসি ও উদ্দেশ্য লক্ষ্য বিশ্লেষণ করে বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সাইয়েদ আহমদ উপলব্ধি করেছিলেন যে, কংগ্রেস প্রতি পদে পদে মুসলিম স্বার্থে আঘাত হানবে। তাই তিনি উপমহাদেশের মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানান কংগ্রেসে যোগদান করা থেকে বিরত থাকতে। তিনি বলেন, ভাইসরয়, সেক্রেটারী অব ষ্টেট এবং এমন কি গোটা হাউস্ অব্ কমন্স্ যদি প্রকাশ্যে কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন করে, তথাপি তিনি দৃঢ়তার সাথে এর বিরুদ্ধে অবস্থান করবেন। তিনি আরও বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলো যদি কার্যকর করা হয়, তাহলে বৃটিশ সরকারের পক্ষে শান্তি রক্ষা করা অথবা সহিংসতা ও নিশ্চিত গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা অসম্ভব হয়ে

পড়বে। (Justice Syed Shameem Hussain Kadir : Creation of Pakistan, p. 12; I. H. Qureshi : Struggle for Pakistan, p. 29; The Times— 12 Nov. 1888)

সাইয়েদ আহমদের আশংকা ও ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীকালে প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে। সমসাময়িক মুসলিম পত্র পত্রিকাও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাদের অভিমত ব্যক্ত করে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—মুহামেডান অবজার্ভার, দি ভিক্টোরিয়া পেপার, দি মুসলিম হেরাল্ড, রফিক-এ-হিন্দ, প্রভৃতি।

নিম্নের মুসলিম সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলোও সমস্বরে কংগ্রেসের নিন্দা করে এবং তার তোষামোদে কান না দেয়ার জন্যে মুসলমানদের প্রতি আবেদন জানায়ঃ

সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মুহামেডান এসোসিয়েশন, দি মুহামেডান লিটারারী সোসাইটি অব বেঙ্গল, দি আঞ্জুমনে ইসলাম অব মাদ্রাজ, দিন্দিগাল আঞ্জুমন, মুহামেডান সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব দি পাঞ্জাব। —(Justice Syed Shameem Kadir : Creation of Pakistan, p. 13, 14)

কংগ্রেস মিথ্যা ও কপটতাপূর্ণ প্রচারণার দ্বারা মুসলমান ও বহির্বিশ্বকে প্রতারিত করার চেষ্টা করে। কংগ্রেস সমর্থক কতিপয় ইংরেজও একই ধরনের প্রচারণা চালান। যুক্তরাজ্যে কংগ্রেসের প্রচারকর্মী ডিগবী বলেন, কংগ্রেস সকল জাতি ও শ্রেণীর মুখপাত্র, এমনকি মুসলমানেরও। কংগ্রেসের জন্মদাতা এলেন হিউম কংগ্রেসের সমালোচনা বরদাশ্‌ত করতে পারতেন না। ইংল্যান্ডে গঠিত ইন্ডিয়া কমিটিও কংগ্রেসের সাথে সুর মিলিয়ে কথা বলতো। কিন্তু এতো সবের পরেও উপমহাদেশের মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবেই তার পরিচিতি লাভ করে এবং এটাই ছিল পাকিস্তানের ভিত্তি।

পঞ্চম অধ্যায়

পাকিস্তানের আদর্শিক ভিত্তি

ধর্মীয় বিশ্বাস, আদর্শ, নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, স্বতন্ত্র জীবনবোধ ও জীবন বিধান এবং পরকালে স্রষ্টা রাব্বুল আলামীনের কাছে জবাবদিহির ভিত্তিতে মুসলমান একটি জাতি যা জাতীয়তার অন্যান্য সকল সংজ্ঞা অস্বীকার করে। উপমহাদেশে এ জাতীয়তার তথা ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপিত হয় হিজরী ৯৩ সালের রজব মাসে— তথা ৭১২ খৃষ্টাব্দে- যখন ইমাদ-আদ্দীন মুহাম্মদ বিন কাসিম নামক সতেরো বছর বয়স্ক এক যুবক অধিনায়ক দেবল (বর্তমান করাচী) পোতাশ্রয়ে অবতরণ করেন এবং রাজা দাহিরের বন্দীশালা থেকে মুসলমান নারী শিশুকে মুক্ত করেন। রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সেখানে সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন।

কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন, পাকিস্তান আন্দোলনের সূচনা তখনই হয়, যখন প্রথম মুসলমান সিন্ধু ভূখন্ডে প্রথম পদক্ষেপ করেন। (Justice Shameem Hussain Kadir : Creation of Pakistan, 1)

দেবল অর্থাৎ করাচীর পর নিরন (বর্তমান হায়দরাবাদ) এবং তারপর সিহ্‌ওয়ানে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। অতঃপর ১০ই রমজানুল মুবারক (হিঃ ৯৩) রাওর দুর্গ অধিকৃত হয় এবং যুদ্ধে দেবল রাজা পরাজিত ও নিহত হন। অল্প সময়ের মধ্যেই ব্রাহ্মণাবাদ (বর্তমান সংঘর) এবং আলওয়ার (বর্তমান রূহ্‌রীর পূর্বে অবস্থিত শহর) মুসলমানদের করতলগত হয় যার ফলে মুলতান আত্মসমর্পণ করে। ৯৬ হিজরীতে উত্তর ভারতও স্বেচ্ছায় মুহাম্মদ বিন কাসিমের বশ্যতা স্বীকার করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, এমন সময় খলিফা তাঁকে দামেশ্‌কে ডেকে পাঠান।

দক্ষ মুসলিম সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম তাঁর অধিকৃত ভূখন্ডে দৃষ্টান্তমূলক ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন যা হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রজাদের এতোটা মন জয় করতে সক্ষম হয় যে, বিরাট সংখ্যক অমুসলিম প্রজা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর ইসলামী শিক্ষার প্রভাব এতো বিরাট ছিল যে, তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁদের জীবন ঢেলে সাজান। সিন্ধু ভাষার জন্যে আরবী বর্ণমালাও গৃহীত হয়।

উপমহাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, তার উত্থান ও পতন

মুহাম্মদ বিন কাসিম এ উপমহাদেশে শুধু ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না, তিনি ইসলামী সভ্যতা–সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠারও অগ্রদূত ছিলেন। ইসলামী শাসন ও ইসলামী সভ্যতা–সংস্কৃতিই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্যে অপ্রতিহত প্রেরণা সৃষ্টি করে। যে সভ্যতা সংস্কৃতির বীজ বপন করা হয়, তা অংকুরিত হয়ে কালপ্রবাহে বিকশিত ও বর্ধিত হয় এবং পরবর্তীকালে বহু মুসলিম শাসকের বিজয়ীর বেশে এ উপমহাদেশে আগমনের ফলে উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী পতাকা উড্ডীন হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পর থেকে এগারো শতাধিক বছর এ উপমহাদেশে ইসলামী শাসন প্রচলিত থাকে। অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিজেদের মধ্যে চরম অন্তর্দ্বন্দ্বও নৈতিক অধঃপতন এবং বৈদেশিক শক্তির আক্রমণের ফলে উপমহাদেশের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে।

ইসলামের সহজাত ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য

ইসলামের অর্থ আল্লাহতায়ালার নিরংকুশ দাসত্ব আনুগত্যের জন্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মসমর্পণ করা এবং এর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এই যে, ইসলামের অনুসারীগণ কোন খোদাহীন ব্যবস্থা অথবা অমুসলিমদের প্রাধান্য মেনে নিতে পারেনা। ইসলাম মানব জাতির জন্যে একটা পূর্ণাংগ জীবন বিধান পেশ করে এবং এর মৌল নীতি জীবনের সকল আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক দিকের উপর সমভাবে প্রযোজ্য। ইসলামে রাষ্ট্র ও ধর্ম পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, বরঞ্চ জীবনের বৈষয়িক ও পার্থিব দিকগুলো জীবনের আধ্যাত্মিক দিকগুলোর সাথে একীভূত। একজন মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে অথবা সাধারণ নাগরিক হিসাবে তার সকল কাজকর্ম সম্পন্ন করে এ দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে যে, তার সকল ক্রিয়াকর্ম আল্লাহতায়ালা দেখছেন এবং তাঁর কাছে অবশেষে তার সমুদয় কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে। ইসলামের উপরোক্ত মৌল নীতি, আদর্শ ও নীতিনৈতিকতার ভিত্তিতে উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কয়েক শতাব্দী যাবত বলবৎ থাকে। দেশের আইন (Law of the land) ইসলামী হলেও ব্যক্তি ও পারিবারিক আইনের প্রশ্নে অন্য প্রত্যেক সম্প্রদায় তার নিজস্ব ধর্মীয় বিধান মেনে চলার অধিকারী ছিল।

উপমহাদেশের মুসলিম শাসকবৃন্দের মধ্যে আকবর ব্যতীত সকলেই ইসলামী সভ্যতা–সংস্কৃতির ধারকবাহক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি ব্যক্তিজীবনে

ইসলামী অনুশাসন পুরোপুরি মেনে চলতে ব্যর্থ হলেও সর্বত্র দেশের আইন ছিল ইসলামী। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ শাসকবৃন্দ প্রত্যক্ষভাবে করেননি। এ কাজ নিষ্ঠা সহকারে করেছেন বহিরাগত বহু আলেম–পীর–দরবেশ। তবে মুসলিম শাসকগণ ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের জন্যে অসংখ্য মসজিদ মাদ্রাসা ও খানকা স্থাপন করেছেন। এ সবের ব্যয়ভার বহনের জন্যে বহু লাখেরাজ জমি দান করেছেন। এসব প্রতিষ্ঠান নিঃসন্দেহে উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী দাওয়াত সম্প্রসারণে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। এরই ফলশ্রুতিতে উপমহাদেশের অমুসলিমগণ ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়। কালক্রমে উপমহাদেশের উত্তর–পশ্চিম ও দক্ষিণ–পূর্ব অঞ্চল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়ে—যা পরবর্তীকালে পাকিস্তান রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়।

উপমহাদেশে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ক্রমশঃ ইসলামী শাসন রহিত করে ইসলামের মৌল বিশ্বাস ও নীতির সাথে সাংঘর্ষিক ইন্ডিয়ান সিভিল এন্ড ক্রিমিনাল কোড্স অব প্রসিডিওর এবং ইন্ডিয়ান পেনাল কোড্ প্রবর্তন ও বলবৎ করা হয়। মুসলমানদের রাজ্য কেড়ে নেয়া হলো, ইসলাম ও ইসলামী আইন থেকে দূরে ঠেলে দেয়ার ব্যবস্থা হলো এবং এমন বহু বিধিব্যবস্থা গৃহীত হলো, যার দ্বারা মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বস্বহারা করে রাখা হলো।

বৃটিশ ও হিন্দুজাতির যোগসাজস ও ষড়যন্ত্রে মুসলমানদেরকে সর্বস্বহারা করা হয়, ক্ষুধা দারিদ্রের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত করা হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের মনমস্তিষ্ক থেকে ইসলামের মৌল বিশ্বাস ও ইসলামী চিন্তাচেতনা নির্মূল করা যায়নি। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বিগত শতাব্দীতে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে, বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়েছে। সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভীর তাহরিকে মুজাহেদীন ও সশস্ত্র জিহাদ, বাংলাদেশে ফারায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের ইসলামী আন্দোলন প্রভৃতির মাধ্যমে দুর্বার ইসলামী চেতনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। উপমহাদেশে ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ও কয়েক শতাব্দী যাবত তার লালন পালন এবং তা অক্ষুণ্ন রাখার সংগ্রামই পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করে।

মুসলমান একটি জাতি

উপরের আলোচনায় এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে মুসলমান একটি জাতির নাম। ঈমান–আকীদাহ (ধর্মীয় বিশ্বাস), ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, ধর্মের ভিত্তিতে ভালো–মন্দ, ন্যায়–অন্যায় ও হালাল–হারাম নির্ণয়, জীবনের প্রতিটি প্রকাশ্য ও গোপন কাজের জন্যে পরকালে আল্লাহতায়ালার নিকটে জবাবদিহির অনুভূতি, সভ্যতা–সংস্কৃতি, রুচি ও মননশীলতা, চিন্তাচেতনা—এ সকল দিক দিয়ে মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতি। এ স্বাতন্ত্রবোধ ধর্মবিশ্বাস থেকেই নিঃসৃত। যারা তৌহীদ, রেসালাত ও আখেরাতে সত্যিকার অর্থে বিশ্বাসী, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে খোদাকর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব যারা পুরোপুরি পালন করে, তারা গোটা মানবজাতির মধ্যে একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং এ জাতিকে আল্লাহতায়ালা 'উম্মতে মুসলেমা' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। উপরের গুণাবলীবিশিষ্ট মানবসমষ্টি মুসলিম জাতি এবং বিপরীত গুণাবলীবিশিষ্ট মানব সমষ্টি অমুসলিম জাতি—তাদের মধ্যে রয়েছে হিন্দু–খৃষ্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ প্রভৃতি। এর কোন একটির সাথে মিলেও মুসলমান এক জাতি হতে পারেনা। উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমান দু'টি পৃথক পৃথক জাতি—তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, ন্যায়–অন্যায় ও হালাল হারামের মাপকাঠি সম্পূর্ণ পৃথক ও বিপরীতমুখী হওয়ায় উভয়ে দু'টি পৃথক জাতি। এ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতেই পাকিস্তানের সৃষ্টি।

মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতি এ তত্ত্ব আধুনিক যুগের কোন আবিষ্কার নয়। দুনিয়ার প্রথম মানুষ একজন মুসলমান, আল্লাহর নবী ও খলিফা ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে অগাধ জ্ঞান ভান্ডার দান করেন। তাঁর থেকে ইসলাম ও ইসলামী জাতীয়তার সূচনা। উপমহাদেশে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে এ তত্ত্বের ভিত্তিতে পৃথক ও স্বাধীন আবাসভূমি দাবী করা হয়েছিল। এ জাতীয়তা ইসলামের শাশ্বত 'থিওরি' বা মতবাদ। হিন্দু কংগ্রেস উপমহাদেশের সংখ্যালঘু মুসলমানের উপর সংখ্যাগুরু হিন্দুর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে এক জাতীয়তার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। এ বিষয়ে বিরাট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন এক প্রখ্যাত আলেম, দেওবন্দের শায়খুল হাদীস মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী। তিনি কংগ্রেসের সুরে সুর মিলিয়ে ঘোষণা করেন একই ভৌগোলিক সীমারেখার ভিতরে বসবাসকারী মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে মিলে এক জাতি। উপমহাদেশে মুসলিম লীগ পরবর্তীকালে

দ্বিজাতিতত্ত্বের (Two Nation Theory) ভিত্তিতেই পাকিস্তানের দাবী করে। মাওলানা মাদানীর উপরোক্ত ঘোষণায় শুধু মুসলিম লীগ নয়, আলেম সমাজ ও সাধারণ মুসলমান বিস্মিত ও হতবাক হয়ে পড়ে। তখনো পাকিস্তান দাবী উত্থাপিত না হলেও মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতি এ সত্যটি সকলের জানা ছিল এবং বারবার এ কথা বিভিন্ন সময়ে ঘোষণা করা হয়।

মাওলানা মাদানীর উক্ত ঘোষণা পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবালকে অবহিত করা হয়। তিনি ছিলেন রোগশয্যায় শায়িত। তিনি ধীরে ধীরে কম্পিত কলেবরে শয্যার উপর উঠে বসেন এবং স্বভাব কবি রোগযন্ত্রণার মধ্যেও কয়েকছত্র কবিতার সুরে মাদানী সাহেবের উক্তির তীব্র সমালোচনা করেন—

আজম হনুয্ নাদানিস্ত রমূ যে দ্বীন ওয়ার না,
যে দেওবন্দ্ হুসাইন আহমদ ঈঁচেবুল্ আজবীস্ত্।
সরুদে বর সরে মেম্বর কে মিল্লাত আয্ ওতনস্ত্,
চে বেখবর আয্ মকামে মুহাম্মদে আরবীস্ত্।
বমুস্তাফা বরে সাঁ খেশ্‌রা কে দ্বীন হমাউস্ত,
আগার বাঊ নারসীদী তামামে বু লাহাবীস্ত্।
(আল্লামা ইকবাল ঃ আরমগানে হেজায্, পৃঃ ২৭৮)

অর্থ ঃ
আজমবাসী দ্বীনের মর্ম বুঝেনি মোটে,
তাই দেওবন্দের হুসাইন আহ্‌মদ কন আজব কথা।
মেম্বর থেকে ঘোষণা করেন, 'ওয়াতন থেকে মিল্লাত হয়'
মুহাম্মদ আল আরাবীর মর্যাদা থেকে বেখবর তিনি।
পৌঁছিয়ে দাও নিজেকে মুস্তাফার কাছে,
এসেছে গোটা দ্বীন তাঁর থেকে,
পৌঁছাতে না পার যদি, সবই হবে বুলাহাবী।

ডঃ ইকবালের কয়েক ছত্র কবিতা যদিও মাওলানা মাদানী সাহেবের মতবাদ খন্ডন করলো, তথাপি তা এক জাতীয়তা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে যথেষ্ট ছিলনা। এ সময়ে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী উপমহাদেশের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির চুলচেরা পর্যালোচনা করে তাঁর সম্পাদিত মাসিক তর্জুমানুল কুরআনে ধারাবাহিকভাবে 'মুসলমান আওর

মওজুদা সিয়াসী কাশ্‌মাকাশ্' শীর্ষক যে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন তার মধ্যে ইসলামী জাতীয়তার উপর তথ্যবহুল আলোকপাত করেন। এ বিষয়ের উপরে শতাধিক পৃষ্ঠার একটি পৃথক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিনি ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

"যেসব গন্ডীবদ্ধ, জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও কুসংস্কারপূর্ণ ভিত্তির উপর দুনিয়ার বিভিন্ন জাতীয়তার প্রাসাদ গড়ে উঠেছে আল্লাহ ও তাঁর রসূল তা চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেন। বর্ণ, গোত্র, জন্মভূমি, অর্থনীতি ও রাজনীতিক অবৈজ্ঞানিক বিরোধ ও বৈষম্যের ভিত্তিতে মানুষ নিজেদের মূর্খতা ও চরম অজ্ঞতার দরুন মানবতাকে বিভিন্ন ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র খন্ডে বিভক্ত করেছিল, ইসলাম তার সবগুলোকে আঘাতে চূর্ণ করে দেয় এবং মানবতার দৃষ্টিতে সমস্ত মানুষকে সমশ্রেণীর সমমর্যাদাসম্পন্ন ও সমানাধিকার প্রদান করেছে।

"ইসলামী জাতীয়তায় মানুষে মানুষে পার্থক্য করা হয় বটে, কিন্তু জড়, বৈষয়িক ও বাহ্যিক কোন কারণে নয়। করা হয় আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিকতার দিক দিয়ে। মানুষের সামনে এক স্বাভাবিক সত্য বিধান পেশ করা হয় যার নাম ইসলাম। আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য, হৃদয়মনের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা, কর্মের অনাবিলতা, সততা ও ধর্মানুসরণের দিকে গোটা মানব জাতিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে যে, যারা এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে, তারা এক জাতি হিসাবে গণ্য হবে আর যারা তা অগ্রাহ্য করবে, তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ মানুষের একটি হচ্ছে ঈমান ও ইসলামের জাতি এবং তার সমস্ত ব্যক্তিসমষ্টি মিলে একটি উম্মাহ। অন্যটি হচ্ছে কুফর ও ভ্রষ্টতার জাতি। তার অনুসারিগণ নিজেদের পারস্পরিক মতবিরোধ ও বৈষম্য সত্ত্বেও একই দল ও একই দলের মধ্যে গণ্য।

"এ দু'টি জাতির মধ্যে বংশ ও গোত্রের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য বিশ্বাস ও কর্মের। কাজেই একই পিতা-মাতার দু'টি সন্তানও ইসলাম ও কুফরের উল্লিখিত ব্যবধানের দরুন স্বতন্ত্র দুই জাতির মধ্যে গণ্য হতে পারে এবং দুই নিঃসম্পর্ক ও অপরিচিত ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কারণে এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

"জন্মভূমির পার্থক্যও এ উভয় জাতির মধ্যে ব্যবধানের কারণ হতে পারে না। এখানে পার্থক্য করা হয় হক ও বাতিলের ভিত্তিতে। আর হক ও বাতিলের

'স্বদেশ' বা জন্মভূমি বলতে কিছু নেই। একই শহর, একই মহল্লা ও একই ঘরের দুই ব্যক্তির জাতীয়তা ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন হতে পারে। একজন নিগ্রো ইসলামের সূত্রে একজন মরক্কোবাসীর ভাই হতে পারে।

"বর্ণের পার্থক্যও এখানে জাতীয় পার্থক্যের কারণ নয়। বাহ্যিক চেহারার রং ইসলামে নগণ্য। এখানে একমাত্র আল্লাহর রঙেরই গুরুত্ব রয়েছে। তা-ই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম রং।

"ভাষার বৈষম্যও ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণ নয়। ইসলামে মুখের ভাষার কোনই মূল্য নেই। মূল্য হচ্ছে মনের-হৃদয়ের-ভাষাহীন কথার।

"ইসলামী জাতীয়তার এ বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কালেমা—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। বন্ধুতা আর শত্রুতা এ কালেমার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। এর স্বীকৃতি মানুষকে একীভূত করে, অস্বীকৃতি মানুষের মধ্যে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটায়। এ কালেমা যাকে বিচ্ছিন্ন করে, তাকে রক্ত, মাটি, ভাষা, বর্ণ, অন্ন, শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি কোন সূত্র এবং কোন আত্মীয়তাই যুক্ত করতে পারে না। অনুরূপভাবে এ কালেমা যাদেরকে যুক্ত করে তাদেরকে কোন কিছুই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।"

মাওলানা আরও বলেন ঃ

"উল্লেখ্য যে অমুসলিম জাতি সমূহের সাথে মুসলিম জাতির সম্পর্কের দু'টি দিক রয়েছে। প্রথমটি এই যে, মানুষ হওয়ার দিক দিয়ে মুসলিম-অমুসলিম সকলেই সমান। আর দ্বিতীয়টি এই যে, ইসলাম ও কুফরের পার্থক্য হেতু আমাদেরকে তাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে দেয়া হয়েছে। প্রথম সম্পর্কের দিক দিয়ে মুসলমানরা তাদের সাথে সহানুভূতি, দয়া, ঔদার্য ও সৌজন্যের ব্যবহার করবে। কারণ মানবতার দিক দিয়ে এরূপ ব্যবহারই তারা পেতে পারে। এমনকি তারা যদি ইসলামের দুশমন না হয়, তাহলে তাদের সাথে বন্ধুত্ব, সন্ধি এবং মিলিত উদ্দেশ্যের (Common Cause) সহযোগিতাও করা যেতে পারে। কিন্তু কোন প্রকার বস্তুগত ও বৈষয়িক সম্পর্ক তাদেরকে ও আমাদেরকে মিলিত করে 'একজাতি' বানিয়ে দিতে পারেনা।"

মাওলানা মওদূদীর ইসলামী জাতীয়তা সম্পর্কিত উক্ত গ্রন্থখানি তৎকালীন চিন্তাশীল মুসলিম সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং মাওলানা মাদানীর বক্তৃতা ও

পুস্তিকা যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতা কর্মীগণ একে একটি শাণিত হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন। বস্তুতঃ এ গ্রন্থখানিই দ্বিজাতিতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রচনা করে এবং এটাই পাকিস্তান সৃষ্টির মূল কারণ হয়ে পড়ে। গ্রন্থখানি কংগ্রেসের মারাত্মক রামরাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা এবং মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর আঞ্চলিক জাতীয়তার যুক্তিতর্ক নস্যাৎ করে তাকে অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক, অনৈসলামী এবং অন্তঃসার শূন্য প্রমাণ করে।

উপরে বর্ণিত বুনিয়াদী কারণেই মানব সৃষ্টির সূচনা থেকেই মুসলমান ও অমুসলমান দু'টি স্বতন্ত্র জাতিসত্তার উদ্ভব হয়েছে—এযাবত তা বলবৎ আছে এবং চিরদিন থাকবে। ঐ একই কারণে উপমহাদেশে মুসলমান ও অন্যান্য জাতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানে শত শত বছর ধরে হিন্দু ও মুসলমান একত্রে বাস করে আসছে—একই শহরে, গ্রামে ও মহল্লায়—একই আঙিনার এপারে-ওপারে। একই ভাষায় উভয়ে কথা বলে, একই মাটিতে জন্ম, একই আলো-বাতাসে লালিত-পালিত ও বর্ধিত। কিন্তু উভয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়নি, একই জাতিতে পরিণত হয়নি। উপমহাদেশের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও এ সত্য স্বীকার করেন। স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথের কথাই ধরা যাক। তিনি বলেন ঃ

"আর মিথ্যা কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধও।

আমরা বহু শত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক ক্ষেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি। আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখ দুঃখের মানুষ। তবু প্রতিবেশীর সংগে যে সম্বন্ধ মনুষোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই।

আমরা জানি বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমানে বসেনা—ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেয়া হয়, হুকার জল ফেলিয়া দেয়া হয়।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২শ খন্ড, পৃঃ ৯০৯; আবদুল মওদুদ ঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর; পৃঃ ৪২০)

বাবু নীরদ চৌধুরী বলেন ঃ

"সত্য বলতে মিঃ জিন্নাহ বা মুসলিম লীগের বহু পূর্বেই দুই জাতিতত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছিল। আর এ শুধু তত্ত্বকথা না, এটা ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনা। সকলেই বর্তমান শতকের প্রথমে এটির অস্তিত্বের কথা জানতো। এমনকি আমরা ছেলেবেলায় স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব থেকেই জানতাম"। (Autobiography of an Unknown Indian, pp. 229-31)

এ সত্যটি ইউরোপীয়দেরও দৃষ্টি এড়ায়নি। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক এ কথাটি পরিষ্কারভাবে বলেন ঃ

"হিন্দু ও মুসলমান এক গ্রামে, এক শহরে, এক জেলায় বাস করলেও বরাবর দু'টি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। বিশেষ করে ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইউরোপের দু'টি জাতির চেয়ে আরও বিচ্ছিন্ন থেকেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, ফরাসী ও জার্মান জাতি ইউরোপবাসীদের চক্ষে দু'টি কট্টর দুশমনের জাতি। তবুও একজন ফরাসী যুবক জার্মানীতে ব্যবসায় বা শিক্ষাব্যপদেশে গিয়ে যে কোন জার্মান পরিবারে সহজে বাস করতে পারে, একসাথে খানা খেতে পারে, একই উপাসনা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু কোন মুসলিম কোন হিন্দু পরিবারে এমন প্রবেশাধিকার পায়না।" (S.T. MORISON : Political India p. 103)

স্বয়ং হিন্দুধর্মের অথবা ব্রাহ্মণদের স্বকপোলকল্পিত ধর্মীয় বিধি-বিধানের চরম সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি, কুসংস্কার, পরধর্মের প্রতি সহনশীলতার চরম অভাব মুসলমানদের প্রতি অমানবোচিত আচরণের জন্যে দায়ী। হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য তার বর্ণপ্রথা (CASTE SYSTEM)। এ প্রথা অনুযায়ী হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে বর্ণিত কিছুসংখ্যক মানুষকে নিম্নশ্রেণী বলে অভিহিত করা হয়। হিন্দুধর্ম তাদেরকে কোন মানবিক অধিকার দেয় না। তারা ঘৃণ্য, অপবিত্র, অস্পৃশ্য, তাদেরকে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করে তাদেরকে এ ধারণা দেয়া হয়েছে যে, উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের সেবা করার জন্যেই তাদের সৃষ্টি এবং এটাই তাদের ধর্ম, এটাই তাদের মহাপুণ্য কাজ। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর সাথে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু একই গৃহে বাস করতে পারেনা, একই সাথে পানাহার করতে পারেনা, একই বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করতে পারেনা। হিন্দু হয়েও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পড়তে পারেনা, মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে না। হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে

কথিত একটি হিন্দুশ্রেণীর সাথে হিন্দু সমাজের আচরণ এমন হলে মুসলমানদের সাথে অধিকতর বর্বরোচিত হওয়াই স্বাভাবিক। তাই মুসলমানের স্পর্শ করা সকল বস্তুই হিন্দুর কাছে অপবিত্র ও অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। তবে মুসলমানদের সাথে আচরণে অধিকতর কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে মুসলিম শাসনের অবসান ও বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর, উপমহাদেশে মুসলমানের অস্তিত্বই ছিল তাদের অসহনীয়।

মুসলমানদের প্রতি হিংসা বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে হিন্দুরা মুসলমানের সাথে বিরোধের ছলছুতো তালাশ করতো। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীনকালে হিন্দুদের গরুর গোশত ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিলনা। গরুর গোশত এক অতি উপাদেয় খাদ্য এবং মুসলমানসহ দুনিয়ার সকল মানুষ তা ভক্ষণ করে থাকে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে পশু কুরবানী মুসলমানদের প্রতি ইসলামের নির্দেশ। যেসব পশু কুরবানী করা জায়েয তাদের মধ্যে গরু অন্যতম। উপমহাদেশে মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষ বাধাবার ছুতো হিসাবে গরুকে হিন্দুর উপাস্য দেবতার আসনে স্থান দেয়া হয়। অতঃপর 'গোহত্যা-নিবারণ সমিতি' 'গোরক্ষিনী সমিতি' প্রভৃতি স্থাপন করে মুসলমানদের সাথে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সূত্রপাত করা হয়। একই বস্তু একজাতির আহার্য এবং অন্য জাতির উপাস্য দেবতা। গরুকে দেবতা বলে স্বীকার করার পর দুনিয়ার প্রতিটি গরু ভক্ষণকারীকে নির্মূল করা হবে হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মীয় কর্তব্য। অতএব গরু ভক্ষণকারী ও গরুর পূজারী দুই জাতি কোন দিন কি এক হতে পারে? এ দুই জাতিকে মিলিত করে এক জাতি গঠন গোপূজারী জাতিই বা কি করে মেনে নিতে পারে? অতএব এ একজাতি গঠনের প্রচেষ্টা শুধু হাস্যকরই নয়, দুরভিসন্ধিমূলক।

হিন্দু ও মুসলমান যে দুটি পৃথক জাতি—কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহও তা অকাট্য যুক্তিসহ প্রমাণ করেন। ১৯৪০ সালের ২২শে মার্চ লাহোরের মিন্টু পার্কে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের ২৭তম বার্ষিক অধিবেশনে তিনি তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেন ঃ

"এ কথা বুঝা বড়ো কঠিন যে আমাদের হিন্দু ভাইয়েরা ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ কেন বুঝতে পারেন না। আসলে এ দুটো কোন ধর্ম নয়, বরঞ্চ প্রকৃত পক্ষে দুটো পৃথক ও সুস্পষ্ট সামাজিক বিধিবিধান (social order) এবং হিন্দু ও মুসলমানকে মিলিত করে এক জাতীয়তা গঠন একটি কল্পনাবিলাস

মাত্র। এক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভুল ধারণাটি সীমালংঘন করে আমাদের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ হয়ে পড়েছে। যথাসময়ে আমাদের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হলে, ভারতকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হবে। হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক পৃথক ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক রীতিনীতি ও সাহিত্যাবলী আছে। তারা পরস্পর কোনদিন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না, একত্রে পানাহার করে না। তারা দুটি স্বতন্ত্র সভ্যতা সংস্কৃতিরও অধিকারী যা দুটি বিপরীত ধারণা বিশ্বাসের ভিত্তিতে গঠিত। তাদের জীবনের ও জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভংগীও আলাদা। একথাও সত্য যে হিন্দু ও মুসলমান ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে প্রেরণা লাভ করে। তাদের রয়েছে পৃথক মহাকাব্য, মহাগ্রন্থ, পৃথক জাতীয় বীর এবং পৃথক প্রাসংগিক উপাদান ও ঘটনাপঞ্জী।

অধিকাংশক্ষেত্রে একজনের জাতীয় বীর অন্য জনের শত্রু। এ ধরনের বিপরীতমুখী দুটি জাতিকে যাদের একটি সংখ্যাগুরু এবং অপরটি সংখ্যালঘু—একই রাষ্ট্রে যুক্ত করে দিলে অশান্তি বাড়তে থাকবে এবং এমন রাষ্ট্রে সরকার পরিচালনার জন্যে যে কাঠামোই তৈরী হবে তা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাবে।

জাতির যে কোন সংজ্ঞা অনুযায়ী মুসলমান একটি জাতি এবং অবশ্যই তাদের থাকতে হবে একটি আবাসভূমি, একটি ভূখন্ড বা অঞ্চল এবং একটি রাষ্ট্র। ··· আমাদের জাতি প্রতিভা অনুযায়ী নিজস্ব আদর্শের ভিত্তিতে আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে উন্নতি সাধন করুক—এটাই আমাদের কামনা।"

সর্বশেষে কায়েদে আজম বলেন ঃ

"ইসলামের অনুগত বান্দাহ হিসাবে এগিয়ে আসুন। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে জনগণকে সংগঠিত করুন। আমি নিশ্চিত আপনারা এমন এক শক্তিতে পরিণত হবেন যাকে দুনিয়ার কোন শক্তি পরাভূত করতে পারবেনা।"

পরদিন অর্থাৎ ২৩শে মার্চ উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্বাঞ্চলকে নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এ প্রস্তাব পেশ করেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা মৌলভী এ, কে, ফজলুল হক। মূল প্রস্তাবের ভাষা নিম্নরূপ ঃ

Resolved that it is the considered view of this Session of the All India Muslim League that no Constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles, viz, that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial re-adjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the North-Western and Eastern zones of India should be grouped to constitute 'Independent States' in which the Constituent units shall be autonomous and sovereign.

That adequate, effective and mandatory safeguards should be specially provided in the Constitution for minorities in these units and in the regions for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them, and in other parts of India where the Mussalmans are in a minority, adequate, effective and mandatory safeguards shall be specially provided in the Constitution for them and other minorities for the protection of their religious, cultural, economic, political, administrative and other rights and interests in consultation with them.

—Justice Syed Shameem Husain Kadir : Creation of Pakistan, p. 192.

লাহোর প্রস্তাবের সাথে এ ঘোষণাও সুস্পষ্টরূপে করা হয় যে, এখানে বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে পরামর্শক্রমে তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষিত করা হবে। অনুরূপভাবে ভারতের যেসব অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যালঘু, সেসব অঞ্চলে তাদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষিত করতে হবে।

হিন্দুদের বিরোধিতা

লাহোর প্রস্তাবের ভালো দিকটার কোন প্রকার বিচার বিবেচনা না করেই হিন্দুদের পক্ষ থেকে তার চরম বিরোধিতা শুরু হয়। হিন্দু নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে উক্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করে অশালীন বক্তব্য বিবৃতি প্রকাশিত হতে থাকে। মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার এবং তাদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টির সকল তৎপরতা শুরু হয়। ওয়ার্ধাও একই সুরে কথা বলতে থাকে। মিঃ গান্ধী আশা করেন যে, বৃটেন প্রস্তাবটি কার্যকর করতে দেবেনা।

হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন হিন্দু প্রভাবিত পত্র পত্রিকার পক্ষ থেকে লাহোর প্রস্তাবের বিরোধিতা ও অপপ্রচার সত্ত্বেও কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ লাহোর প্রস্তাবের উপর অবিচল থাকেন। তিনি বলেন, আমি এখনো আশা করি, বিবেকবান হিন্দুগণ আমাদের প্রস্তাব গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখবেন। কারণ এর মধ্যেই স্বল্প সময়ে স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা নিহিত আছে। এ স্বাধীনতা আমরা শান্তিপূর্ণভাবে দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে ধরে রাখতে পারবো।

ছাব্বিশে মে, ১৯৪০ বোম্বে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কায়েদে আজম কংগ্রেসের মিথ্যা প্রচারণার উল্লেখ করে বলেন ঃ

এ অত্যন্ত বিস্ময়কর যে মিঃ গান্ধী ও মিঃ রাজা গোপালাচারিয়ার মতো লোক লাহোর প্রস্তাবকে 'ভারতের অংগচ্ছেদ' (Vivisection of India) এবং 'শিশুকে দুখন্ডে কর্তিত করার' নামে আখ্যায়িত করছেন। ভারত অবশ্য প্রকৃতি কর্তৃকই বিভক্ত। ভারতের ভৌগোলিক মানচিত্রে মুসলিম ভারত এবং হিন্দুভারত স্থান লাভ করে আছে। তাহলে এ হৈ চৈ কেন তা আমি বুঝতে পারিনা। সে দেশ কোথায়, যা বিভক্ত করা হচ্ছে? কোথায় সে জাতি যা দ্বিধাবিভক্ত ও দ্বিখন্ডিত করা হচ্ছে? কোথায় সে কেন্দ্রীয় সরকার যার হুকুম শাসন লংঘন করা হচ্ছে? ভারত বৃটিশের শাসনাধীন থাকার ফলে অখন্ড ভারত ও একটি একক কেন্দ্রীয় সরকারের ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে। ভারতীয় জাতি এবং কেন্দ্রীয় সরকার বলে কিছু ছিলনা। এ কংগ্রেস হাই কমান্ডের খোশখেয়াল মাত্র। ··· আমাদের আদর্শ ও সংগ্রাম কারো স্বার্থে আঘাত দেয়ার জন্যে নয়, বরঞ্চ নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যে।

—(Justice Syed Shameem Husain Kadir : Creation of Pakistan, pp. 193-94)

উল্লেখ্য লাহোর প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দের উল্লেখ না থাকলেও হিন্দু ভারতই একে পাকিস্তান প্রস্তাব নামে অভিহিত করে। আর এটাই ছিল যথার্থ। বহু দিন পূর্বে চৌধুরী রহমত আলীর দেয়া নামটাই সার্থক হলো।

পাকিস্তানের চিন্তাভাবনা

পাকিস্তানের চিন্তাভাবনা অথবা পরিকল্পনা কোন অভিনব রাজনৈতিক দর্শন নয়। এ শব্দটির প্রকৃত মর্ম হলো ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা। তাই কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন, পাকিস্তানের সূচনা তখন থেকে হয় যখন মুহাম্মদ বিন কাসিম বিজয়ীর বেশে সিন্ধুতে পদার্পণ করেন। অতঃপর এ উপমহাদেশে কয়েকশ' বছর ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা বলবৎ থাকে। বৃটিশ শাসনের শেষের দিকে পুনরায় বৃটিশ ভারতে মুসলিম জাতির স্বাতন্ত্র ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চিন্তাভাবনা ও প্রচেষ্টা শুরু হয়। উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলগুলোতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাজনৈতিক চিন্তাশীলদের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই বিশ্ব ইসলামী ঐক্যের অগ্রদূত সাইয়েদ জামালুদ্দীন আফগানী মধ্য এশিয়ার সোসালিস্ট রিপাবলিকসমূহ, আফগানিস্তান এবং উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে একটি মুসলিম রিপাবলিক গঠনের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রথম চিন্তাভাবনা করেন, এটাকে অনেকে প্যানইসলামিজম নামে অভিহিত করেন।

চৌধুরী রহমত আলী ১৯১৫ সালে 'বজ্‌মে শিবলী' অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে দাবী করেন যে, উত্তর ভারত মুসলিম অধ্যুষিত বলে তাকে মুসলিম দেশ হিসাবেই গণ্য করা হবে। শুধু তাই নয়, তিনি বলেন, "এটাকে আমরা মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করব। এটা তখনই সম্ভব যখন আমরা এবং আমাদের উত্তরাঞ্চল ভারতীয় হওয়া পরিহার করব। এটা পূর্বশর্ত। অতএব যতো শীঘ্র আমরা ভারতীয়তা (Indianism) পরিহার করব, ততোই আমাদের ও ইসলামের জন্য মংগলকর হবে। (I. H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, pp. 115-116)।

অতঃপর ১৯১৭ সালে ডাঃ আবদুল জাব্বার খাইরী এবং অধ্যাপক আবদুস সাত্তার খাইরী (তাঁরা খাইরী ভ্রাতৃদ্বয় নামে পরিচিত) স্টকহলমে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ভারত বিভাগের পরিকল্পনার প্রস্তাব উথাপন করেন। (Syed Sharifuddin Pirzada : Evolution of Pakistan, (Lahore, 1963 pp. 68-90)

বাদাউনের 'যুলকারনাইন' পত্রিকায় ১৯২০ সালের মার্চ-এপ্রিলে জনৈক আবদুল কাদির বিলগ্রামীর পক্ষ থেকে মিঃ গান্ধীর নামে খোলা চিঠি প্রকাশিত হয়। এ চিঠিগুলোতে তিনি উপমহাদেশ বিভাগের যুক্তি পেশ করেন। এ বিভাগের জন্যে তিনি মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলোর একটি তালিকাও পেশ করেন—যা প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের উভয় অংশের ভৌগোলিক সীমার সাথে প্রায় সামঞ্জস্যশীল। যেহেতু এ চিঠিগুলোতে উল্লেখ্য বিষয় অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে জন্যে তা দু'বার পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে। (Muhammad Abdul Qadir Bilgrami : Hindu Muslim Ittehad par Khula Khat Mahatma Gandhi ke nam Aligarh, 1925)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে টাইমস অব ইন্ডিয়ার সম্পাদক লোভাট ফ্রেজার ডেইলী এক্সপ্রেস অব লন্ডনে একটি মানচিত্র প্রকাশ করেন যাতে কনটান্টিনোপল থেকে ভারতের সাহরানপুর-এর দিকে একটি তীর অংকিত করা হয়। এতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোর দিকে এক মুসলিম করিডোর দেখানো হয়েছে। (I. H. Qureshi : The Muslim Community of the Indo-Pakistan Subcontinent, pp. 295-96)

হিন্দু মহাসভার সভাপতি সাভারকার প্রায় উল্লেখ করতেন যে, হিন্দু ও মুসলমান দু'টি পৃথক জাতি। কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার অন্য এক নেতা লালা লাজপাত রায় ১৯২৪ সালে ভারত বিভাগের প্রস্তাব দেন। (I.H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, p. 116; Richard Symonds : The Making of Pakistan, 1950, p. 59)

ডেরা ইসমাইল খান জেলার সরদার মুহাম্মদ গুল খান ১৯২৩ সালে ফ্রন্টিয়ার ইন্‌কোয়ারী কমিটির কাছে হিন্দু ও মুসলমানদের স্বার্থে ভারত বিভাগের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। পেশাওর থেকে আগ্রা পর্যন্ত অঞ্চল মুসলমানদের জন্যে নির্ধারণ করার দাবী জানান। (I. H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, p. 116-17)

আগা খান ১৯২৮ সালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত সকল দলীয় কনভেনশনে প্রত্যেক প্রদেশের স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করেন। (উক্ত গ্রন্থ)

ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ বার্ষিক সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন সমস্যা আলোচনার পর বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই অথবা বাইরে মুসলমানদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

ডঃ ইকবাল তাঁর প্রস্তাবিত মুসলিম রাষ্ট্রের কোন নাম দেননি। এ কাজটি করেছেন চৌধুরী রহমত আলী। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে, চৌধুরী রহমত আলী এবং তাঁর ক্যাম্ব্রিজের তিনজন সহকর্মী নাউ অর নেভার (Now or Never) শীর্ষক একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করেন।

চৌধুরী রহমত আলী তাঁর প্রচারপত্র ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দের কাছে, লন্ডনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানকারী মুসলিম ডেলিগেটদের কাছে এবং ইংলন্ডের প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকটে প্রেরণ করেন। একখানি পত্রসহ প্রচারপত্র পাঠানো হয়। তাতে বলা হয় আমি এতদ্‌সহ পাকিস্তানের তিন কোটি মুসলমানের পক্ষ থেকে একটি আবেদন আপনাদের সামনে পেশ করছি, যাঁরা ভারতের উত্তরাঞ্চলে পাঁচটি প্রদেশে বাস করে, যথা পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান।*

মুসলমানদের এক জীবন মরণ সন্ধিক্ষণে এ আবেদন করা হয়। বলা হয়, ভারত একটি জাতির দেশ নয়, বরঞ্চ বহু জাতির দেশ। ··· আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, আমাদের সামাজিক রীতি-নীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আমাদের উত্তরাধিকার ও বিবাহ সম্পর্কিত আইন ভারতে বসবাসকারী অন্যান্য জাতির থেকে মূলতঃ পৃথক। আমরা একত্রে আহার করিনা, পরস্পর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিনা। আমাদের জাতীয় রীতি-নীতি ও প্রথাপদ্ধতি এবং বর্ষ, মাস ও দিন পঞ্জিকা পৃথক। এমনকি আমাদের আহারাদি ও পোশাক পরিচ্ছদও সম্পূর্ণ আলাদা। ··· যদি আমরা, পাকিস্তানের মুসলমানকে আমাদের জাতীয়তার সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যসহ প্রতারিত করে প্রস্তাবিত ভারতীয়

* উল্লেখ্য চৌধুরী রহমত আলী উপরোক্ত পাঁচটি প্রদেশ নিয়ে একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবী করেন যার নাম তিনি 'পাকিস্তান' দেন।

ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে আমাদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হবে। এ প্রস্তাব আমাদের জাতির মৃত্যুঘন্টারই অনুরূপ। —(G. Allana : Muslim Political Thought Through the Ages : 1562-1947, pp. 295-300)

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 'পাকিস্তান' নামটি চৌধুরী রহমত আলীরই উদ্ভাবন—যা লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে ভারতের রাজনৈতিক অংগনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং প্রায় সাত বছর পর তা বাস্তব সত্যে পরিণত হয়।

সাইয়েদ শরীফুদ্দীন পীরজাদা তার Evolution of Pakistan গ্রন্থে বলেন ঃ

এসব প্রস্তাব ও পরামর্শ যা স্যার আবদুল্লাহ হারুন, ডঃ লতিফ, স্যার সেকেন্দার হায়াত খান, জনৈক পাঞ্জাবী, ডঃ কাদেরী, মাওলানা মওদূদী, চৌধুরী খালিকুজ্জামান প্রমুখ ব্যক্তিগণ উপস্থাপন করেন তা সবই এক অর্থে পাকিস্তান সৃষ্টিরই পথ নির্দেশক ছিল।

সর্বশেষে ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ কর্তৃক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লাহোর প্রস্তাব তথা পাকিস্তান প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা

পাকিস্তান তথা ভারত বিভাগের প্রস্তাব হিন্দুরা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করে মেনে নিতে পারেনা এবং তাই তারা তীব্র বিরোধিতা শুরু করে। পন্ডিত জওহরলাল নেহরু ৬ই মে পুনাতে বলেন, হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগের কোন ইতিবাচক কর্মসূচী নেই। তিনি পাকিস্তান প্রস্তাবকে নির্বুদ্ধিতা বলে আখ্যায়িত করে বলেন, এ চব্বিশ ঘন্টার অধিককাল টিকে থাকবেনা। হিন্দু মহাসভা ১৯শে মে পাকিস্তান প্রস্তাবকে হিন্দু বিরোধী এবং জাতীয়তা বিরোধী বলে উল্লেখ করে।

কংগ্রেস ও হিন্দুজাতির চরম বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পাকিস্তান আন্দোলন চলতে থাকে এবং হিন্দুদের বিরোধিতা ও অপপ্রচার মুসলমানদের ঐক্য সুদৃঢ় করতে থাকে।

পাকিস্তান আন্দোলনকে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণার জন্যে মুসলিম ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়, তা এই যে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের জামিলুদ্দীন আহমদকে আহবায়ক করে একটি লেখক কমিটি গঠন করা হয়। প্রখ্যাত প্রবন্ধকারগণ বিভিন্ন প্রচারপত্র রচনা করেন এবং সেগুলো পাকিস্তান সাহিত্য অনুক্রম (Pakistan Literature Series) নামে লাহোরের শেখ মুহাম্মদ আশরাফ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। জামিলুদ্দীন আহমদ বলেন, স্বাধীন পাকিস্তান এবং স্বাধীন হিন্দুস্তান বন্ধুত্বপূর্ণ ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশে অবস্থান করতে থাকবে। ভারতীয় ঐক্য এক অলীক কল্পনা বিলাস এবং ঐতিহাসিক সত্যের পরিপন্থী। (I. H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, p. 136)

পয়লা জুলাই, ১৯৪০, কায়েদে আযম শিমলা অবস্থানকালে ভাইস্‌রয়ের নিকটে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করেন এবং প্রস্তাবগুলোকে "পরীক্ষামূলক" বলে চিহ্নিত করেন। প্রস্তাবগুলো নিম্নরূপ ঃ

ভারত বিভাগ এবং উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের যে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়, তার মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক কোন বিবৃতি সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা যাবে না।

ভারতের মুসলমানদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা দান করতে হবে যে, মুসলিম ভারতের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন অন্তর্বর্তীকালীন অথবা চূড়ান্ত সাংবিধানিক স্কীম গঠন করা হবে না। ইউরোপে যেভাবে পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে এবং ভারত বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে তাতে আমরা পুরোপুরি উপলব্ধি করছি যে, যুদ্ধ প্রচেষ্টা তীব্রতর করা উচিত। ভারতের সকল উপায় উপকরণ তার প্রতিরক্ষার জন্যে নিয়োজিত করা উচিত যাতে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও শান্তি শৃংখলা নিশ্চিত করা যায় এবং বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। কিন্তু এসব কিছু লাভ করা সম্ভব যদি বৃটিশ সরকার কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহে দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলিম নেতৃত্বকে সমান অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হন।

সাময়িকভাবে এবং যুদ্ধকালীন অবস্থায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে সরকারের অধিকার এখতিয়ারে সমান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সরকারের সাথে সহযোগিতার ফরমুলা মেনে চলা যায় ঃ

ক. বর্তমান সাংবিধানিক আইনের আওতায় ভাইস্‌রয়ের এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিল সম্প্রসারিত করতে হবে। আলোচনার পরই অতিরিক্ত সংখ্যা নির্ধারিত হবে। কিন্তু মুসলিম প্রতিনিধিত্ব অবশ্যই হিন্দুর সমসংখ্যক হতে হবে যদি কংগ্রেস যোগদান করেন। অন্যথায়, অতিরিক্ত সদস্যদের অধিকাংশ মুসলমান হতে হবে। কারণ প্রধান গুরুদায়িত্ব মুসলমানদেরকেই বহন করতে হবে।

খ. যে সকল প্রদেশে আইনের ৯৩ ধারা বলবৎ, সেখানে নন-অফিসিয়াল উপদেষ্টা নিয়োগ করতে হবে। আলোচনার পর সংখ্যা নির্ধারিত হবে। তবে উপদেষ্টাগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা মুসলিম প্রতিনিধিগণের হবে। কিন্তু যেসব প্রদেশে কোয়ালিশন সরকার আছে, সেখানে সংশ্লিষ্ট দলগুলোর দায়িত্ব হবে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

গ. প্রেসিডেন্টসহ পনেরো জনের একটি সমর কাউন্সিল (War Council) হবে। ভাইস্‌রয় সভাপতিত্ব করবেন। ··· এখানেও মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর সমান হবে যদি কংগ্রেস যোগদান করে।

সর্বশেষ কথা এই যে, সমর কাউন্সিলে, ভাইসরয়ের কার্যকরী কাউন্সিলে (Executive Council) এবং গভর্ণরের নন-অফিসিয়াল উপদেষ্টাদের মধ্যে যাঁরা মুসলিম প্রতিনিধি হবেন, তাঁদেরকে বেছে নেবে মুসলিম লীগ।

পয়লা জুলাই সুভাসচন্দ্র বোস গ্রেফতার হন এবং তেসরা জুলাই মিঃ গান্ধী বৃটেনের প্রতিটি নাগরিকের কাছে অহিংস নীতি অবলম্বন করে অস্ত্র পরিহারের আবেদন জানান। সাথে সাথেই দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার পুনর্দাবী করা হয়। সেইসাথে কেন্দ্রে একটি জাতীয় সরকার গঠনের দাবীও জানানো হয়।

মিঃ জিন্নাহ ভাইসরয়ের নিকটে তাঁর যে পরীক্ষামূলক (Tentative) প্রস্তাব পেশ করেন, সে সম্পর্কে ভাইসরয় ৬ই জুলাই তারিখে লিখিত তাঁর পত্রে তাঁর দৃষ্টিভংগী মিঃ জিন্নাহকে জানিয়ে দেন। তিনি তাঁর কাউন্সিল সম্প্রসারণে সম্মত হন কিন্তু তার মধ্যে মুসলিম অংশীদারিত্বে অসম্মতি জানান। কাউন্সিলের মুসলিম সদস্যগণকে মুসলিম লীগ নমিনেশন দেবে এ দাবী মানতেও তিনি রাজী নন। কারণ, তিনি বলেন, এটা ভারত সচিবের অধিকার এবং কাউন্সিল সদস্যগণ রাজনৈতিক দলের মনোনীত হবেন না। প্রাদেশিক গভর্ণরদের নন-অফিসিয়াল উপদেষ্টা নিয়োগও তিনি মেনে নিতে পারেন না। ওয়ার কাউন্সিল (War Council) গঠনের বিষয়টি গুরত্বপূর্ণ। এর বিস্তারিত খুটিনাটি বিষয়গুলো নির্ধারিত করা হবে।

মিঃ জিন্নাহর পরীক্ষামূলক প্রস্তাবের শর্তাবলী প্রত্যাখ্যান করা হলো। কিন্তু অভিজ্ঞ রাজনীতিক মিঃ জিন্নাহ দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। তিনি তাঁর আলাপ আলোচনা অব্যাহত রাখেন।

সপ্তম অধ্যায়

ব্রিটিশ সরকারের আগস্ট প্রস্তাব

ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মতানৈক্য এবং কংগ্রেস-লীগ ও বড়োলাটের মধ্যে মতবিরোধের কারণে হতাশ হয়ে পড়েননি। ১৯৪০ সালের ৮ই আগস্ট ব্রিটিশ সরকার যে ঘোষণা দেন তা আগস্ট প্রস্তাব নামে অভিহিত করা হয়। এ ঘোষণায় কিছু নতুন ধারণা দেয়া হয়। প্রথমতঃ ইন্দোব্রিটিশ ইতিহাসে এই প্রথমবার ভারতীয়দের নিয়ে একটি গণপরিষদ গঠনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এ যাবত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ইচ্ছাই ছিল চূড়ান্ত এবং ভারত সরকার আইন ১৯৩৫ এ প্রাধান্য অনুমোদন করতো। এখন ভারতীয় গণপরিষদের ধারণা শুধু সমর্থনই করা হলোনা, বরঞ্চ তা গঠনের প্রতিশ্রুতিও দেয়া হলো। দ্বিতীয়তঃ গণপরিষদ সম্পর্কে কংগ্রেসের ধারণা প্রত্যাখ্যান করা হয়। একথাও সুস্পষ্ট করে বলা হয় যে, গণপরিষদ এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করবেনা যার দ্বারা সংখ্যালঘুদের অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়। তৃতীয়তঃ ডমিনিয়ন ষ্টেটাসকেই ভারতের লক্ষ্য মনে করা হয়। এসব ব্যবস্থা গৃহীত হবে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর। আগষ্ট প্রস্তাবের কিছু মন্দ দিকও ছিল যা লীগ ও কংগ্রেসের প্রস্তাবে তুলে ধরা হয়।

মিঃ জিন্নাহ ১২ই ও ১৪ই আগস্ট উপরোক্ত প্রস্তাব নিয়ে মতবিনিময় করেন। তবে পয়লা ও দুসরা সেপ্টেম্বরে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র মুসলিম লীগের অনুমোদন ব্যতীত প্রণীত হবে না এ দাবী মেনে নেয়ায় মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। সেইসাথে ওয়ার্কিং কমিটি এ কথা ঘোষণা করা যথার্থ মনে করে যে, কমিটি লাহোর প্রস্তাব ও তার শর্তাবলীর মূলনীতির উপর অবিচল আছে এবং তা এই যে, ভারতের মুসলমান একটি জাতি এবং তাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ধারণের অধিকারী তারাই। মধ্যবর্তী ব্যবস্থার জন্যে সরকারের প্রস্তাব অসন্তোষজনক। মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির ১৬ই জুনের দাবীগুলি মেনে নেয়া হয়নি। নিম্নলিখিত কারণে সরকারের আগস্ট প্রস্তাব মেনে নেয়া যায় না বলে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় ঃ

১. বড়োলাটের এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যার যে প্রস্তাব করা হয়, সে সম্পর্কে লীগ সভাপতি অথবা ওয়ার্কিং কমিটির সাথে কোন আলাপ আলোচনা করা হয়নি।

২. কাউন্সিল কিভাবে গঠিত হবে তার ধরন সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটিকে অবহিত করা হয়নি।

৩. অন্য কোন্ দলের সাথে কাজ করতে লীগকে ডাকা হবে এ সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি অবহিত নয়।

৪. কাউন্সিলের নতুন সদস্যদের কোন্ কোন্ পদ (Portfolio) দেয়া হবে, সে সম্পর্কে লীগের কোন ধারণা নেই।

৫. যুদ্ধ উপদেষ্টা পরিষদ (War Advisory Council) সম্পর্কে যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তা অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য।

মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি তার সভাপতিকে এ ক্ষমতা দান করে যে, তিনি প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র, যুদ্ধ উপদেষ্টা পরিষদের গঠন পদ্ধতি ও দায়িত্ব কর্তব্য এবং বড়োলাটের এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিলের কলেবর বৃদ্ধি সম্পর্কে বড়োলাটের কাছে ব্যাখ্যা দাবী করবেন।

মিঃ জিন্নাহ ২০শে সেপ্টেম্বর বড়োলাটের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং পরদিন বড়োলাট লীগের উত্থাপিত প্রশ্নগুলির জবাব দেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে বড়োলাটের জবাব সম্পর্কে আলোচনা হয়। বড়োলাটের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক নয় বলে কমিটি অভিমত ব্যক্ত করে।

সরকারের আগষ্ট প্রস্তাব সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত তীব্র। কংগ্রেস সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ১০ই আগষ্ট বড়োলাটের সাথে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃতি জানান। কংগ্রেস প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে। বলা হয়, সরকার ক্ষমতা ছাড়তে রাজী নন এবং প্রস্তাবটি সরাসরি দ্বন্দ্ব সংগ্রামে ইন্ধন যোগাচ্ছে। সংখ্যালঘুদের বিষয়টি ভারতের উন্নতির পথে এক অলংঘ্য প্রতিবন্ধক। কংগ্রেসকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করতে হবে বলে ভীতি প্রদর্শন করা হয়।

সরকারের আগষ্ট প্রস্তাব রাজনৈতিক দল কর্তৃক গৃহীত হয়নি। কিন্তু এতে মুসলমানদের কিছু লাভ হয়েছে। ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, তা মধ্যবর্তী হোক অথবা চূড়ান্ত, মুসলমানদের সন্তোষজনক অনুমোদন লাভ করা হবে বলে সরকার প্রতিশ্রুতি দান করেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার এক বছরের মধ্যে এবং লাহোর

প্রস্তাবের পর পাঁচ মাসের মধ্যে সরকারের এ ধরনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা মুসলিম লীগের কম কৃতিত্ব নয়। মুসলমানদের প্রতি কংগ্রেসের আচরণের ফলেই এ কৃতিত্ব লাভ হয়। কংগ্রেসের হাতে মুসলমানদের ভাগ্য ছেড়ে দেয়া সরকার সমীচীন মনে করেননি।

কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন ও মুসলমান

মিঃ গান্ধী বড়োলাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোর সাথে ২৭শে ও ৩০শে সেপ্টেম্বর সাক্ষাৎ করেন ও তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে বড়োলাটকে অবহিত করেন। কংগ্রেস নেতা মনে করেন যে, সকল ভারতীয়দের এ অধিকার আছে যে তারা দেশবাসীকে এ আহবান জানাবে যে তারা যুদ্ধ প্রচেষ্টা থেকে দূরে থাকবে। বড়োলাট তাঁর এ দৃষ্টিভংগী মেনে নিতে পারেননি। তিনি বলেন, একজন বিবেকবান বিরুদ্ধবাদী যুদ্ধ করতে না পারেন, তিনি জনগণের কাছে তাঁর দৃষ্টিভংগী পেশ করতে পারেন। কিন্তু তাঁকে এ অনুমতি দেয়া যেতে পারেনা যে, তিনি অন্যকে যুদ্ধে বাধা দান করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করবেন। ১১ই অক্টোবর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে সত্যাগ্রহ শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

গান্ধীজির নির্দেশে সর্বপ্রথম বিনোবা ভবে গ্রেফতারীর জন্যে নিজেকে পেশ করেন। রাজা গোপালাচারিয়া এবং আবুল কালাম আজাদও কারাবরণ করেন। কংগ্রেসপন্থীদের ব্যাপক কারাবরণ সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে পারেনি। বিশেষ করে মুসলিম প্রদেশগুলিতে এ সত্যাগ্রহ মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। সারা ভারতের মধ্যে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সবচেয়ে ক্ষীণ সাড়া পাওয়া যায়। প্রথম দিকে ডাঃ খান এ আন্দোলনে যোগদান করতে অনীহা প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৪ই ডিসেম্বর তাঁর গ্রেফতারী জনমতের শান্ত পরিবেশের উপর সামান্য তরংগ সৃষ্টি করে মাত্র।

একচল্লিশের এপ্রিলে মিঃ গান্ধী সকল কংগ্রেসীর জন্যে সত্যাগ্রহ উন্মুক্ত করে দেন। তার ফলে প্রায় ২০,০০০ লোক স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেন। কংগ্রেসের জন্যে এ সংখ্যা খুবই নগণ্য। আন্দোলন ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসে।

কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলন মুসলমানগণ মেনে নিতে পারেননি। কারণ কংগ্রেসের দুরভিসন্ধি তাঁরা বুঝতে পারেন। ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে মিঃ জিন্নাহ দিল্লীতে প্রদত্ত তাঁর এক ভাষণে কংগ্রেসের দাবীর প্রতি উপহাস করে

বলেন যে, কংগ্রেস আন্দোলন করছে স্বাধীনতার জন্যে। তাঁর কাছে এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে এ কথা পরিষ্কার যে, কংগ্রেস সরকারকে ভীতি প্রদর্শন করে এ স্বীকৃতি আদায় করতে চায় যে কংগ্রেস ভারতবাসীর একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন। কংগ্রেসের মনোভাব হলো ঃ 'মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের দাবী প্রত্যাখ্যান করে আমাদের দাবী মেনে নাও।' কংগ্রেস ক্ষমতা লাভ করতে চায় এবং চায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি বলপ্রয়োগের ক্ষমতা। ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বল প্রয়োগ করতে চায়।

একচল্লিশের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে এবং এপ্রিলে অনুষ্ঠিত মাদ্রাজ মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে মিঃ জিন্নাহর ভাষণের সমর্থনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, সরকার যদি তাঁদের বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভংগ করে কংগ্রেসের দাবী মেনে নেয় তাহলে উদ্ভূত পরিস্থিতি মুকাবিলা করার জন্যে মুসলিম লীগ যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে প্রস্তুত থাকবে। (The Struggle for Pakistan, Ishtiaq Hussain Qureshi, pp. 163-64)

লিবারাল পার্টি প্রস্তাব—১৯৪১

দুটি প্রধান দল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নীতি পলিসি আলোচনার পর দেখা যাক ন্যাশনাল লিবারাল ফেডারেশন কি মনোভাব পোষণ করছে। আইন সভায় তাঁদের একটি ক্ষুদ্র দল আছে। তবে তাঁদের মধ্যে স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু, স্যার চিমনলাল শিতলবন্দ এবং স্যার শ্রী নিবাস শাস্ত্রীর মতো অভিজ্ঞ ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোকও আছেন। তাঁদের দৃষ্টিভংগী ও মনোভাব জানারও প্রয়োজন আছে। চল্লিশের ডিসেম্বরে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত তাঁদের বার্ষিক অধিবেশনে লিবারালগণ তাঁদের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতির মূলনীতি ঘোষণা করেন এবং তা সমাধানের ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হবে বলে তাঁরা মনে করেন। এ বিষয়ে তাঁরা যে প্রস্তাব করেন তা নিম্নরূপ ঃ

১. যুদ্ধপ্রচেষ্টার প্রতি পূর্ণ সহায়তা দান।
২. যুদ্ধ শেষ হওয়ার দু'বছরের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণা করা উচিত যে ভারত একটি ডমিনিয়ন হবে।

৩. কেন্দ্রীয় সরকারকে পুনর্গঠিত করতে হবে যাতে ভাইসরয় একটি পরিপূর্ণ জাতীয় সরকারের শাসনতান্ত্রিক প্রধান হতে পারেন।
৪. ভারত বিভাগ প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা ক্রমশঃ রহিত করতে হবে।
৫. কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন দুঃখজনক।

একচল্লিশের মার্চে লিবারালগণ বোম্বাইয়ে এক নির্দলীয় সম্মেলনে মিলিত হন। সম্মেলনকে নির্দলীয় বলা হলেও তা ছিল হিন্দুমহাসভা প্রভাবিত। এতে তিন চারজন মুসলমান অংশগ্রহণ করলেও তাঁরা মুসলিম স্বার্থে কোন কথা বলতে পারেননি। হিন্দু মহাসভার তিনজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি—সাভারকার, ডাঃ মুঞ্জে ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সম্মেলনে যোগদান করেন। তেজ বাহাদুর সাপ্রু সভাপতিত্ব করেন এবং স্যার নৃপেন্দ্র নাথ সরকার কতিপয় প্রস্তাব পেশ করেন যা গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। এতে তথাকথিত লিবারালগণ উষ্মা প্রকাশ করেন এবং ২৯শে জুন পুনায় ন্যাশনাল লিবারাল ফেডারেশনের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সংকট নিরসনের জন্যে তাঁদের উথাপিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্যে সরকারের তীব্র সমালোচনা করা হয়। মুসলিম লীগের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে ভারত সচিবের অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের জন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। ভারত বিভাগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয় এবং প্রস্তাবিত বিভাগ প্রতিরোধের জন্যে সকল ভারতবাসীর প্রতি আহবান জানানো হয়।

সাপ্রু প্রস্তাব বা সুপারিশের উপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন, কেন্দ্রে একটি জাতীয় সরকার গঠনের যে দাবী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে করা হয়েছে সাপ্রু প্রস্তাব তাই সমর্থন করে। এ প্রস্তাব মেনে নেয়া হলে তা হবে ব্রিটিশ সরকারের আগস্ট প্রস্তাব রহিত করার শামিল।

ভারত সচিব এল্ এম্ অ্যামেরী ২২শে এপ্রিল ১৯৪১, হাউস্ অব্ কমন্সে এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ভারতে যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা বিরাজ করছে তা এ জন্যে নয় যে, বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা দিতে রাজী নয়, বরঞ্চ এ জন্যে যে ভারত তার দাবীতে একমত হতে পারেনি। অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন ধরনের যে এক্সিকিউটিভের প্রস্তাব করা হয়েছে, তা হিন্দু মুসলিম অনৈক্য প্রশমিত না করে অধিকতর বর্ধিত করবে, আমি সাপ্রুর মতো লোকের কাছে এ

আবেদন রাখব যে, তাঁরা যেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

গান্ধীর প্রতিক্রিয়া

ভারত সচিবের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন মিঃ গান্ধী। তিনি বলেন, অনৈক্যের জন্যে ভারতের স্বাধীনতা বিলম্বিত হচ্ছে এ কথা বলে অ্যামেরী ভারতীয় জ্ঞানবুদ্ধির (Indian intelligence) অবমাননা করেছেন। ভারতের শ্রেণী বিভেদের জন্যে ব্রিটিশ রাজনীতিকগণই দায়ী। যতোদিন ব্রিটিশ অস্ত্রের মাধ্যমে ভারতকে পদানত রাখবে ততোদিন এ বিভেদ মতানৈক্য চলতে থাকবে। আমি স্বীকার করি যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে এক দুর্লংঘ্য ব্যবধান রয়েছে। ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ কেন স্বীকার করেন না যে এ একটি ঘরোয়া বিবাদ (Domestic quarrel)? তারা ভারত ছেড়ে চলে যাকনা, তারপর আমি ওয়াদা করছি, কংগ্রেস, লীগ এবং অন্যান্য দল তাদের নিজেদের স্বার্থেই একত্রে মিলিত হয়ে ভারত সরকার গঠনের সমাধান বের করবে। ··· বাইরের কোন হস্তক্ষেপ আহবান না করতে যদি আমরা একমত হই— তাহলে সম্ভবতঃ এ সংকট এক পক্ষকাল বিদ্যমান থাকবে। অন্য কথায় ব্রিটিশ ক্ষমতা ছেড়ে চলে গেলে, হিন্দুই যথেষ্ট শক্তিশালী হবে— সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে মুসলমানদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্যে। গান্ধীজির এ কথা কারো বুঝতে বাকী থাকার কথা নয়। ১৯৪৭-এর জুলাই পর্যন্ত তিনি তাঁর এ কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। মুসলিম জাতির অস্তিত্ব সহ্য করতে না পারা এবং উপরোক্ত অশোভন উক্তি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করে।

প্রতিরক্ষা পরিষদ (Defence Council) গঠন

একচল্লিশের ২০শে জুলাই বোম্বাই-এর গভর্ণর স্যার রজার লিউমলী মিঃ জিন্নাহর নিকটে এ মর্মে ভাইস্‌রয়ের এক বাণী পৌঁছিয়ে দেন যে, ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদনক্রমে ভাইস্‌রয় তাঁর এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিল (Executive Council) অতিরিক্ত পাঁচটি কোর্ট ফাইলসহ বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত করেছেন। নতুন পদ গ্রহণে যাঁরা সম্মত হয়েছেন তাঁরা হলেন স্যার হোসী মোদী, স্যার আকবর হায়দরী, আর রাও, এম্ এস্ এনী এবং স্যার ফিরোজ খান নূন। একই

সাথে ত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিরক্ষা পরিষদ (Defence Council) গঠনের কথাও বলা হয়। দেশীয় রাজ্য থেকেও দশজন সদস্য গ্রহণ করা হবে। এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব অপরিহার্য বিধায় বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব এবং সিন্ধুর প্রধানমন্ত্রীগণকেও তিনি সদস্যপদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

পরের দিন মিঃ জিন্নাহ স্যার রজার লিউমলীর পত্রের জবাবে ভাইস্‌রয়ের পদক্ষেপের প্রতি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, মুসলিম লীগের সভাপতি ও ওয়ার্কিং কমিটিকে ডিঙিয়ে এসব ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো নীতিবহির্ভূত হয়েছে। আগস্টের ২৪, ২৫ ও ২৬ তারিখে বোম্বাইয়ে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ তারিখের গৃহীত প্রস্তাবে পাঞ্জাব, বাংলা ও আসামের প্রধানমন্ত্রী যথাক্রমে স্যার সেকান্দার হায়াত খান, ফজলুল হক ও স্যার সা'দুল্লাহকে ন্যাশনাল ডিফেন্স কাউন্সিল থেকে পদত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়।

আটজন মুসলমান প্রতিরক্ষা পরিষদে যোগদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে পাঁচ জন সিকান্দার হায়াত, ফজলুল হক, সা'দুল্লাহ, বেগম শাহনওয়াজ এবং ছাতারীর নবাব, লীগের নির্দেশক্রমে পাঞ্জাব, বাংলা ও আসামের প্রধানমন্ত্রীগণ ১১ই সেপ্টেম্বর প্রতিরক্ষা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। ছাতারীর নবাব হায়দরাবাদ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভাপতি হওয়ার কারণে পূর্বেই পদত্যাগ করেন। বেগম শাহনওয়াজ এবং স্যার সুলতান আহমদ পদত্যাগ না করার জন্যে পাঁচ বছরের জন্যে লীগ থেকে বহিষ্কৃত হন। লীগ ২৬ ও ২৭ তারিখের দিল্লীর বৈঠকে সেন্ট্রাল এসেম্বলীর গোটা অধিবেশন থেকে বাইরে আসার সিদ্ধান্ত করে। তদনুযায়ী ২৮ তারিখে মুসলিম লীগ দল হাউস থেকে ওয়াকআউট করে। তাঁরা অভিযোগ করেন যে, ব্রিটিশ সরকার কেন্দ্রে এবং প্রদেশে লীগকে তার সত্যিকার দায়িত্ব ও অধিকারের অংশীদারিত্ব প্রদানে অস্বীকার করেন (The Struggle for Pakistan : I. H. Qureshi, pp. 169-191)

অক্টোবরের মাঝামাঝি ভাইস্‌রয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সম্প্রসারণ সম্পন্ন করা হয়। একই দিনে অসহযোগ আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট বহু কংগ্রেসীকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়। কংগ্রেসের একটি অংশ প্রস্তাব করে যে, প্রদেশে আবার ক্ষমতাগ্রহণ করা হোক। কিন্তু মিঃ গান্ধী এতে সম্মত হননি।

এদিকে লীগের অবস্থা সংকটমুক্ত ছিলনা। কারণ যেসব দল তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হচ্ছে বলে মনে করে তারা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। যদিও বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক প্রতিরক্ষা পরিষদ থেকে এস্তেফা দান করেন, তিনি তা করেছিলেন অনিচ্ছাকৃতভাবে। লীগ বিরোধীমহল তাঁকে পরোক্ষভাবে তাদের সমর্থনের নিশ্চয়তা দান করে। মুসলিম লীগের একটি দল ফজলুল হক সাহেবের লীগ থেকে বহিষ্কার দাবী করে। অন্যটি নমনীয় হওয়ার পক্ষে ছিল। কায়েদে আযম স্বয়ং কিছু অবকাশ দানের পক্ষে ছিলেন যাতে বাংলার প্রধানমন্ত্রী পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে পারেন। ফজলুল হক দুঃখ প্রকাশ করে যে পত্র দেন তা লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে আলোচনার পর বিষয়টির পরিসমাপ্তি ঘটে।

কিন্তু বছরের শেষে মিঃ ফজলুল হক এবং তাঁর জনৈক সহকর্মী ঢাকার নবাব, বাংলার আইন পরিষদের লীগ দল থেকে বেরিয়ে কংগ্রেস এবং অন্যান্য হিন্দু দলের সংগে মিলিত হয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। পরিষদের ইউরোপিয়ান দলও তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে। নতুন কোয়ালিশন সরকার এ কথাই প্রমাণ করে যে, একদিকে কংগ্রেস এবং অপরদিকে ব্রিটিশ সরকার বাংলায় মুসলিম লীগের প্রভাব বিনষ্ট করতে চান। লীগের পক্ষ থেকে ফজলুল হক সাহেবের কৈফিয়ৎ তলব করা হলে তিনি গড়িমসি করতে থাকেন। ফলে ১৯৪১ সালের ১১ই ডিসেম্বর ফজলুল হক সাহেবকে লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়। (Creation of Pakistan : Justice Sayed Shameem Husain Kadir, pp. 226-27)

অষ্টম অধ্যায়

ক্রিপ্‌স্ মিশন

একচল্লিশের শেষ দিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করে এবং তা ভারত উপমহাদেশের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। জাপানের হাতে বৃটেন ও তার মিত্রশক্তির দুর্গ সিংগাপুরের পতন ঘটে এবং বার্মার পতনও ছিল আসন্ন। কিছু লোকের সহানুভূতি ছিল জাপানের প্রতি। কংগ্রেস নেতাদের অনেকেই বৃটেন ও তার শত্রুকে একই চোখে দেখতেন। গান্ধী বলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দুষ্কর্মের শাস্তিস্বরূপ ভগবান হিটলারকে পাঠিয়েছেন। কংগ্রেস মনে করতো যুদ্ধে বৃটেন কোণঠাসা হয়ে পড়লে তার থেকে বেশী বেশী রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করা যাবে।

সাতই মার্চ ১৯৪২, জাপান বার্মা দখল করে। তার মাত্র চার দিন পর ১১ই মার্চ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিল হাউস্ অব্ কমন্সে গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দানের পর ওয়ার কেবিনেট (War Cabinet) কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। সিদ্ধান্তগুলো একটি খসড়া ঘোষণায় সন্নিবেশিত হয়। সেই খসড়া ঘোষণা নিয়ে স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ ২৯শে মার্চ ভারতে আগমন করেন। খসড়ার ভূমিকায় বলা হয় যে, একটি নতুন ভারতীয় ডমিনিয়ন গঠন এ ঘোষণার উদ্দেশ্য।

খসড়া ঘোষণার সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

যুদ্ধশেষ হওয়ার সাথে সাথে সংবিধান রচনার জন্যে ভারতে একটি 'বডি' বা পরিষদ গঠন করা হবে। দেশের প্রাদেশিক পরিষদগুলোর আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে এ পরিষদ নির্বাচিত করবে। এতে দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

এ বডি বা পরিষদ কর্তৃক রচিত যে কোন সংবিধান বৃটেন গ্রহণ করবে তিনটি শর্তে ঃ

১. যে কোন প্রদেশ প্রস্তাবিত ইউনিয়নে যোগদান করা থেকে বিরত থাকতে পারবে তাদের শাসনতান্ত্রিক মর্যাদাসহ। এ ধরনের প্রদেশগুলো ইচ্ছা করলে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের অনুরূপ নিজেদের পৃথক ইউনিয়নও গঠন করতে পারবে।

২. যেহেতু ব্রিটিশের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা পরিপূর্ণরূপে হস্তান্তরিত হতে যাচ্ছে, সেজন্য এ সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপারে বৃটেন এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী পরিষদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পন্ন হবে। এ চুক্তি সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

৩. দেশীয় রাজ্যসমূহ যদি শাসনতন্ত্র মেনে না নেয়, তাহলে তাদের চুক্তি ব্যবস্থায় কিছু রদবদলের জন্যে তাদের সাথে আলোচনার প্রয়োজন হবে।

স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ ৩০শে মার্চ বেতার ভাষণের মাধ্যমে খসড়া ঘোষণার ব্যাখ্যা দান করেন। বেতার ভাষণের পর ক্রিপ্‌স্ স্কীমটি গ্রহণ করার জন্যে সকল ভারতবাসীর প্রতি আবেদন জানান।

ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়া

স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলাপ আলোচনা অব্যাহত রাখেন। তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই এ আলোচনা চলতে থাকে। (এক) প্রস্তাবিত ভারতীয় ইউনিয়নে প্রদেশের যোগদান না করার স্বাধীনতা। (দুই) শাসনতন্ত্র প্রণয়ন পরিষদে দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্ব এবং (তিন) সত্বর একটি দায়িত্বশীল সরকার গঠন।

খসড়া ঘোষণার নন্ এক্সেশন ক্লজে (Non-accession Clause) প্রদেশগুলোকে এ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যে, ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করা থেকে তারা বা কোন কোন প্রদেশ বিরত থাকতে পারে। এ সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া ছিল ভয়ানক তীব্র। তার ধারণা, এতে ভারতের অখন্ডতার প্রতি চরম আঘাত হানা হবে। তাই তা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না।

দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে কংগ্রেসের দাবী হলো যে, যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতিতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে। এতে কংগ্রেসের সুবিধা এই যে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসকে সমর্থন করবে। এ ব্যবস্থা কিন্তু মুসলিম লীগ মেনে নিতে পারেনা। তৃতীয়তঃ কংগ্রেসের জোর দাবী এই যে কেন্দ্রে সত্বর একটি দায়িত্বশীল সরকার গঠন করা হোক। এতে মুসলিম লীগ ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে বলে তারা এ দাবী মেনে নিতে পারেনা।

স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সের সাথে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের কিছু দিন যাবত পত্র বিনিময় হয়। কিন্তু কংগ্রেসের দাবী মেনে নেয়া হয়নি বলে ১১ই এপ্রিল কংগ্রেস ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার ঘোষণা করে।

মুসলিম লীগও ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব মেনে নিতে পারেনি। মুসলিম লীগের কথা এই যে, যতোক্ষণ না পাকিস্তান স্কীমের মূলনীতি মেনে নেয়া হয়েছে এবং মুসলিম ভারতের সত্যিকার রায় প্রতিফলিত হয় এমন কোন পদ্ধতিতে মুসলিমদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার মেনে নেয়া না হয়েছে, ভবিষ্যতের কোন স্কীম বা প্রস্তাব মুসলিম লীগ মেনে নিতে পারবে না।

ক্রিপ্‌স্ মিশনের ব্যর্থতার পর

ক্রিপ্‌স্ মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর স্বয়ং কংগ্রেস চরম ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের শিকার হয়। কংগ্রেস চেয়েছিল একটি জাতীয় সরকার গঠনের মাধ্যমে উপমহাদেশের উপর তার শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে। এ ছিল ভারতীয় মুসলমানদের পদদলিত করে রাখার এক নির্মম দুরভিসন্ধি। যাহোক ব্রিটিশ সরকার তাঁদের স্বার্থেই কংগ্রেসের এ অন্যায় আবদার মেনে নিতে পারেননি।

বৃটেন যুদ্ধে হেরে গেছে এটাকে স্বতঃসিদ্ধ মনে করে গান্ধী ১৯৪০-এর মে মাসে ভাইস্‌রয়কে লিখিত এক পত্রে বলেন, "এ নরহত্যা বন্ধ করতে হবে। তোমরা ত হেরে যাচ্ছ। এর পরও যদি জিদ ধরে থাক, তাহলে অধিকতর রক্তপাত ঘটবে। হিটলার একজন মন্দ লোক নয়। তোমরা আজ যুদ্ধ বন্ধ করলে, সেও তোমাদের অনুসরণ করবে।" ভাইস্‌রয় এ ঔদ্ধত্য ও বিশ্বাসঘাতকতার জবাব অতি নম্রভাবে দিয়ে বলেন, আমরা এখন যুদ্ধরত আছি। আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌছার পূর্বে আমরা নড়চড় করব না। আমাদের জন্যে আপনার উৎকণ্ঠা বুঝতে পারছি। তবে সব ঠিক ঠাক হয়ে যাবে।

গান্ধী ভাইস্‌রয়ের জবাবে তুষ্ট না হয়ে ৬ই জুলাই প্রত্যেক ইংলন্ডবাসীর প্রতি এক আবেদনে বলেন, অস্ত্র সংবরণ কর। কারণ এ তোমাদের নিজেদেরকে এবং মানবতাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তোমরা হিটলার ও মুসোলিনিকে ডেকে আনবে এবং তারা তোমাদের সব কিছুই কেড়ে নেবে। ঠিক আছে, তাদেরকে

তোমাদের মনোরম অট্টালিকাদিসহ তোমাদের সুন্দর দ্বীপ দখল করতে দাও।

—(The Struggle for Pakistan, I. H. Qureshi; Both the letter are quoted in G.D. Birla in the Shadow of the Mahatma : A Personal Memoir (Bombay, 1953, p. 302)

ক্রিপ্‌সের বেতার ভাষণ

স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ ২৬শে জুলাই, আমেরিকাবাসীদের জন্যে তাঁর প্রদত্ত বেতার ভাষণে, তাঁর ভারত ভ্রমণের সময় থেকে সর্বশেষ ভীতিপ্রদর্শন পর্যন্ত কংগ্রেস রাজনীতির পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, কোন দায়িত্বশীল সরকার কংগ্রেসের দাবী বিবেচনা করতে পারেন না। কংগ্রেস আধিপত্যের চরমবিরোধী মুসলমানগণ এবং কয়েক কোটি অনুন্নত সম্প্রদায়ও এ দাবী মানতে পারে না। গান্ধীর দাবী মেনে নেয়ার অর্থ চরম অরাজকতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা।

তিনি আরও বলেন, আমরা একজন কল্পনাপ্রবণকে প্রাচ্যে জাতিসংঘের বিজয় প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করতে দিতে পারি না, তিনি অতীতে যতোবড়োই স্বাধীনতা সংগ্রামী থাকুন না কেন।

পন্ডিত নেহরু উক্ত বেতার ভাষণের প্রতিবাদে স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌কে 'শয়তানের উকিল' (Devil's advocate) বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, বৃটেন ভারতের যে অনিষ্ট করেছে এবং এখন ও করছে, তার জন্য তার উচিত ছিল অনুতপ্ত হ'য়ে অতি বিনীতভাবে আমাদের নিকটে আবেদন পেশ করা।

মুসলমানদের কংগ্রেস দাবীর বিরোধিতাকে নেহরু প্রত্যাখ্যান করে বলেন, আমার মুসলমান দেশবাসীকে আমি স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ অপেক্ষা ভালোভাবে জানি এবং তাদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা অপবাদ মাত্র। (The Struggle for Pakistan, I.H. Qureshi; Documents on the Indian Situations Since the Cripps Mission, pp 47-48)

'ভারত ছাড়' আন্দোলন (Quit India Movement)

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত তার অধিবেশনে 'ভারত ছাড়' (Quit India) প্রস্তাব গ্রহণ করে। এর মনস্তাত্ত্বিক কারণ বড়ো দুঃখজনক।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মনে করেছিলেন যে যুদ্ধে মিত্র শক্তির পরাজয় অবধারিত। এই সুযোগে দেশে চরম বিশৃংখলা সৃষ্টি করে সমগ্র দেশের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করা ছিল কংগ্রেসের পরিকল্পনার অধীন। এভাবেই মুসলমানদের সকল দাবী দাওয়া প্রত্যাখ্যান করে উপমহাদেশে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করা যাবে। কংগ্রেসের এ পরিকল্পনার স্বীকৃতি পাওয়া যায় মাওলানা আবুল কালাম আযাদ–এর 'ইন্ডিয়া উইন্‌স্ ফ্রীডম' গ্রন্থে। তিনি বলেনঃ

তাঁর মনে এ পরিকল্পনা ছিল যে, যেইমাত্র জাপানীরা বাংলায় পৌঁছে যাবে এবং ব্রিটিশ সৈন্য বিহারে পিছু হটে আসবে, কংগ্রেস গোটা দেশের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করবে। কিন্তু কংগ্রেসের এ পরিকল্পনা অমূলক ও অবাস্তব প্রমাণিত হয়।

যাহোক, কংগ্রেস ৮ই আগষ্টে গৃহীত তার প্রস্তাবে ঘোষণা করে যে, সময়ের দাবী এই যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন শেষ হতে হবে। ভবিষ্যতের কোন প্রতিশ্রুতি অথবা নিশ্চয়তা দান বর্তমান পরিস্থিতির কোন উন্নতি সাধন করবেনা। অতএব অতি সত্বর ভারতের স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে হবে। অতঃপর দেশের প্রধান প্রধান দলগুলোর সহযোগিতায় একটি সাময়িক সরকার গঠিত হবে। তার কাজ হবে ভারতের প্রতিরক্ষা এবং আগ্রাসন প্রতিরোধ করা। কংগ্রেস কমিটি ভারতের স্বাধীনতার সমর্থনে অহিংস পন্থায় চরম গণআন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব অনুমোদন করে। গান্ধী একে প্রকাশ্য বিদ্রোহ (Open rebellion) বলে অভিহিত করেন যা কোন সরকারই বরদাশত করতে পারেনা। অতএব পরদিন ৯ই আগষ্ট সকল কংগ্রেস নেতাকে গ্রেফতার করা হয় এবং কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়।

এমন তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের পরও কংগ্রেসের কর্মসূচী ব্যাহত করা সম্ভব হয়নি। গান্ধী যেটাকে অহিংস বলেন তাই প্রকৃত পক্ষে সহিংস। অতএব দেখা গেল সকল হিন্দু প্রদেশগুলোতে ব্যাপকহারে বিশৃংখলা ও ধ্বংসাত্মক

ক্রিয়াকান্ড শুরু হয়েছে। রেলস্টেশন জ্বালিয়ে দেয়া, রেল লাইন উৎপাটন, টেলিগ্রাফ তার কেটে দেয়া, পোষ্ট অফিস লুন্ঠন করা ও জ্বালিয়ে দেয়া প্রভৃতি 'অহিংস' (?) তৎপরতা পুরা মাত্রায় চলতে থাকে। বহু স্থানে হত্যাকান্ডও সংঘটিত হয়।

মুসলিম লীগ ত দূরের কথা বহু হিন্দু সংগঠনও কংগ্রেসের এহেন হঠকারী কর্মসূচী সমর্থন করতে পারেনি। ডঃ আম্বেদকার কংগ্রেস অভিযানের তীব্র সমালোচনা করেন। লিবারালগণ এবং তেজবাহাদুর সাপ্রু ও জয়াকর বিরূপ মন্তব্য করেন। ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট লীগ গান্ধীর এ নির্বোধ আচরণের নিন্দা করেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও এ আন্দোলন থেকে দূরে থাকে। ভাই পরমানন্দ, হিন্দু মহাসভার ভাইস্ প্রেসিডেন্ট 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সমালোচনা করেন এবং প্রেসিডেন্ট ভিভি সাভারকার তাঁর অনুসারিদেরকে কংগ্রেস অভিযান সমর্থন না করার নির্দেশ দেন। (The Struggle for Pakistan, I. H. Qureshi, p. 190)

কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ 'কুইট্ ইন্ডিয়া' আন্দোলনকে বেয়নেটের মুখে বল প্রয়োগে তাদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য করার এবং মারাত্মক গৃহযুদ্ধের সমতুল্য মনে করেন। সরকারের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ প্রকৃত পক্ষে মুসলিম লীগ ও অন্যান্য অকংগ্রেসী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে কংগ্রেসের এ আন্দোলন অবৈধ এবং অসাংবিধানিক। কারণ এর উদ্দেশ্য একটি প্রতিষ্ঠিত সরকার উচ্ছেদ করা।

বৃটেনবাসী এবং তথাকার বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এ আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করে। ইউরোপ আমেরিকার পত্র পত্রিকাও আগষ্ট আন্দোলনের বিরূপ সমালোচনা করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংকটপূর্ণ সময়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের বিদ্রোহ ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল তড়িঘড়ি সমগ্র ভারতের ক্ষমতা কুক্ষিগত করা। তার জন্যে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক তৎপরতা পরিচালনা করা হয়। এ কারণেই ক্রিপ্স্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়।

এ আগষ্ট আন্দোলনের আরও একটি কারণ ছিল এই যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ক্ষমতা হস্তান্তর বিলম্বিত হলে দেশ বিভাগ তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত

হয়ে পড়বে। অতএব ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা বানচাল করতে হলে ভারতের ক্ষমতা হস্তগত করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। এ ছিল কংগ্রেসের অপরিণামদর্শী চিন্তা ও পলিসি।

সি, আর ফর্মূলা

উপমহাদেশে মুসলমানদের প্রতি হিন্দুকংগ্রেসের বিদ্বেষাত্মক মনোভাব এবং তাদের নির্মূল করে অথবা নিদেনপক্ষে পদদলিত করে রেখে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার দুঃস্বপ্ন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলেছিল। এ কারণে তার আগাগোড়া পলিসি এই ছিল যে, যে কোন ব্যাপারে যদি দেখা যায় যে মুসলমানগণ সামান্য কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ করছে, তখন নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভংগ করার ন্যায় কংগ্রেস তা কিছুতেই হতে দেবে না। ক্রিপ্স্ প্রস্তাবে কিছুটা পাকিস্তান বা ভারত বিভাগের গন্ধ আবিষ্কার করে কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর যুদ্ধে ব্রিটিশের পরাজয় অবধারিত মনে করে 'ভারত ছাড়' (Quit India) আন্দোলন তথা ভারতের সর্বত্র বিশেষ করে হিন্দু অধ্যুষিত প্রদেশগুলোতে চরম ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড শুরু করে। আশা করেছিল, জাপানীরা ভারতের একাংশ দখল করে ফেল্লে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের দাবী মানতে বাধ্য হবে এবং সারা ভারতে সে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। কিন্তু ফলটি হয়েছে উল্টো। 'ভারত ছাড়' আন্দোলন কোন মহলই সমর্থন করেনি। এমন কি হিন্দু মহাসভা ও কমিউনিস্ট পার্টি পর্যন্ত এর তীব্র সমালোচনা করেছে। কংগ্রেসকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে, গান্ধীসহ সকল নেতাকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

অপরদিকে মুসলিম লীগের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পলিসি তার জনপ্রিয়তা ভেতরে বাইরে বর্ধিত করেছে। ১৯৪৩ এবং ১৯৪৪ সালে বাংলা, আসাম, সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা বলবৎ ছিল। পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট পার্টির মন্ত্রীসভা বলবৎ থাকলেও তাঁরা মুসলিম লীগ ও ভারত বিভাগ সমর্থন করতেন। ফলে জনগণের সাথে গভীর যোগাযোগ থাকার কারণে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং পাকিস্তান আন্দোলনও শক্তিশালী হতে থাকে। এতে করে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

সাতাশে জুলাই ১৯৪৩, ভাইস্‌রয় লর্ড ওয়াভেলের কাছে লিখিত এক পত্রে গান্ধী বলেন, অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করতঃ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে পরামর্শ দিতে তিনি প্রস্তুত, যদি সত্বর ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সংসদের নিকটে দায়ী একটি জাতীয় সরকার গঠন করা হয় এ শর্তে যে যুদ্ধ চলাকালে সামরিক তৎপরতা যেমন আছে তেমন চলতে থাকবে কিন্তু ভারতের উপর কোন আর্থিক বোঝা চাপানো হবেনা।

ভাইস্‌রয় এ পত্রের জবাব দেন ১৫ই আগস্টে। এতে গান্ধীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। বলা হয়, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র প্রণীত হলে ব্রিটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে প্রস্তুত আছেন। তার পূর্বে বৃটেনের সাথে একটি চুক্তিও সম্পাদিত হতে হবে। গান্ধীর দাবী অনুযায়ী কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের নিকট দায়ী একটি জাতীয় সরকার গঠন করতে হলে বর্তমান শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করতে হবে। তা এখন কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে ভাইস্‌রয় বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রচলিত শাসনতন্ত্রের অধীন একটি পরিবর্তনকালীন সরকার (Transitional Govt.) গঠনে সহযোগিতা করার জন্যে সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। সকল দল ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পন্থা পদ্ধতি নিয়ে নীতিগতভাবে একমত হলে প্রস্তাবিত সরকার ভাল কাজ করতে পারবে।

গান্ধী তাঁর স্বভাবসুলভ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, ব্রিটিশ সরকার ৪০ কোটি মানুষের উপর যে শাসন ক্ষমতা লাভ করে আছেন, তা ততোক্ষণ পর্যন্ত হস্তান্তর করতে রাজী নন, যতোক্ষণ না ভারতবাসী তা ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষমতা লাভ করেছে।

মিঃ গান্ধীর এ কথায় আর একটি সহিংস আন্দোলনের হুমকি প্রচ্ছন্ন ছিল।

যাহোক ভাইস্‌রয়ের নিকট থেকে নৈরাশ্যজনক জবাবে কতিপয় কংগ্রেস নেতা কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজনীতা অনুভব করেন। তাঁদের ধারণা, কংগ্রেস তার প্রচেষ্টায় সরকারের সাথে একটা সমঝোতায় আসতে পারলে ত খুবই ভালো হতো। কিন্তু তা যখন

সম্ভব নয়, তখন মুসলিম লীগের সাথেই একটি সমঝোতা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

কংগ্রেসের এ ধরনের মনোভাব পরিবর্তনের পূর্বে প্রবীণ কংগ্রেসী নেতা রাজা গোপালাচারিয়া এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার অবসানের জন্যে ভারত বিভাগ অপরিহার্য। তিনি এ বিষয়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে সম্মত করার জন্যে জনসভায় তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করতে থাকেন। চেতাল্লিশের এপ্রিলে মাদ্রাজের এক জনসভায় তিনি বলেন, আমি পাকিস্তানের পক্ষে। কারণ আমি এমন রাষ্ট্র চাই না, যেখানে আমাদের হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের কোন মান সম্মান নেই। মুসলমান পাকিস্তান লাভ করুক। আমরা সম্মত হলে দেশটি রক্ষা পাবে। ব্রিটিশ সরকার অসুবিধা সৃষ্টি করলে তার মুকাবিলা আমরা করবো। ··· আমি পাকিস্তানের পক্ষে— তবে আমি মনে করি কংগ্রেস এতে রাজী হবে না। (The Struggle for Pakistan, I. H. Qureshi p. 205, Speech in Madras — April, 1943, quoted in Khaliquzzaman, p. 309)

রাজা গোপালাচারিয়া আরও বলেন, আমরা ব্রিটিশ শাসনের অবসান চাই। হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক মতানৈক্যও আমরা মিটাতে চাই। মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বশীল হিসাবে মুসলিম লীগকে আমাদের মেনে নিতে হবে। তারা চায় যে আমরা তাদের দাবী মেনে নিই। তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবী পাকিস্তান।

—(The Struggle for Pakistan, I. H. Qureshi, pp. 204-205)

রাজা গোপালাচারিয়া চেতাল্লিশ সালে একটি ফর্মূলা তৈয়ার করেন যা সি, আর ফর্মূলা নামে অভিহিত। ফর্মূলাটি কংগ্রেস লীগের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে বলে তিনি মনে করেন। জেলে গান্ধীর অনশনরত অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে ফর্মূলাটি তাঁকে দেখানো হয় এবং গান্ধী তা অনুমোদন করেন। অতঃপর ১০ই জুলাই ১৯৪৩, ফর্মূলাটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিস্বরূপ ফর্মূলাটি মহাত্মা গান্ধী এবং মিঃ জিন্নাহ মেনে নিয়ে তাঁরা যথাক্রমে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগকে মেনে নেয়ার জন্যে চেষ্টা চালাবেন। ফর্মূলার বিষয়বস্তু নিম্নরূপ ঃ

১. স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে নিম্নোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে মুসলিম লীগ ভারত স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করছে এবং পরিবর্তনশীল সময়ে একটি সাময়িক মধ্যবর্তী সরকার গঠনে কংগ্রেসের সাথে সহযোগিতা করবে।

২. ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে, যেখানে মুসলমান নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে সীমানা নির্ধারণের জন্যে একটি কমিশন নিয়োগ করা হবে। তারপর সে সব অঞ্চলে বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে এবং গণভোট দ্বারা ভারত থেকে পৃথক হওয়ার বিষয়টি মীমাংসিত হবে। ভারত থেকে পৃথক একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সপক্ষে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাওয়া যায় তাহলে সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। তবে সীমান্তের জেলাগুলোর যে কোন রাষ্ট্রে যোগদানের অধিকার থাকবে।

৩. গণভোট অনুষ্ঠানের পূর্বে সকল দলের বক্তব্য পেশ করার অধিকার থাকবে।

৪. ভারত থেকে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্তের পর প্রতিরক্ষা, ব্যবসাবাণিজ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্যে পারস্পরিক চুক্তি সম্পন্ন করতে হবে।

৫. অধিবাসী স্থানান্তর হবে সম্পূর্ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত ও ঐচ্ছিক।

৬. ভারত শাসনের জন্যে বৃটেন কর্তৃক সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তরের বেলায় ফর্মূলার শর্তাবলী অবশ্য পালনীয় হবে।

মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ফর্মূলাটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব জিন্নাহর উপর অর্পিত হয়।

বিষয়টি নিয়ে গান্ধী–জিন্নাহর মধ্যে বহু পত্র বিনিময় হয়। জিন্নাহ কতকগুলো প্রশ্ন উথাপন করেন। গান্ধী সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে ব্যর্থ হন।

সি, আর ফর্মূলার ব্যর্থতার কারণ

রাজা গোপালাচারিয়ার ফর্মূলার ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে মনে কতকগুলো প্রশ্নের উদয় হয়। এ নিয়ে গান্ধীর জিন্নাহর সাথে দীর্ঘ পত্র বিনিময়ের উদ্দেশ্য কি ছিল? এ ব্যাপারে কংগ্রেসের মনোভাব কি ছিল? অন্যান্য দলের অভিমত কি ছিল?

আলোচনার ব্যর্থতার প্রধান কারণ, গান্ধী মুসলমানদের পাকিস্তান দাবী কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। টু নেশন থিয়রী তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং একমাত্র কংগ্রেসকেই তিনি সকল ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন বলে বিশ্বাস করেন। আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববাসীকে দেখানো যে তিনি একটা সমঝোতায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছেন।

সাপ্রু প্রস্তাব

সি, আর ফর্মূলা ব্যর্থ হওয়ার পর স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু কতিপয় প্রস্তাব পেশ করে কংগ্রেস–মুসলিম লীগের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। বিগত ১৯৪১ সালে তিনি একটি নির্দলীয় সম্মেলন আহবান করেন। তাতে ফল কিছু হয়নি।

সাপ্রু নির্দলীয় সম্মেলনের স্ট্যান্ডিং কমিটি ১৯৪৪ সালের ৩রা ডিসেম্বর এলাহাবাদে মিলিত হয় এবং একটি কন্‌সিলিয়েশন কমিটি গঠন করে। তার সদস্য হলেন, স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু (চেয়ারম্যান), এম, আর জয়াকর (তিনি হাজির হননি), বিশপ্ ফস্ ওয়েস্টকট্, এস, রাধাকৃষ্ণন, স্যার হোসি মোদী, স্যার মহারাজ সিংহ, মুহাম্মদ ইউনুস, এন্ আর সরকার, ফ্র্যাংক এন্টনী এবং সন্ত সিংহ।

অতঃপর সাপ্রু ১০ই ডিসেম্বর জিন্নাহর নিকটে লিখিত পত্রে কন্‌সিলিয়েশন বোর্ডের লক্ষ্য–উদ্দেশ্য বর্ণনা করে সাক্ষাতপ্রার্থী হন।

জিন্নাহ ১৪ই ডিসেম্বর পত্রের জবাবে বলেন, তিনি কোন নির্দলীয় সম্মেলন অথবা তার স্ট্যান্ডিং কমিটিকে কোনরূপ স্বীকৃতি দানে নারাজ। সাপ্রু পরের বছর, ১৯৪৫ সালের ৮ই এপ্রিল তার কন্‌সিলিয়েশন কমিটির প্রস্তাবগুলির ঘোষণা দেন।

কমিটির প্রস্তাবগুলোতে কংগ্রেসের মনোভাবই পরিস্ফুট হয়েছে। প্রস্তাবের প্রথম দফায় ভারত বিভাগের দৃঢ়তার সাথে বিরোধিতা করা হয়েছে। পৃথক নির্বাচন রহিত করারও প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রস্তাবগুলো মুসলমানদের নিকটে যে কিছুইতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা তা বলার প্রয়োজন করে না। জিন্নাহ এ কমিটিকে কংগ্রেসের গৃহ চাকরানীর সাথে তুলনা করে বলেন, এ কমিটি গান্ধীর সুরে সুর মিলিয়েই কথা বলেছে।

দেশাই–লিয়াকত চুক্তি

নতুন বছর ১৯৪৫ আগমনের পর নতুন রাজনৈতিক হাওয়া প্রবাহিত হতে থাকে। বিগত আগষ্ট আন্দোলনের অপরাধে তখনও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কারাগারে। ভারতের পত্রপত্রিকায় কংগ্রেস–লীগের মধ্যে চুক্তির খবর বা গুজব প্রকাশিত হতে থাকে। কেন্দ্রীয় আইনসভার কংগ্রেস সদস্যগণ কয়েক মাস ধরে নিয়মিত আইনসভায় যোগদান করতে থাকেন এবং আইনসভার মুসলিম লীগ সদস্যদের সাথে মিলেমিশে কাজ করতে থাকেন। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা ভুলাভাই দেশাই লীগ দলের নেতা লিয়াকত আলী খানের সাথে পুরোপুরি একমত হয়ে কাজ করছেন বলে শুনা যায়। একটি সাময়িক জাতীয় সরকারের সংবিধান নিয়ে উভয় নেতা একটি সমঝোতায় উপনীত হয়েছেন বলেও শুনা যায়। দেশাই ১৩ই জানুয়ারী ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী স্যার ইভান জেনকিন্সের সাথে এবং ২০শে জানুয়ারী ভাইসরয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সাক্ষাতে দেশাই–লিয়াকতের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছে বলে ভাইসরয়কে অবহিত করা হয়। দেশাই বলেন, এ চুক্তির প্রতি গান্ধীর সমর্থন আছে। তিনি আরও বলেন যে, লিয়াকত আলীর সাথে আলোচনার বিষয় সম্পর্কে জিন্নাহ অবহিত আছেন এবং তিনি এ কথিত চুক্তি অনুমোদন করেন।

কথিত চুক্তিটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

কংগ্রেস এবং লীগ একমত যে তাঁরা কেন্দ্রে একটি মধ্যবর্তী সরকারে যোগদান করবেন। তা নিম্ন পদ্ধতিতে গঠিত হবেঃ

(ক) কংগ্রেস এবং লীগ সমসংখ্যক সদস্য মনোনয়ন করবে (মনোনীত ব্যক্তিগণের কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য হওয়া জরুরী নয়)।

(খ) সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি (বিশেষ করে তফ্‌শিলি সম্প্রদায় এবং শিখ)।

(গ) সামরিক বাহিনী প্রধান।

সরকার গঠিত হওয়ার পর তা ভারত সরকার আইনের (১৯৩৫) অধীন কাজ করতে থাকবে। মন্ত্রীসভা যদি কোন বিশেষ কর্মপন্থা বা ব্যবস্থা আইনসভার দ্বারা পাশ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে গভর্ণর জেনারেল বা ভাইসরয়ের বিশেষ ক্ষমতার শরণাপন্ন হয়ে তা বলবৎ করতে যাবেনা। এতে করে ভাইসরয়ের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ হবে।

এ বিষয়েও কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ঐকমত্য হয় যে, এ ধরনের সাময়িক সরকার গঠিত হলে তার প্রথম কাজ হবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে কারামুক্ত করা।

এ চুক্তির ভিত্তিতে গভর্ণর জেনারেলকে অনুরোধ করা হবে তিনি যেন সরকারের নিকটে এ ধরনের প্রস্তাব পেশ করেন যে, কংগ্রেস ও লীগের চুক্তির ভিত্তিতে একটি সাময়িক সরকার গঠনে তিনি আগ্রহী।

গভর্ণর জেনারেল দেশাই–লিয়াকত চুক্তির প্রস্তাবগুলো ভারত সচিবকে জানিয়ে দেন। তিনি এ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন উথাপন করে তার ব্যাখ্যা দাবী করেন।

গভর্ণর জেনারেল দেশাই ও লিয়াকত আলীর সাথে সাক্ষাৎ করবেন এমন সময় জিন্নাহ এক বিবৃতির মাধ্যমে বলেন, তিনি চুক্তি সম্পর্কে কিছুই জানেন না। দেশাই হতাশ না হয়ে চুক্তির বৈধতা সম্পর্কে দৃঢ়তা প্রকাশ করতে থাকেন। গভর্ণর জেনারেল বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্যে বোম্বাই–এর গভর্ণর স্যার জন কোলভিনকে জিন্নাহর সাথে দেখা করে অনুরোধ করতে বলেন যে তিনি তাঁর সাথে দিল্লীতে দেখা করলে খুশী হবেন। জিন্নাহ বলেন, তিনি দেশাই–লিয়াকত চুক্তি সম্পর্কে কিছুই জানেন না এবং এ চুক্তি মুসলিম লীগের অনুমতি ব্যতিরেকেই করা হয়েছে।

এদিকে গান্ধীর অনুমোদন থাকলেও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দেশাই–এর সমালোচনা করেন। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়েই চুক্তিটি প্রত্যাখ্যান করে।

নবম অধ্যায়

ওয়াভেল পরিকল্পনা ১৯৪৫

দেশাই-লিয়াকত চুক্তি ব্যর্থ হওয়ার পর, ব্রিটিশ সরকারের সাথে আলাপ আলোচনার জন্যে ভাইসরয় মে মাসে লন্ডন গমন করেন। অতঃপর তিনি সরকারের পক্ষ থেকে অচলাবস্থা দূরীকরণের জন্যে একটি প্রস্তাব নিয়ে ভারতে ফিরে আসেন।

ভারত সচিব ১৪ই জুন হাউস্ অব্ কমন্সে এক বিবৃতির মাধ্যমে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান কল্পে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবে বলা হয়, ভাইসরয় তাঁর কার্যকরী কাউন্সিল এমনভাবে পুনর্গঠিত করবেন যাতে তিনি ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্য থেকে কিছু লোককে তাঁর কাউন্সিলর মনোনীত করতে পারেন। এতে প্রধান সম্প্রদায়গুলোর ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব থাকবে মুসলমান ও বর্ণহিন্দুর সমানুপাতে। এ কাউন্সিলে ভাইসরয় ও সেনাপ্রধান ব্যতীত সকলে হবেন ভারতীয়। এ কাউন্সিল পুনর্গঠনে সকলের সহযোগিতা লাভের পর সকল প্রদেশ থেকে ৯৩ ধারা প্রত্যাহার করা হবে যাতে জনপ্রিয় মন্ত্রীসভা গঠিত হতে পারে।

একই দিনে এ প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করে ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল দিল্লী থেকে এক বেতার ভাষণ দান করেন। গান্ধী এবং কংগ্রেস কাউন্সিলে মুসলমান ও বর্ণহিন্দুর সমসংখ্যক প্রতিনিধিত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করেন।

শিমলা সম্মেলন

ভাইসরয় তাঁর চেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্যে ২৫শে জুন শিমলায় সকল দলের সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের এবং অন্যান্য দলের একুশ জন যোগদান করেন—যাদের মধ্যে মুসলিম লীগের জিন্নাহ ও লিয়াকত আলীসহ ছয় জন ছিলেন। সম্মেলনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে চরম মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন, এমন কোন ব্যবস্থা, সাময়িক বা স্থায়ী হোক, কংগ্রেস মেনে নিতে পারেনা—যা তার জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে, এক

জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত করে এবং কংগ্রেসকে একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত করে।

জিন্নাহ বলেন, পাকিস্তান ব্যতীত অন্য কোন কিছুর ভিত্তিতে গঠিত শাসনতন্ত্র লীগ মেনে নিতে পারে না। ২৬ এবং ২৭ তারিখেও আলোচনা অব্যাহত থাকে। ইউপি-এর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জি বি পন্তের (PANT) সাথে জিন্নাহর আলাপ আলোচনা চলছিল বিধায় ২৭ তারিখের বৈঠক অল্প সময় পর মুলতবী করা হয়। অতঃপর ২৮ ও ২৯ তারিখে সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। জিন্নাহ-পন্ত আলোচনা ব্যর্থ হয় বলে জানা যায়। ভাইসরয় আলোচনার একটা ভিন্ন পথ অবলম্বন করে সম্মেলনে যোগদানকারী প্রত্যেক দলকে একটি করে নামের তালিকা দাখিল করতে অনুরোধ করেন যারা হবেন ভাইসরয়ের কাউন্সিলের সদস্য। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়েরই ৮ জন থেকে ১২ জনের নামের একটি করে তালিকা পেশ করবেন।

তেসরা জুলাই কংগ্রেস তার নামের তালিকা ভাইসরয়ের নিকটে প্রেরণ করে। ৬ই জুলাই মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে পরদিন জিন্নাহ ভাইসরয়-এর কাছে নিম্নোক্ত প্রস্তাব পেশ করেন ঃ

১. মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে নামের তালিকা গ্রহণ করার পরিবর্তে ভাইসরয়-এর সাথে জিন্নাহর ব্যক্তিগত আলোচনার পর কাউন্সিলের জন্যে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হবে।
২. কাউন্সিলের সকল মুসলিম সদস্য মুসলিম লীগ বেছে নেবে।
৩. কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সিদ্ধান্ত থেকে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে ফলপ্রসূ রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

শেষবারের মতো ১১ই জুলাই ভাইসরয় ও জিন্নাহর মধ্যে আলাপ আলোচনার পর ভাইসরয় বলেন, মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে চারজন মুসলিম সদস্য কাউন্সিলে নেয়া হবে এবং পঞ্চম ব্যক্তি হবেন একজন অ-লীগ পাঞ্জাবী মুসলমান।

একথার পর জিন্নাহ বলেন, লীগ সরকারের সাথে কাউন্সিল গঠনে সহযোগিতা করতে পারেনা। অতএব ভাইসরয়-এর শিমলা সম্মেলনও ব্যর্থ হয়।

ব্যর্থতার কারণ

শিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতার একই কারণ যা কংগ্রেস-লীগ সমঝোতার সকল প্রচেষ্টা বানচাল করে দিয়েছে। তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাসী মানুষ, তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত অস্বীকারকারীর সাথে মিলে এক জাতি হতে পারে না কিছুতেই। তাই মুসলমানগণ একটি স্বতন্ত্র জাতি—মুসলিমলীগের এ দাবী অকাট্য সত্য যা এ উপমহাদেশের বুকে সংঘটিত অসংখ্য ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত। অতএব জিন্নাহ যদি দাবী করেন যে, যেহেতু মুসলমানগণ একটা স্বতন্ত্র জাতি, সেহেতু ভাইসরয়-এর কাউন্সিলে মুসলিম প্রতিনিধি মনোনয়নের অধিকার মুসলিম জাতির প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন মুসলিম লীগের, তাহলে তা নীতিগতভাবে সকলের মেনে নেয়া উচিত। আর মুসলমানগণ একটি স্বতন্ত্র জাতি হওয়ার কারণেই তাদের জন্যে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানের দাবী করা হয়েছে এবং তার জন্যে সংগ্রাম অব্যাহত আছে। কিন্তু কংগ্রেসের অন্যায় ও অবান্তর দাবী হচ্ছে উপমহাদেশের সকল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এক জাতি এবং তার প্রতিনিধিত্বকারী কংগ্রেস। দেশের ভবিষ্যৎ শাসন ক্ষমতা কংগ্রেস দাবী করে এবং তা হাতে পেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু শাসনের অধীনে মুসলমানদের নির্মূল করা যাবে। মুসলমানদের এ আশংকা কল্পনাপ্রসূত নয়, প্রমাণিত সত্য। এ সত্য কংগ্রেস মেনে নিতে রাজী নয়। ভাইসরয় ও কংগ্রেসের দাবীর সমর্থনে জিন্নাহর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান হলে সম্মেলন ব্যর্থ হয়।

সাধারণ নির্বাচন

জাপানের আত্মসমর্পণের পর ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৫ বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। তার পূর্বে জুলাইয়ের শেষ দিকে ইংলন্ডের সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বহু পূর্ব থেকেই লেবার পার্টির সাথে কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং এবারের নির্বাচনের ফলাফল কংগ্রেসকে খুবই উল্লসিত করে। এর থেকে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য কংগ্রেস তৎপরতা শুরু করে। ব্রিটিশ পলিসিই ছিল ভারতের অখন্ডতার পক্ষে এবং এ ইস্যুটিতে লেবার পার্টির বেশী বেশী সমর্থন কংগ্রেস লাভ করবে বলে আশা করে। আর এ ইস্যুটিই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে বিরাট দূরত্ব সৃষ্টি করে রেখেছিল। কংগ্রেসের দাবী মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে এক জাতি এবং অখন্ড ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ

দলের শাসন। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগের দাবী, মুসলমানগণ একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি এবং সে কারণেই তাদের জন্যে হতে হবে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র। এ দুই বিপরীতমুখী দাবীর চূড়ান্ত ফয়সালার জন্যে বছরের শেষে শীতের মওসুমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার জন্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়।

নির্বাচনে মুসলিম লীগের দাবী পুরোপুরি স্বীকৃতি লাভ করে। কেন্দ্রীয় আইনসভার সকল মুসলিম আসন মুসলিম লীগ লাভ করে। প্রাদেশিক আইন সভাগুলোর ৪৯৫ মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ লাভ করে ৪৪৬টি আসন। হিন্দু প্রধান প্রদেশগুলোতে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং তা ছিল অতি স্বাভাবিক। বাংলায় ১১৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ লাভ করে ১১৩টি। এ, কে, ফজলুল হক মুসলিম লীগ ত্যাগ করার ফলে তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবের কারণে মুসলিম লীগের ছয়টি আসন হাতছাড়া হয়। এখানে হুসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা গঠন করেন।

পাঞ্জাবে ৮৬টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৭৯টি মুসলিম লীগের হস্তগত হয়। সিন্ধুতেও মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। সীমান্ত প্রদেশে সীমান্ত গান্ধী নামে কথিত চরম কংগ্রেসপন্থী আবদুল গাফ্ফার খানের প্রচন্ড প্রভাবের দরুন মুসলিম লীগ ৩৬টি আসনের মধ্যে ১৭টি লাভ করে এবং ডাঃ খান মন্ত্রীসভা গঠন করেন।

তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে এ সাধারণ নির্বাচনে এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, একমাত্র মুসলিম লীগই মুসলিম ভারতের প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এতে কংগ্রেসের মুসলিম লীগ বিরোধিতা তীব্রতর আকার ধারণ করে। মুসলিম লীগের প্রতিনিধিত্বমূলক বৈশিষ্ট্য মেনে নিয়ে তার সাথে একটা রাজনৈতিক সমঝোতায় উপনীত হওয়ার পরিবর্তে কংগ্রেস মুসলমানদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টির পলিসি অবলম্বন করে এবং মুসলমানদের আস্থাশীল প্রতিনিধিদের হাতে, এমনকি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশেও রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। এর ফলে সাম্প্রদায়িক মতভেদ তীব্রতর হয় এবং উভয়ের মধ্যে আপস নিষ্পত্তি অসম্ভব হয়ে পড়ে।

পাঞ্জাব সম্পর্কে কংগ্রেসের গৃহীত পলিসি তার বৈরিতাপূর্ণ মানসিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ ৮৬ মুসলিম আসনের মধ্যে ৭৯টি লাভ করে। শক্তিশালী ইউনিয়নিস্ট পার্টি মুসলিম লীগের নিকটে চরমভাবে পরাজিত হয়। এ দলে মাত্র দশজন সদস্য, তার মধ্যে ৩ জন অমুসলিম। কংগ্রেস ৫১, আকালী শিখ ২২। সর্ববৃহৎ দল মুসলিম লীগেরই মন্ত্রীসভা গঠন অত্যন্ত ন্যায়সংগত ছিল। হিন্দু ও শিখদের নিয়ে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারতো। কিন্তু কংগ্রেসের অন্ধ মুসলিম বিদ্বেষ এবং শিখদের অপরিণামদর্শিতার ফলে তা সম্ভব হয়নি। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আবুল কালাম আজাদ এবং বলদেব সিংহ, কংগ্রেস এবং আকালী শিখদলের সহযোগিতায় মন্ত্রীসভা গঠনের জন্যে ইউনিয়নিস্ট দলের নেতা খিজির হায়াতকে প্ররোচিত ও সম্মত করেন। এ নীতিহীন জোট গঠন করা হয়েছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাবে মুসলিম লীগকে ক্ষমতা গ্রহণ থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে। আবুল কালাম আজাদ পাঞ্জাবে অমুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারায় অত্যন্ত আত্মতৃপ্তি লাভ করেন ও গর্ববোধ করেন। (Maulana Abul Kalam Azad : India Wins Freedom, p. 137)

কংগ্রেসের পাঞ্জাব মন্ত্রীসভায় যোগদানের নিন্দা করেন জওহরলাল নেহরু এবং গান্ধী আবুল কালাম আজাদকে সমর্থন করে বলেন, কংগ্রেসের দৃষ্টিতে এর চেয়ে ভালো সমাধান আর কিছু ছিল না। (The Emergence of Pakistan : Choudhury Muhammad Ali, p. 49)

দশম অধ্যায়

কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা

বৃটিশ সরকার ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬, ঘোষণা করেন যে, ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনান্তে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে একটি সমঝোতায় উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে তিনজন কেবিনেট মন্ত্রী সমন্বয়ে একটি বিশেষ মিশন ভারতে প্রেরণ করা হবে।

এ প্রসংগে হাউস্ অব কমন্সে ১৫ই মার্চ এক বিতর্ক চলাকালে প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী বলেন, বহু জাতি, ধর্ম ও ভাষার দেশ ভারতে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার অপসারণ ভারতীয়দের দ্বারাই হবে। আমরা সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। ··· তাই বলে আমরা সংখ্যাগুরুর অগ্রগতিতে ভেটো প্রদান করার অনুমতি সংখ্যালঘুকে দিতে পারিনা।

প্রধানমন্ত্রীর উক্ত বক্তব্যে কংগ্রেস ভয়ানক উল্লসিত হয়। কিন্তু এতে লীগ মহলে সংশয় দেখা দেয় এবং জিন্নাহ মাকড়সার জালে মাছির আমন্ত্রণের দৃষ্টান্ত পেশ করে বলেন—If the fly refuses, it is said a veto is being exercised and the fly is intransigent (মাছি মাকড়সার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে বলা হয় ভেটো প্রদান করা হচ্ছে এবং মাছি আপোসকামী নয়।

—('Cabinet Mission and After, Muhammad Ashraf, p. 1-3, Choudhury Mohammad Ali : Emergence of Pakistan', p. 52)

এর চেয়ে সুন্দর দৃষ্টান্ত আর কিছু হতে পারেনা। সংখ্যাগরিষ্ঠের একচ্ছত্র প্রাধান্য ও আধিপত্যের ফাঁদে পা দিতে সংখ্যালঘু রাজী না হলে সেটাকে ভেটোর সমতুল্য মনে করে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেন, তা করতে দেয়া যাবেনা। এতে এট্‌লী তথা বৃটিশ সরকারের মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে পড়ে।

যাহোক প্যাথিক লরেন্স (ভারত সচিব), স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ (প্রেসিডেন্ট অব দি বোর্ড অব ট্রেডস) এবং মিঃ এ, ডি, আলেকজান্ডারকে (ফার্স্ট লর্ড অব দি এডমিরাল্টি) নিয়ে গঠিত কেবিনেট মিশন ২৪শে মার্চ, ১৯৪৬ নতুন দিল্লী পৌঁছেন।

মিশন সদস্যগণ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে, প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীদের সাথে এবং আরও বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তির সাথে দেখাসাক্ষাৎ ও মত বিনিময় করেন। দেশীয় রাজ্যের শাসকবৃন্দ ও মন্ত্রীদের সাথেও তাঁরা আলাপ আলোচনা করেন।

কেবিনেট মিশনে ক্রিপ্‌স্ আছেন জেনে আবুল কালাম আজাদ গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন। কারণ তিনি ছিলেন কংগ্রেসীদের পুরাতন অন্তরংগ বন্ধু। ক্রিপ্‌স্ ইতিপূর্বে ভারতে এসে জনৈক ভারতীয় হিন্দু সুধীর চন্দ্র গুপ্তের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। (Moulana Abul Kalam Azad : 'India Wins Freedom', p. 146)

আজাদ তেসরা এপ্রিল মিশনের সাথে দেখা করেন। স্বাধীনতাকে ভিত্তি করে তিনি তাঁর যুক্তিতর্কের প্রাসাদ নির্মাণ করে রেখেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, একটি গণপরিষদ ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র তৈরী করবে এবং কংগ্রেসের দাবী হচ্ছে একটি ফেডারেল সরকার গঠনের যার হাতে থাকবে অন্ততঃ দেশ রক্ষা, যোগাযোগ এবং বৈদেশিক বিভাগ। ভারত বিভাগ কংগ্রেস কিছুতেই মেনে নেবেনা।

জিন্নাহ ৪ঠা এপ্রিল মিশনের সাথে দেখা করেন। ১৭ই এপ্রিল আজাদ পুনরায় সাক্ষাৎ করেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই তাদের নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করে। মুসলিম লীগের বক্তব্য কংগ্রেস সভাপতিকে জানানো হয়।

কংগ্রেস চায় যে একটি মাত্র গণপরিষদ হবে যা নিখিল ভারত ফেডারাল সরকার এবং আইন সভার জন্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। কেন্দ্রীয় ফেডারাল সরকারের হাতে বৈদেশিক বিভাগ, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ, মৌলিক অধিকার, মুদ্রা, কাস্টম এবং পরিকল্পনা বিভাগ থাকবে।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার মুসলিম লীগ সদস্যদের নিয়ে ৯ই এপ্রিল, ১৯৪৬, যে কন্‌ভেনশন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়, তাতে গৃহীত প্রস্তাবে দাবী করা হয় যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাংলা ও আসাম এবং পশ্চিমে পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান নিয়ে একটি সার্বভৌম স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করা হোক এবং পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের লোকদের নিয়ে তাদের নিজ নিজ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য দুটি পৃথক পৃথক গণপরিষদ গঠন করা হোক। এ প্রস্তাব অনুযায়ী মুসলিম লীগ কেবিনেট মিশনের নিকটে প্রস্তাব পেশ করেন যে পাকিস্তান গ্রুপের ছয় প্রদেশের জন্যে একটি এবং হিন্দুস্থান গ্রুপের ছয় প্রদেশের জন্যে অন্য একটি

গণপরিষদ গঠন করা হোক।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একে অপরের প্রস্তাব মেনে নিতে পারেনি। প্রধান বিতর্কিত বিষয় ছিল এই যে উপমহাদেশে একটি মাত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে, না দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। উভয় অবস্থাতেই সংখ্যালঘু সমস্যাও রয়েছে। কেবিনেট মিশন উভয় দলের মতপার্থক্য দূর করতে অপারগ হয়।

অবশেষে কেবিনেট মিশন এবং ভাইসরয় শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান কল্পে ১৬ই মে এক বিবৃতি প্রকাশ করে। তাঁদের বিবৃতির কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু ছিল ভারতে একটিমাত্র রাষ্ট্রের সংরক্ষণ। প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক কারণে বৃটিশ সরকার দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

কেবিনেট মিশন ২৪শে মার্চ ১৯৪৬, ভারতে আগমন করে এবং তিন মাসাধিক কাল অবস্থান করতঃ ২৯শে জুন ভারত ত্যাগ করে। বৃটিশ সরকারের ভারতে কেবিনেট মিশন প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একটি শাসনতান্ত্রিক সমাধান পেশ করা। কেবিনেট মিশনের সদস্যগণ এ বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। তবে এ কথা সত্য যে সমস্যা সমাধানে তাঁরা বিশেষ করে সবচেয়ে প্রভাবশালী সদস্য স্টাফোর্ড ক্রিপস কংগ্রেসের অন্তরংগ বন্ধু হওয়ার কারণে সমস্যা সমাধানে কংগ্রেস তথা হিন্দুজাতির স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন, কেবিনেট মিশন ২৩ শে মার্চ ভারতে আসেন। পূর্বে একবার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ ভারতে আগমন করলে জে, সি, গুপ্ত তাঁর আতিথেয়তার ভার গ্রহণ করেন। তিনি আমাকে বলেন যে, তিনি ক্রিপ্‌সের সাথে দেখা করার জন্য দিল্লী যাচ্ছেন। আমি তাঁর হাতে পুনরায় ভারতে আসার জন্যে ক্রিপ্‌সকে মুবারকবাদ জানিয়ে একখানি পত্র পাঠাই। (Abul Kalam Azad : India Wins Freedom, p. 140)

তিনি আরও বলেন, ক্রিপ্‌সের ভারতে অবস্থান কালে বরাবর তাঁর সাথে আমার পত্রের আদান প্রদান চলতে থাকে। (Abul Kalam Azad : India Wins Freedom, p. 172)

ইশতিয়াক হুসেন কোরেশী তাঁর The Struggle for Pakistan গ্রন্থের ২৬৬ পৃষ্ঠার পাদটিকায় উল্লেখ করেছেন—

Sudihir Ghosh, Gandhi's Emissary (Bombay 1967) gives a revealing account of the backdoor secret negotiation between the Cabinet Mission and the Congress leaders. There were no such intimate contacts between the Muslim League and the Cabinet Mission, or for that matter between the League and the British government. The intimacy of the Congress-British Government relations worked against Muslim interests at every critical stage. The British had an eye on the future advantages to be reaped from friendship with the largest and more powerful community and were willing to go very far indeed to meet its desires.

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে বিষয়টি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে বিরোধের মূল কারণ তা হলো পাকিস্তান নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী। এ ছিল উপমহাদেশের মুসলমানদের দাবী যা কংগ্রেস এবং বৃটিশ সরকার মেনে নিতে মোটেই রাজী ছিলনা। কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনার ভেতর দিয়ে কংগ্রেস মুসলিম লীগকে ফাঁদে ফেলে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সকল চেষ্টা করেছে। তাদের ফাঁদে ফেলার এ চক্রান্তটি সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিবিদ কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সম্যক উপলব্ধি করে কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু কংগ্রেসের হঠকারিতার কারণে সকলই ভেস্তে যায়।

তিন মাসাধিককালব্যাপী কেবিনেট মিশনের তৎপরতা, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও ভাইসরয়ের সাথে আলোচনার দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করে সংক্ষেপে বলতে চাই যে, একটি আপোসমূলক সিদ্ধান্তে পৌছার ক্ষেত্রে কংগ্রেস বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। কারণ কংগ্রেসের অভিলাষ ছিল, ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতের উপর একচেটিয়া প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব লাভ করা। ক্ষমতার অংশিদারিত্ব মুসলিম লীগকে দিতে কংগ্রেস কিছুতেই রাজী ছিলনা। এ সময়ে ক্রিপ্সের কাছে লিখিত পত্রে গান্ধী বলেন, যদি তোমাদের সাহস থাকে তাহলে আমি প্রথম থেকেই যা বলে আসছি তাই কর। ··· কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে যে কোন একটি বেছে নাও। (Pyarelal, Mohatma Gandhi : The Last Phase

vol. I, p. 225 Choudhury Muhammad Ali : The Emergence of Pakistan, p. 62)

অবশেষে কেবিনেট মিশন ও ভাইসরয়, একটি শক্তিশালী ও প্রতিনিধিত্বমূলক মধ্যবর্তী সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে বিবৃতি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৬ই মে তাঁদের প্রকাশিত বিবৃতিতে চৌদ্দ জনের নাম ঘোষণা করা হয় যাঁদেরকে ভাইস্‌রয় মধ্যবর্তী কেবিনেটের সদস্য হিসাবে যোগদান করার আমন্ত্রণ জানান। তফ্‌সিলী সম্প্রদায়ের একজনসহ এতে থাকবে কংগ্রেসের ছয়জন, মুসলিম লীগের পাঁচজন, একজন শিখ, একজন ভারতীয় খৃষ্টান এবং একজন পার্শী।

উল্লেখ্য যে ১৬ই মে প্রকাশিত বিবৃতির ৮ অনুচ্ছেদে এ নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল যে, দুটি প্রধান দল অথবা দুয়ের যে কোন একটি যদি উপরোক্ত পদ্ধতিতে একটি কোয়ালিশন সরকারে যোগদান করতে রাজী না হয়, তাহলে ভাইসরয় একটি মধ্যবর্তী সরকার গঠনের জন্যে সামনে অগ্রসর হবেন। ১৬ই মে প্রকাশিত বিবৃতি মেনে নিয়ে সরকারে যোগদান করতে যারা রাজী হবে তাদেরকে নিয়ে এ সরকার যথাসম্ভব প্রতিনিধিত্বশীল হবে।

এরপর সপ্তাহব্যাপী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারী এবং হিন্দু প্রেসের পক্ষ থেকে কেবিনেট মিশন এবং ভাইসরয়ের বিরুদ্ধে প্রচন্ড ঝড় সৃষ্টি করা হয়। গুজব রটনা করা হয় যে, কেবিনেটে মুসলমানদের শূন্য আসনগুলোতে মুসলিম লীগ সদস্যদের নেয়া হবে। কেবিনেটে একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেয়া না হলে গান্ধী দিল্লী ত্যাগ করবেন বলে হুমকি প্রদর্শন করেন, যদিও কংগ্রেস সভাপতি আবুল কালাম আজাদ লিখিতভাবে এ নিশ্চয়তা দান করেন যে, এ নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি কোন জিদ করবেনা। গান্ধী ধমকের স্বরে বলেন, তাহলে গণপরিষদ একটি বিদ্রোহী সংস্থায় পরিণত হবে। ক্রিপ্স দৌড়ে গান্ধীর শরণাপন্ন হলে তিনি (গান্ধী) বলেন, কেবিনেট মিশনকে দু'দলের যে কোন একটিকে বেছে নিতে হবে, সংমিশ্রণের চেষ্টা চলবেনা।

—(Pyarelal, Mohatma Gandhi : The Last Phase vol. I, p. 234-37, Choudhury Muhammad Ali : The Emergence of Pakistan, p. 62-63)

এক সপ্তার মধ্যেই কেবিনেট মিশন গান্ধীর কাছে আত্ম-সমর্পণ করে। ২২শে জুন ক্রিপ্‌সের বন্ধু সুধীর ঘোষ গান্ধীকে বলেন যে তিনি ক্রিপ্‌সের সাথে দেখা করেছেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস যোগদান করতে রাজী না হলে, শুধু মুসলিম লীগের উপর নির্ভর করা যায় না।

সুধীর ঘোষ পুনরায় ক্রিপ্‌সের সাথে দেখা করে গান্ধীকে গিয়ে বলেন, কেবিনেট মিশন এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, কংগ্রেস যদি স্বল্পমেয়াদী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা মেনে নেয় তাহলে মধ্যবর্তী সরকার গঠনের জন্যে এ যাবৎ যা কিছু করা হয়েছে তা সবই নাকচ করে নতুনভাবে চেষ্টা করা হবে। তাঁরা গান্ধী এবং প্যাটেলকে দেখা করতে বলেছেন।

গান্ধী প্যাটেল, (সর্দার বল্লব ভাই প্যাটেল) এবং সুধীর ঘোষকে নিয়ে কেবিনেট মিশনের সাথে দেখা করতে যান। প্যাটেল পূর্বেই প্যাথিক্ লরেন্সের সাথে কথা বলেছেন। প্যাথিক্ লরেন্স্ গান্ধীকে বলেন, আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনি মধ্যবর্তী সরকারের গোটা পরিকল্পনা যা নিয়ে আমরা এ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছি, নাকচ্ করে পরিস্থিতি নতুন করে বিবেচনা করতে চান। বেশ ভালো কথা।

অতঃপর কেবিনেট মিশন ও গান্ধীর মধ্যে যে বুঝাপড়া হয় তা ওয়ার্কিং কমিটিকে অবহিত করা হয়, অতঃপর ২৫শে জুন কংগ্রেস সভাপতি ভাইসরয়ের নিকটে লিখিত পত্রে জানিয়ে দেন যে, কংগ্রেস অন্তরবর্তী সরকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করছে।

কংগ্রেসের এবং গান্ধীর এ ধরনের মানসিকতার পরিচয় ভারত বিভাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পাওয়া গেছে। উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় গান্ধী ও কেবিনেট মিশনের মনের কদর্য চেহারাটা ইতিহাসের পাতায় পরিস্ফুট হয়েছে।

লীগ প্রতিক্রিয়া

ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের যে আশার আলো দেখা গিয়েছিল, তা কেবিনেট মিশন এবং ভাইসরয় কর্তৃক তাঁদের কৃত ওয়াদা ভংগের কারণে নির্বাপিত হয়। এ পরিস্থিতি আলোচনার জন্যে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে বোম্বাইয়ে লীগ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে জিন্নাহ বলেন, মুসলিম

লীগ কেবিনেট মিশনের সাথে আলোচনায় কংগ্রেসকে একটির পর একটি সুবিধা দান করেছে, (made concession after concession)। কারণ আমরা চেয়েছিলাম একটা বন্ধুত্বপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় উপনীত হতে যাতে করে শুধু হিন্দু ও মুসলমানই নয়, বরঞ্চ উপমহাদেশে বসবাসকারী সকল মানুষ স্বাধীনতা লাভের দিকে অগ্রসর হতে পারে। · · · কিন্তু কংগ্রেস তাদের নীচতাপূর্ণ বাকচাতুরি ও দরকষাকষির দ্বারা ভারতবাসীর বিরাট ক্ষতি করেছে। সমগ্র আলাপ আলোচনায় কেবিনেট মিশন কংগ্রেসের সন্ত্রাস ও ভীতির শিকারে পরিণত হয়। · · · এসব কিছু এ কথাই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, ভারতের সকল সমস্যার সমাধান একমাত্র পাকিস্তান।

আমি মনে করি আমরা যুক্তি প্রমাণের কিছু বাকী রাখিনি। এখন এমন কোন ট্রিবিউনাল নেই যার শরণাপন্ন আমরা হতে পারি। এখন মুসলিম জাতিই আমাদের একমাত্র ট্রিবিউনাল।

অতঃপর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ প্রত্যাহার করা হয় এবং ভারত সচিবকে জানিয়ে দেয়া হয়।

একাদশ অধ্যায়

ডাইরেক্ট অ্যাকশন

উক্ত অধিবেশনে এ মর্মে আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, পাকিস্তান হাসিল করার উদ্দেশ্যে এবং বৃটিশের গোলামী এবং বর্ণহিন্দুর ভবিষ্যৎ প্রাধান্য থেকে মুক্তি লাভের জন্যে মুসলিম জাতির পক্ষে ডাইরেক্ট অ্যাকশন অবলম্বন করার সময় এসেছে। মুসলমানদের সংগঠিত করে প্রয়োজনীয় সময়ে সংগ্রাম করার লক্ষ্যে কর্মসূচী প্রণয়নের অনুরোধ জানানো হয়। উপরন্তু বৃটিশের মনোভাব ও আচরণের প্রতিবাদে বিদেশী সরকার প্রদত্ত সকল খেতাব পরিত্যাগ করার জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি আবেদন জানানো হয়।

জিন্নাহ ৩১শে জুলাই আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা নয়। তিনি বলেন, একমাত্র মুসলিম লীগই সংবিধানের আওতায় থেকে সাংবিধানিক পন্থায় কাজ করেছে। কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনাকালে মুসলিম লীগ বৃটিশ সরকারকে কংগ্রেসের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত দেখতে পায়। তাদের ভয় ছিল এই যে, কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে তারা এমন এক সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে যা ১৯৪২ সনের সংগ্রাম অপেক্ষা সহস্র গুণে মারাত্মক হবে। বৃটিশের মেশিন গান আছে এবং ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারে। কংগ্রেস আর এক ধরনের অস্ত্রে সজ্জিত এবং তাকে তুচ্ছ মনে করা যায় না। অতএব আমরা এখন আত্মরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্যে সাংবিধানিক পন্থা পরিহার করতে বাধ্য হচ্ছি। সময়মত সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। (Cabinet Mission and After, Muhammad Ashraf, pp. 311-19; Emergence of Pakistan- Choudhury Mohammad Ali- pp. 69-70)

ডাইরেক্ট অ্যাকশনের জন্যে ১৬ই আগস্ট নির্ধারিত হয়। তার দুদিন পূর্বে জিন্নাহ তাঁর প্রদত্ত বিবৃতিতে বলেন, দিনটি ছিল ভারতের মুসলিম জনসাধারণের কাছে ২৯শে জুলাই মুসলিম লীগ কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করা, কোন প্রকার প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে যাওয়ার জন্যে নয়। অতএব আমি মুসলমানদের প্রতি এ আবেদন জানাই তাঁরা যেন আমাদের নির্দেশ পুরোপুরি মেনে চলেন,

নিজেদেরকে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও সুশৃংখলভাবে পরিচালিত করেন এবং শত্রুর হাতের খেলনায় পরিণত না হন।

আবুল কালাম আজাদের বক্তব্য

আমি জনসাধারণের মধ্যে এ অনুভূতি লক্ষ্য করলাম যে ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগ কংগ্রেসীদের উপর আক্রমণ চালাবে এবং তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করবে। ... ১৬ই আগস্ট ভারতের ইতিহাসে একটি কালো দিবস। .. এ দিনে শত শত মানুষের জীবন হানি হয় এবং কোটি কোটি টাকার ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগের মিছিলগুলি লুণ্ঠন ও অগ্নি সংযোগ শুরু করে। (Abul Kalam Azad : India Wins Freedom, p. 168-169)

মাওলানা আজাদের প্রতি আমার আন্তরিক ও গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও বলবো তিনি হিন্দু কংগ্রেসের মনের কথাই বলেছেন। সেদিন তিনি দিল্লী ছিলেন। অতএব ঘটনা স্বচক্ষে না দেখে অপরের কথা শুনেই উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন।

তিনি তাঁর উক্ত গ্রন্থে বলেন, মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন দিবসটি ভিন্ন ধরনের বলে মনে হচ্ছিল। কোলকাতায় এ সাধারণ মনোভাব লক্ষ্য করলাম যে, ১৬ই আগস্টে মুসলিম লীগ কংগ্রেসপন্থীদের উপর আক্রমণ চালাবে এবং তাঁদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করবে। বাংলার সরকার কর্তৃক ১৬ই আগস্ট সরকারী ছুটি ঘোষণার ফলে অধিক মাত্রায় আতংক ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার আইন পরিষদের কংগ্রেস দল এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদে কোন ফল না হওয়ায় তাঁরা সংসদ ভবন থেকে ওয়াক আউট করেন। কোলকাতার জনমনে ভয়ানক উদ্বেগ বিরাজ করছিল এবং সে উদ্বেগ এ কারণে বেড়ে চলেছিল যে মুসলিম লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। (India Wins Freedom by Abul Kalam Azad pp. 168-169)

মাওলানা আবুল কালাম আজাদের উপরোক্ত বক্তব্যে কোলকাতার লোমহর্ষক সাম্প্রদায়িক হানাহানির প্রকৃত কারণ চিহ্নিত হয়েছে। কারণগুলো হচ্ছে—

১. বাংলায় মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত যা হিন্দুদের জন্য ছিল অসহনীয়।

২. প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যাঁকে হিন্দুগণ মনে করতো হিন্দুবিদ্বেষী।

৩. ১৬ই আগস্টের ক'দিন পূর্ব থেকেই এ মিথ্যা গুজব ছড়ালো যে মুসলিম লীগ তথা কোলকাতার মুসলমানগণ হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালাবে এবং তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করবে। এ গুজব ছড়ানোর এ উদ্দেশ্য ছিল যেন হিন্দুগণ কোলকাতার শতকরা প্রায় পঁচিশ ভাগ মুসলমান নির্মূল করার জন্য তৈরী হয়।

আমি (অত্র গ্রন্থকার) সে সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত থাকলেও পাকিস্তান আন্দোলন মনে প্রাণে সমর্থন করতাম। মুসলিম লীগ মহলের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করে চলতাম। ১৬ই আগস্ট মুসলমানদের পক্ষ থেকে হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালানো হবে এরূপ কোন পরিকল্পনার বিন্দু বিসর্গও কানে আসেনি। আমি তখন ফ্যামিলিসহ কোলকাতায় থাকতাম, বাসায় আমার সাথে আমার স্ত্রী ও চার বছরের কন্যা মাত্র। গোলযোগের কোন আশংকা থাকলে তাদেরকে একাকী ফেলে ১৬ই আগস্টে মুসলিম লীগের জনসভায় নিশ্চিন্ত মনে কিছুতেই যেতে পারতাম না।

গড়ের মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় আমার মত আরো অনেকেই যোগদান করেন। আমরা জনসভায় উপস্থিত হয়ে দেখলাম রাজা গজনফর আলী খান ইংরেজিতে বক্তৃতা করছেন।

মুসলিম লীগ কর্মীদের হাতে কোন অস্ত্র ত দূরের কথা, কোন লাঠি–সোটাও দেখতে পাইনি। তবে পাকিস্তান লাভের আশায় সকলকে হর্ষোৎফুল্ল ও উজ্জীবিত দেখতে পেয়েছিলাম।

রাজা সাহেবের পর সোহরাওয়ার্দী সাহেব মঞ্চে ওঠার পর মুসলিম লীগ মিছিলের এবং জনসভায় আগমনকারীদের উপর হিন্দুদের সশস্ত্র আক্রমণের সংবাদ আসতে থাকলো। অতঃপর আক্রান্ত মুসলমানদের অনেকেই রক্তমাখা জামাকাপড় নিয়ে সভায় হাজির হয়ে হিন্দুদের সশস্ত্র হামলার বিবরণ দিতে লাগলো। শ্রোতাদের হর্ষ বিষাদে পরিণত হলো। ভয়ানক উত্তেজনা, ভীতি ও আশংকা বাড়তে থাকলো। কোলকাতায় শতকরা বিশ থেকে পঁচিশ ভাগ মুসলমান। প্রায় সকলেই দরিদ্র। তাদের শতকরা প্রায় পাঁচ ভাগ বহিরাগত, বিভিন্ন স্থানে চাকরি করে।

জনসভায় যোগদানকারীগণ কিভাবে নিরাপদে বাড়ি ফিরে যাবে, তাদের অরক্ষিত পরিবারের অবস্থাই বা কি—এমন এক আশংকা সকলের চোখে মুখে

দৃশ্যমান হয়ে উঠলো। প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পারলেন। তাঁর বক্তৃতার কোন কথাই আমার মনে নেই। তবে জনতাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে 'হাম্ সব দেখ্ লেংগে'—বলে সকলকে শৃংখলার সাথে ঘরে ফিরে যেতে বল্লেন। আমরা কোন রকমে 'আল্লাহ আল্লাহ' করে বাসায় ফিরলাম। কোলকাতার মুসলিম পল্লী পার্কসার্কাসে থাকতাম বলে বেঁচে গিয়েছি, নতুবা হিন্দুদের আক্রমণের শিকার অবশ্যই হতে হতো।

এ লোমহর্ষক ঘটনা সম্পর্কে তৎকালীন কোলকাতার দৈনিক ষ্টেটস্‌ম্যান (Statesman) পত্রিকার সম্পাদক— Ian Stephens বলেন—'সম্ভবতঃ প্রথম দিনের মারামারিতে এবং নিশ্চিতরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে—মুসলমানদের জানমালের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়।

(Ian Stephens, Pakistan, London, Ernest Bena, 1963, p. 106; Choudhury Mohammad Ali : The Emergence of Pakistan, p. 76)

এসব ঘটনার দ্বারা এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ১৬ই আগস্ট হিন্দুদের উপর আক্রমণ করার কোন পরিকল্পনা মুসলিম লীগের ছিলনা। বরঞ্চ লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশনকে নিজেদের হীন স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য কংগ্রেস মুসলিম নিধনের নিখুঁত পরিকল্পনা তৈরী করে। তবে এর সুফল হয়েছে মুসলমানদের জন্যে। পাকিস্তান সৃষ্টি ত্বরান্বিত হয়েছে—যার সম্ভাবনা কিছুটা ক্ষীণ হয়েছিল কেবিনেট মিশনের প্রস্তাবের পর। জিন্নাহ খোলাখুলি ও অকপটে কোলকাতার নৃশংস ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন এবং নিহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশনের পর

কোলকাতার সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এক বিতর্কিত আলোচনার বিষয় হয়ে পড়ে। উপমহাদেশে মাঝে মধ্যে এখানে সেখানে হিন্দু মুসলমানে দাংগাহাংগামা হয়েই থাকে। কিন্তু ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্টে অনুষ্ঠিত নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা ছিল তুলনাবিহীন। কোলকাতার মুসলমানদের নির্মূল করার এক সুচিন্তিত পরিকল্পনার অধীনে এ হত্যাকান্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ভাইস্‌রয় ২৪শে আগস্ট মধ্যবর্তী সরকারের সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন।

তাদেরকে দুসরা সেপ্টেম্বর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ভাইসরয় ৬ই আগষ্ট নেহরুকে মধ্যবর্তী সরকার গঠনের আহবান জানান। ৭ই আগষ্ট কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সরকার গঠনে সম্মতি দান করে। ১৭ই আগষ্ট নেহরু ভাইসরয়কে বলেন যে তিনি মুসলিম আসনগুলো লীগ বহির্ভূত লোকদের দ্বারা পূরণ করে একটি শক্তিশালী সরকার গঠন করতে চান। ভাইস্‌রয় এতে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন যে আপাততঃ কিছু সময়ের জন্যে মুসলিম আসনগুলো উন্মুক্ত রাখা হোক। নেহরু এ প্রস্তাবে রাজী না হয়ে তার নিজের প্রস্তাবে অবিচল থাকেন।

একথাটি পরে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে কংগ্রেসী মধ্যবর্তী সরকারের শপথ গ্রহণের প্রাক্কালে ভাইসরয় ব্রিটিশ সরকারকে বলেন যে, মুসলিম লীগ সরকারে যোগদান করতে রাজী না হওয়া পর্যন্ত শপথ অনুষ্ঠান মুলতবী রাখা হোক। প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী ভাইসরয়ের যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, এখন যে কোন বিলম্বকরণ প্রক্রিয়া কংগ্রেস নেতাদের মেজাজ তিক্ততর করবে এবং কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করবে। অতঃপর দিল্লী থেকে জারীকৃত এক সরকারী ইশ্‌তাহারে বলা হয় যে, নতুন কাউন্সিল দুসরা সেপ্টেম্বর কার্যভার গ্রহণ করবে।

নতুন কাউন্সিলে (The New Executive Council) যোগদানকারী সদস্যগণ ছিলেন ঃ নেহরু, প্যাটেল, রাজা গোপালাচারিয়া, রাজেন্দ্র প্রসাদ, আসফ আলী, শরৎচন্দ্র বোস, জন ম্যাথাই, বলদেব সিং, স্যার শাফায়াত আহমদ খান, জগজীবন রাম, আলী জহির এবং সি এইচ ভবা। দুজন মুসলমান পরে নেয়া হবে। (The Indian Register, 1946, vol. II, P, 228, Ishtiaq Husain Qureshi : The Struggle for Pakistan, pp. 274-275)।

মেজাজ প্রকৃতির পরিপন্থী কাজ সমাধা করার পর ভাইসরয় সাম্প্রদায়িক দাংগায় বিধ্বস্ত কোলকাতা পরিদর্শন করেন। কোলকাতা ভ্রমণের পর তিনি নিশ্চিত হন যে, কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে কোন সমঝোতা না হলে সমগ্র ভারত ভয়ংকর গৃহযুদ্ধের শিকার হয়ে পড়বে। কোলকাতা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কংগ্রেস নেতাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করেন এবং এ উদ্দেশ্যে ২৭শে আগষ্ট গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বাংলায় এবং কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব দেন এবং একটা ফর্মূলা পেশ করেন। ২৮শে আগষ্ট

নেহরু ভাইসরয়কে জানিয়ে দেন যে ওয়ার্কিং কমিটি ফর্মূলাটি প্রত্যাখ্যান করেছে।

ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল একটি মীমাংসায় পৌঁছার আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তার এ প্রচেষ্টা কংগ্রেস ভিন্নভাবে গ্রহণ করে। উপমহাদেশের উপর কংগ্রেসের একচেটিয়া প্রভুত্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে ওয়াভেলকে তার প্রতিবন্ধক মনে করেন এবং তার শাস্তি বিধানের জন্য উঠে পড়ে লাগেন। ওয়াভেলের সাথে আলাপ আলোচনার পর ফিরে এসে গান্ধী এবং নেহরু উভয়ে পত্র লিখতে বসে যান। গান্ধী প্রথমে এট্‌লীর নিকটে এ মর্মে তারবার্তা প্রেরণ করেন যে, ভাইসরয়ের মনের অবস্থা এমন যে শিগ্‌গির প্রতিকার হওয়া দরকার। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে কোলকাতার ঘটনায় তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। গান্ধী তাঁর স্থলে একজন যোগ্যতর ব্যক্তির দাবী জানান। গান্ধী ওয়াভেলকেও পত্রের দ্বারা শাসিয়ে দেন যে তিনি ভীতি প্রদর্শন করে কংগ্রেসকে তার স্বমতে আনতে চান। তিনি আরও বলেন যে ভাইসরয় যদি সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবনতিতে ভীত হয়ে পড়েন এবং তা দমন করার জন্যে শক্তি প্রয়োগ করতে চান, তাহলে বৃটিশের শিগগির ভারত ত্যাগ করা উচিত এবং ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কংগ্রেসের উপর অর্পণ করা উচিত।

অপরদিকে নেহরু বৃটেনে তার কতিপয় প্রভাবশালী বন্ধুকে পত্র দ্বারা জানিয়ে দেন যে, ভাইসরয় অত্যন্ত দুর্বল লোক এবং মানসিক নমনীয়তা হারিয়ে ফেলেছেন। জিন্নাহকে খুশী করার জন্যে তিনি ভারতকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। তিনি বলেন যে, ভাইসরয় স্যার ফ্রান্সিস্ মুডি এবং জর্জ এবেল এর পরামর্শ অনুযায়ী চলছেন এবং নেহরুর মতে এ দুজন হচ্ছেন প্রকট মুসলিম মনা (Rabidly pro-Muslim)। নেহরু তাদেরকে ইংলিশ মোল্লা বলেও অভিহিত করেন। মোট কথা নেহরুর পত্রাদির মর্ম হচ্ছে— 'ওয়াভেলকে যেতেই হবে'।

—(Leonard Mosley- op. cit- pp. 44 - Gandhi's letter to Wavel reproduced in full in Pyarelal's Mahatma Gandhi : The last Phase (Ahmedabad-1956); I. H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, p. 276)।

তাদেরকে দুসরা সেপ্টেম্বর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ভাইসরয় ৬ই আগস্ট নেহরুকে মধ্যবর্তী সরকার গঠনের আহবান জানান। ৭ই আগস্ট কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সরকার গঠনে সম্মতি দান করে। ১৭ই আগস্ট নেহরু ভাইসরয়কে বলেন যে তিনি মুসলিম আসনগুলো লীগ বহির্ভূত লোকদের দ্বারা পূরণ করে একটি শক্তিশালী সরকার গঠন করতে চান। ভাইস্‌রয় এতে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন যে আপাততঃ কিছু সময়ের জন্যে মুসলিম আসনগুলো উন্মুক্ত রাখা হোক। নেহরু এ প্রস্তাবে রাজী না হয়ে তার নিজের প্রস্তাবে অবিচল থাকেন।

একথাটি পরে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে কংগ্রেসী মধ্যবর্তী সরকারের শপথ গ্রহণের প্রাক্কালে ভাইসরয় ব্রিটিশ সরকারকে বলেন যে, মুসলিম লীগ সরকারে যোগদান করতে রাজী না হওয়া পর্যন্ত শপথ অনুষ্ঠান মুলতবী রাখা হোক। প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী ভাইসরয়ের যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, এখন যে কোন বিলম্বকরণ প্রক্রিয়া কংগ্রেস নেতাদের মেজাজ তিক্ততর করবে এবং কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করবে। অতঃপর দিল্লী থেকে জারীকৃত এক সরকারী ইশ্‌তাহারে বলা হয় যে, নতুন কাউন্সিল দুসরা সেপ্টেম্বর কার্যভার গ্রহণ করবে।

নতুন কাউন্সিলে (The New Executive Council) যোগদানকারী সদস্যগণ ছিলেন ঃ নেহরু, প্যাটেল, রাজা গোপালাচারিয়া, রাজেন্দ্র প্রসাদ, আসফ আলী, শরৎচন্দ্র বোস, জন ম্যাথাই, বলদেব সিং, স্যার শাফায়াত আহমদ খান, জগজীবন রাম, আলী জহির এবং সি এইচ ভবা। দুজন মুসলমান পরে নেয়া হবে। (The Indian Register, 1946, vol. II, P. 228, Ishtiaq Husain Qureshi : The Struggle for Pakistan, pp. 274-275)।

মেজাজ প্রকৃতির পরিপন্থী কাজ সমাধা করার পর ভাইসরয় সাম্প্রদায়িক দাংগায় বিধ্বস্ত কোলকাতা পরিদর্শন করেন। কোলকাতা ভ্রমণের পর তিনি নিশ্চিত হন যে, কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে কোন সমঝোতা না হলে সমগ্র ভারত ভয়ংকর গৃহযুদ্ধের শিকার হয়ে পড়বে। কোলকাতা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কংগ্রেস নেতাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করেন এবং এ উদ্দেশ্যে ২৭শে আগস্ট গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বাংলায় এবং কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব দেন এবং একটা ফর্মূলা পেশ করেন। ২৮শে আগস্ট

নেহরু ভাইসরয়কে জানিয়ে দেন যে ওয়ার্কিং কমিটি ফর্মূলাটি প্রত্যাখ্যান করেছে।

ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল একটি মীমাংসায় পৌছার আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তার এ প্রচেষ্টা কংগ্রেস ভিন্নভাবে গ্রহণ করে। উপমহাদেশের উপর কংগ্রেসের একচেটিয়া প্রভুত্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে ওয়াভেলকে তার প্রতিবন্ধক মনে করেন এবং তার শাস্তি বিধানের জন্য উঠে পড়ে লাগেন। ওয়াভেলের সাথে আলাপ আলোচনার পর ফিরে এসে গান্ধী এবং নেহরু উভয়ে পত্র লিখতে বসে যান। গান্ধী প্রথমে এট্‌লীর নিকটে এ মর্মে তারবার্তা প্রেরণ করেন যে, ভাইসরয়ের মনের অবস্থা এমন যে শিগ্‌গির প্রতিকার হওয়া দরকার। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে কোলকাতার ঘটনায় তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। গান্ধী তাঁর স্থলে একজন যোগ্যতর ব্যক্তির দাবী জানান। গান্ধী ওয়াভেলকেও পত্রের দ্বারা শাসিয়ে দেন যে তিনি ভীতি প্রদর্শন করে কংগ্রেসকে তার স্বমতে আনতে চান। তিনি আরও বলেন যে ভাইসরয় যদি সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবনতিতে ভীত হয়ে পড়েন এবং তা দমন করার জন্যে শক্তি প্রয়োগ করতে চান, তাহলে বৃটিশের শিগগির ভারত ত্যাগ করা উচিত এবং ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কংগ্রেসের উপর অর্পণ করা উচিত।

অপরদিকে নেহরু বৃটেনে তার কতিপয় প্রভাবশালী বন্ধুকে পত্র দ্বারা জানিয়ে দেন যে, ভাইসরয় অত্যন্ত দুর্বল লোক এবং মানসিক নমনীয়তা হারিয়ে ফেলেছেন। জিন্নাহকে খুশী করার জন্যে তিনি ভারতকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। তিনি বলেন যে, ভাইসরয় স্যার ফ্রান্সিস্ মুডি এবং জর্জ এবেল এর পরামর্শ অনুযায়ী চলছেন এবং নেহরুর মতে এ দুজন হচ্ছেন প্রকট মুসলিম মনা (Rabidly pro-Muslim)। নেহরু তাদেরকে ইংলিশ মোল্লা বলেও অভিহিত করেন। মোট কথা নেহরুর পত্রাদির মর্ম হচ্ছে— 'ওয়াভেলকে যেতেই হবে'।

—(Leonard Mosley- op. cit- pp. 44 - Gandhi's letter to Wavel reproduced in full in Pyarelal's Mahatma Gandhi : The last Phase (Ahmedabad-1956); I. H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, p. 276)।

দ্বাদশ অধ্যায়

একজেকিউটিভ্ কাউন্সিলে লীগের যোগদান

অন্তর্বর্তী সরকার নির্দিষ্ট সময়ে, অর্থাৎ দুসরা সেপ্টেম্বর ১৯৪৬, কার্যভার গ্রহণ করেন। কংগ্রেস খুবই উল্লসিত। পট্টভি সিতারামিয়া ঘোষণা করেন, ক'বছরের মধ্যেই ভারতে একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। মুসলিম লীগ আসুক না আসুক—তাতে কিছু যায় আসে না। কাফেলা চলতেই থাকবে। এখন আমাদেরকে এ ভূখণ্ডের শাসক মনে করতে হবে। (I. H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, p. 277)

ভারতে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম ভারত এবং বৃটেনের বিভিন্ন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন। জিন্নাহ ২৫শে আগষ্ট অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এক বিবৃতি দান করেন। তিনি ভাইসরয়ের সিদ্ধান্তে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, মুসলিম লীগকে যে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছিল এবং যে সব প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, তার সিদ্ধান্ত সে সবের সাথে অসামঞ্জস্যশীল। নতুন সরকার যে দিন কার্যভার গ্রহণ করেন সেদিন মুসলমানগণ সমগ্র ভারতে তাদের গৃহে ও দোকানে কালো পতাকা উড্ডীন করেন।

বৃটেনে স্যার উইন্স্টোন চার্চিল সরকারী সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা গৃহযুদ্ধ ব্যতীত সফল হবেনা। হিন্দুদের সুযোগ সুবিধা দেয়ার জন্য ক্রিপ্স্ অন্যায়ভাবে তার প্রভাব কাজে লাগিয়েছেন। পরে তিনি বলেন, বর্ণহিন্দু মিঃ নেহরুর উপর ভারত সরকারের দায়িত্ব অর্পণ মৌলিক ভুল হয়েছে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অন্যতম প্রণেতা লর্ড টেম্পল্ উড্ একটি মাত্র সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় সরকার গঠনের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। লর্ড স্কার বরো ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে একটি দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে ভারত থেকে বৃটিশ সরকারের উপর ভয়ানক চাপ সৃষ্টি করা হবে এবং তিনি আশা করেন যে তা প্রতিহত করা হবে। লর্ড ক্রাস্বর্ণ জুন মাসে মুসলমানদের সাথে কৃত ওয়াদা ভংগ করে আগস্টে কংগ্রেসকে সরকার গঠনের অনুমতি দেয়ায় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। এভাবে বৃটেনের বিভিন্ন মহল থেকে

তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়। (I. H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, pp. 277-278)

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর এক মাস অতিক্রান্ত হতে না হতে মুসলিম লীগ উপলব্ধি করে যে, সরকারের বাইরে অবস্থান মুসলিম স্বার্থের চরম পরিপন্থী। নীতিগতভাবে মুসলিম লীগ সরকারে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এ নীতি বলবৎ থাকবে। তবে রাজনৈতিক প্রয়োজন এবং সেইসাথে দেশে শত্রুভাবাপন্ন একটি হিন্দু সরকার প্রতিষ্ঠা লীগকে তার নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করে। যতোদিন মুসলিম লীগ বাইরে থাকবে, ততোদিন মুসলমানগণ দুর্গতি ভোগ করতে থাকবে। আইন শৃংখলার অবনতি ঘটছে এবং বহু অঞ্চল থেকে মুসলমানদের নির্মূল হওয়ার আশংকা রয়েছে। কংগ্রেসের কোন মাথা ব্যথা নেই। হিন্দু সরকার ক্ষমতায় থাকার কারণে দুষ্কৃতিকারিগণ উৎসাহিত বলে মনে হচ্ছে। অতএব এমতাবস্থায় মুসলিম ভারত রক্ষার উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগকে অবশ্যই সরকারে যোগদান করতে হবে। জিন্নাহর মতে কোয়ালিশন সরকারের বাইরে থাকার চেয়ে ভেতরে থেকে ভালোভাবে তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালাতে পারবেন।

কোয়ালিশন সরকারে মুসলিম লীগকে পাওয়ার জন্যে ভাইসরয় স্বয়ং বড়ো আগ্রহান্বিত ছিলেন। কারণ তিনি ভবিষ্যৎ সংকট সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এ কারণে দীর্ঘ জটিল আলাপ আলোচনা চলতে থাকে একদিকে জিন্নাহ ও নেহরুর মধ্যে এবং অপরদিকে জিন্নাহ ও ভাইসরয়ের মধ্যে। অবশেষে ২৫শে অক্টোবর ১৯৪৬, একজেকিউটিভ্ কাউন্সিল নিম্নরূপে পুনর্গঠিত হয় :—

কংগ্রেস

জওহরলাল নেহরু – (External Affairs and Commonwealth Relations)
বল্লভ ভাই প্যাটেল – (Home, Information & Broadcasting)
মি. রাজা গোপালাচারিয়া – (Education & Arts)
আসফ আলী – (Transport & Railway)
জগজীবন রাম – (Labour)

মুসলিম লীগ

লিয়াকত আলী খান – (Finance)
আই আই চুন্দ্রিগড় – (Commerce)
আবদুর রব নিশতার – (Communications)
গজনফর আলী খান – (Health)
যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল – (Legislative)

সংখ্যালঘু

জন্ ম্যাথাই – (Industries & Supplies)
সি এইচ ভবা – (Works, Mines & Power)
বলদেব সিং – (Defence)

নেহরু কোয়ালিশন সরকারে মুসলিম লীগের যোগদান ভালো চোখে দেখেননি। তদুপরি দপ্তর বন্টনেও তিনি চরম একগুঁয়েমির পরিচয় দেন। ভাইসরয় চাচ্ছিলেন তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর যথা External Affairs, Home and Defence –এর যে কোন একটি মুসলিম লীগকে দেয়া হোক। নেহরু এর চরম বিরোধিতা করেন। অবশেষে যে পাচটি দপ্তর মুসলিম লীগকে দেয়া হয় তার মধ্যে অর্থ(Finance) একটি। কংগ্রেস অর্থ বিভাগের দপ্তরটি মুসলিম লীগকে দিতে এ জন্যে রাজী হয়েছিল যে, তাদের বিশ্বাস ছিল এ দপ্তর চালাতে মুসলিম লীগ অপারগ হবে— বরঞ্চ চালাতে গিয়ে বোকা সাজবে। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেসের এ সিদ্ধান্তে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, তার সহকর্মীদের এ এক ভুল সিদ্ধান্ত হয়েছে।

আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'India Wins Freedom' গ্রন্থে এ বিষয়ে যে উপভোগ্য আলোচনা করেছেন তা উপভোগ করার জন্য পাঠকবৃন্দের জন্য পরিবেশন করছি।

মাওলানা আজাদ বলেন ঃ

যেহেতু লীগ সরকারে যোগদান করতে সম্মত হয়েছে, কংগ্রেসকে সরকার পুনর্গঠিত করতে হবে এবং এতে মুসলিম লীগ প্রতিনিধিদের স্থান করে দিতে হবে। এখন প্রশ্ন কে কে সরকার থেকে সরে দাঁড়াবেন। মনে করা হলো যে,

শরৎ চন্দ্র বসু, স্যার শাফায়াত আহমদ খান এবং সৈয়দ আলী জহির লীগ নমিনীদের স্থান করে দেয়ার জন্যে ইস্তাফা দেবেন। ভাইসরয়ের প্রস্তাব ছিল যে স্বরাষ্ট্র বিভাগ মুসলিম লীগকে দেয়া হোক। সর্দার প্যাটেল এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। আমার ধারণা মতে আইন শৃংখলা অবশ্যম্ভাবী রূপে একটি প্রাদেশিক বিষয়। কেবিনেট মিশন পরিকল্পনার যে চিত্রটি সামনে রয়েছে তাতে এ ব্যাপারে কেন্দ্রের সামান্য কিছুই করার আছে। অতএব নতুন সরকার কাঠামোতে কেন্দ্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তেমন কোন গুরুত্ব নেই। এ কারণে আমি লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের পক্ষেই ছিলাম। কিন্তু প্যাটেল একেবারে নাছোড়বান্দা। তিনি বল্লেন, আমি বরঞ্চ সরকার থেকে বেরিয়ে যাব কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছাড়বনা।

আমরা তখন বিকল্প চিন্তা করলাম। রফি আহমদ কিদওয়াই প্রস্তাব করেন যে অর্থ মন্ত্রণালয় মুসলিম লীগকে দেয়া হোক। তিনি আরও বলেন, এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। কিন্তু এ একটি উচ্চমানের টেক্‌নিকাল বিষয় এবং মুসলিম লীগের মধ্যে এমন কেউ নেই যে এ বিভাগ ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারবে। কিদওয়াইয়ের ধারণা মুসলিম লীগ এ দপ্তর গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে। এতে কংগ্রেসের কোন ক্ষতি নেই। আর এ দপ্তর গ্রহণ করলে পরে তারা বোকাপ্রমাণিত হবে।

প্যাটেল লাফ মেরে প্রস্তাবটির প্রতি তার অতি জোরালো সমর্থন জানান (Patel jumped at the proposal and gave it his strongest support)। আমি এ কথা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম যে অর্থ মন্ত্রণালয় হলো একটি সরকারের চাবিকাঠি এবং এ মুসলিম লীগের নিয়ন্ত্রণে থাকলে আমাদেরকে বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। প্যাটেল আমার বিরুদ্ধাচারণ করে বল্লেন যে, লীগ এ বিভাগ চালাতে পারবেনা এবং এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হবে। আমি এ সিদ্ধান্তে খুশী হতে পারিনি। তবে সকলে যখন একমত, আমাকে তা মেনে নিতে হলো।

লর্ড ওয়াভেল জিন্নাহকে প্রস্তাবটি সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি পরের দিন জবাব দেবেন বলেন।

জিন্নাহরও সংশয় ছিল যে কেবিনেটে লীগের প্রধান প্রতিনিধি লিয়াকত আলী এ বিভাগটি চালাতে পারবেন কিনা। অর্থ বিভাগের কতিপয় মুসলমান অফিসার

এ বিষয়টি জানার পর জিন্নাহর সাথে দেখা করেন। তারা বলেন যে, কংগ্রেসের এ প্রস্তাব অচিন্তনীয় পাকা ফলের মতো এবং এতে লীগের বিরাট বিজয় সূচিত হয়েছে।.....অর্থ বিভাগ নিয়ন্ত্রণের ফলে সরকারের প্রতিটি বিভাগে লীগের কর্তৃত্ব চলবে। তারা জিন্নাহকে এ নিশ্চয়তা দান করেন যে তার ভয়ের কোন কারণ নেই। লিয়াকত আলীকে সর্বপ্রকারে সাহায্য সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি তারা দেন যাতে যথাযথভাবে তিনি তার দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

কংগ্রেস শীঘ্রই উপলব্ধি করেছিল যে অর্থ বিভাগ লীগকে দিয়ে বিরাট ভুল করা হয়েছে– (Abul Kalam Azad: India Wins Freedom, pp. 177-179)।

এ প্রসঙ্গে চৌধুরী মুহাম্মদ আলী বলেন ঃ

জুন মাসে যখন সর্বপ্রথম একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তখন কায়েদে আজম লীগের সম্ভাব্য দপ্তরগুলো সম্পর্কে আমার সাথে আলোচনা করেন। তিনি স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা (Home & Defence) বিভাগ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি বল্লাম, আইন শৃংখলা ও পুলিশ প্রাদেশিক বিষয় যার উপর কেন্দ্রের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কংগ্রেস প্রদেশগুলো লীগ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কোন পরোয়াই করবেনা। অনুরূপ মুসলিম লীগ প্রাদেশিক সরকারগুলো তার উপদেশ গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করবেনা। আমি বল্লাম যে প্রতিরক্ষা দপ্তর অবশ্যই লাভজনক। কিন্তু যদি লীগ প্রতিটি বিভাগে সরকারের নীতি–পলিসি প্রভাবিত করতে চায়, তাহলে তার অর্থ বিভাগ নেয়া দরকার। আমি তখন তাকে অর্থ বিভাগের কৌশলগত গুরুত্ব বুঝাতে পারিনি। কিন্তু এখন ঘটনাচক্রে অর্থদপ্তর লীগের ঘাড়ে এসে পড়েছে। আমাকে যখন পুনরায় ডেকে পাঠানো হয় তখন অত্যন্ত জোরালোভাবে আমার পূর্ব পরামর্শের পুনরাবৃত্তি করি। লীগের প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে লিয়াকত আলীর উপর অর্থ বিভাগ অর্পিত হওয়ায় তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। আমি সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতার প্রস্তাব দিলাম এবং কায়েদে আজম ও লিয়াকত আলী খান উভয়কেই সাফল্যজনক পরিণামের নিশ্চয়তা দান করলাম। আমার প্রস্তাব গৃহীত হলো এবং লিয়াকত আলী অর্থমন্ত্রী হলেন। (Chowdhury Mohammad Ali : The Emergence of Pakistan, p. 84)।

কোয়ালিশন সরকার গঠনের পর

লীগের প্রতি কংগ্রেসের পূর্ণ অনাস্থা ও বৈরাচরণের কারণে কংগ্রেস চাইছিল নেহরুকে গোটা কেবিনেটের নেতা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে। লীগ তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে লিয়াকত আলী খান স্পষ্টভাষায় বলেন, নেহরু কেবিনেটে কংগ্রেস দলের নেতা ব্যতীত আর কারো নেতা নন। সাংবিধানিক অর্থে সম্মিলিত দায়িত্ব অস্বীকার করলেও তিনি বলেন, লীগ মন্ত্রীগণ তাদের সহকর্মীদের সাথে মিলেমিশে কাজ করবেন শুধু মুসলমানদের স্বার্থেই নয়, বরঞ্চ ভারতের সকল অধিবাসীদের স্বার্থে।

সাম্প্রদায়িক হানাহানি বেড়েই চলছিল বিধায় ঐক্য ও সহযোগিতার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে পূর্ব বাংলার নোয়াখালী ও কুমিল্লা জেলায় গোলযোগ শুরু হয় এবং মাস শেষ হবার পূর্বেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ সরেজমিনে তদন্তের পর এ মন্তব্য করেন যে সেখানে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলিম জনসাধারণের কোন আক্রমণাত্মক অভিযান ছিলনা। গুন্ডাপ্রকৃতির লোকদের দ্বারা এ গোলযোগ সৃষ্টি করা হয়েছিল। লেফটেন্যান্ট জেনারেল স্যার ফ্রান্সিস টুকার, জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং ইন্ চীফ্ কম্যান্ড, নিহতের সংখ্যা তিনশতের কম বলেন। কিন্তু বিকারগ্রস্ত হিন্দুপ্রেস ইচ্ছাকৃতভাবে ভয়াবহ ও লোমহর্ষক কল্পকাহিনী রচনা করে তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়। এসব প্রচারণা বিহার ও ইউপি–র হিন্দুদের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের উদগ্র লালসা সৃষ্টি করে। [E. W. R. Lumby : The Transfer of Power in India—1945-47 (London George Allen and Unwin, 1954), p. 120; Sir Francis Tuker; While Memory Serves (London-Casell, 1950) p. 176; Choudhury Mohammad Ali : The Emergence of Pakistan, p. 85]।

নবেম্বরের পয়লা হপ্তায় পরিকল্পিত উপায়ে বিহারে মুসলিম নিধনযজ্ঞ শুরু হয়। ছ'চল্লিশের সকল ভয়ংকর দাংগার মধ্যে বিহারের হত্যাযজ্ঞ ছিল সর্বাপেক্ষা লোমহর্ষক ও বেদনাদায়ক। এর সবচেয়ে কাপুরুষোচিত দিক হচ্ছে এই যে হিন্দু জনতা পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রস্তুতিসহ হঠাৎ মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এসব মুসলমান ও তাদের পূর্বপুরুষ শান্তিপূর্ণভাবে তাদের হিন্দু প্রতিবেশীর সাথে বসবাস করে আসছিল। এ দাংগায় নিহত নারী, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা ছিল

সাত আট হাজার। (Sir Francis Tuker : While Memory Serves, pp. 181-82; Choudhury Mohammad Ali : Emergencey of Pakistan, p. 86)।

ভাইসরয় এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীবর্গ হিন্দু ও মুসলিম উপদ্রুত অঞ্চল সফর করেন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তির জন্য আবেদন জানান। বিহারের ঘটনা জানা সত্ত্বেও গান্ধী নোয়াখালীর পথে তখন কোলকাতায় অবস্থান করছিলেন। কংগ্রেসী মুসলমানগণ গান্ধীকে বার বার অনুরোধ করেন বিহার গিয়ে রক্তপিপাসু হিন্দুদের নিবৃত্ত করার জন্যে। এতদ্‌সত্ত্বেও গান্ধী বিহারমুখী না হয়ে নোয়াখালী গমন করে চার মাস অবস্থান করেন।

অবশেষে সাতচল্লিশের মার্চ মাসে বিহারে যাওয়ার জন্য গান্ধীকে রাজী করা হয়। এবার গান্ধীর চোখ খুলে যায়। প্রদেশের মন্ত্রীসভা ছলচাতুরী করে সবকিছু এড়িয়ে চলেন এবং তাদেরকে মোটেই অনুতপ্ত দেখা যায় না। জেনারেল টুকার বলেন, আমাদের অফিসারদের কাছে যেটা সবচেয়ে বিস্ময়কর মনে হয়েছে তা এই যে, হিন্দু মন্ত্রীগণ নৃশংস হত্যাকান্ডকে কি করে শান্তভাবে গ্রহণ করলেন। তারা বলেন যে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু গান্ধী যখন বলেন যে, এখন পর্যন্ত কোন তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়নি, তখন প্রধানমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিনহা ভয় প্রকাশ করে বলেন যে এর থেকে লীগ রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করবে।

বিহার হত্যাযজ্ঞের সাক্ষ্যপ্রমাণ এতো মজবুত যে কারো পক্ষে বিভ্রান্তি সৃষ্টি সম্ভব নয়। পিয়ারীলাল তার 'মহাত্মা গান্ধী দি লাস্ট ফেজ'—গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন– The veil lifted. এতে তিনি বলেন যে, ছেচল্লিশের বিহারের দাংগা অখন্ড ভারতের স্বপ্নসাধ ভেঙে দিয়েছে। এ হত্যাকান্ড হিন্দুর সহজাত শান্তিবাদ (Pacifism)–এর প্রতিও গান্ধীর বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছে। এ সময় থেকে তার মধ্যে একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। পূর্ববর্তীকালে প্রতিটি সাম্প্রদায়িক দাংগায় তার প্রধান উদ্বেগ ছিল হিন্দুদের রক্ষা করা। এখন তিনি মুসলমানদের রক্ষার জন্যেও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। সমগ্র ভারতের উপর হিন্দুর রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা সত্ত্বেও, তিনি রক্তপাত এড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তার মানবিক আবেগ জাগ্রত হয়েছিল এবং জীবন দিয়ে এর মূল্য তাকে দিতে হয়।

বিহার হত্যাকান্ডের কিছুদিন পর ইউপি প্রদেশের গড়মুক্তেশ্বরে আর একটি মুসলিম নিধনযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে প্রতিবছর হিন্দু মেলা হয়। কিছু সংখ্যক মুসলমান ব্যবসায়ী মেলায় দোকানপাট খুলে বসে। হঠাৎ তাদের উপর হামলা করা হয়। জেনারেল টুকার বলেন,

প্রত্যেক মুসলিম নারী, পুরুষ ও শিশুকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। হত্যাকান্ডের কোন সংবাদ লৌহ যবনিকা ভেদ করে বহির্জগতে পৌছতে পারেনি। প্রাদেশিক সরকার হিন্দু প্রশাসনযন্ত্রের সহযোগিতায় হিন্দুদের এ হত্যাকান্ডকে পর্দার আড়াল করে রাখেন। হিন্দু পত্র–পত্রিকায় ইচ্ছাকৃতভাবে ফলাও করে প্রচার করা হয় যে, মুসলমানরা কয়েকগুণে প্রতিশোধ নিয়েছে। এটা করা হয় হিন্দুদের অপকর্ম ঢাকার জন্য। প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত প্যান্ট ঘোষণা করেন যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি করা হবে। কিন্তু কোন কিছুই করা হয়নি। (Sir Francis Tuker : While Memory Serves; pp. 196-201; Chowdhury Mohammad Ali—Emergence of Pakistan, p 87)।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

গণপরিষদ

জুলাই ১৯৪৬–এর শেষে গণপরিষদের ২৯৬ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। নয়টি আসন ব্যতীত সকল সাধারণ আসনে কংগ্রেস জয়ী হয় এবং পাঁচটি আসন ব্যতীত সকল মুসলিম আসনে লীগ জয়ী হয়। গণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন ৯ই ডিসেম্বর ১৯৪৬ হওয়ার কথা। কিন্তু লীগ এতে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। এমনকি একে বৈধ বলে স্বীকার করতে রাজী না যতোক্ষণ না কেবিনেট মিশনের ১৬ই মে'র বিবৃতির ১৯ অনুচ্ছেদের মুসলিম লীগ কর্তৃক ব্যাখ্যা কংগ্রেস মেনে নিয়েছে। এ ব্যাখ্যা মেনে নেয়ার জন্য ভাইসরয় কংগ্রেসকে অনুরোধ করেন। এ অনুরোধের পুরস্কার এভাবে দেয়া হলো যে গান্ধী ও নেহরু ভাইসরয়কে অপসারণের জন্যে বৃটিশ সরকারের নিকটে তারবার্তা ও পত্র প্রেরণ করেন। উপায়ান্তর না দেখে ভাইসরয় কেবিনেট মিশন পরিকল্পনার অধীন গণপরিষদে যোগদানের জন্য ২০ শে নবেম্বর আমন্ত্রণ জানান। সংগে সংগেই জিন্নাহ এটাকে মারাত্মক ধরনের ভুল পদক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, ভাইসরয় ভয়ংকর পরিস্থিতি ও তার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন এবং কংগ্রেসকে খুশী করার চেষ্টা করছেন। ৯ই ডিসেম্বর গণপরিষদের অধিবেশনে কোন লীগ প্রতিনিধি যোগদান করেন নি।

এরূপ পরিস্থিতিতে শেষ চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার দুজন কংগ্রেস এবং দুজন লীগ নেতাকে লন্ডন আমন্ত্রণ জানান। ভাইসরয়ের পরামর্শক্রমে একজন শিখ প্রতিনিধিকেও আমন্ত্রণ জানান হয়।

দুসরা ডিসেম্বর ১৯৪৭, লর্ড ওয়াভেল নেহরু, জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান এবং বলদেব সিং সহ লন্ডন যাত্রা করেন। চারদিন যাবত আলাপ আলোচনা চলে।

কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে মৌলিক মতপার্থক্য কেবিনেট মিশনের ১৬ই মে'র বিবৃতির ব্যাখ্যা নিয়ে অর্থাৎ প্রদেশগুলোর গ্রুপিং নিয়ে। কেবিনেট মিশন স্বয়ং সে ব্যাখ্যাই করে যা মুসলিম লীগের ব্যাখ্যা। কিন্তু নেহরু এ ব্যাখ্যা কিছুতেই মেনে নিতে রাজী হন না। চরম রাজনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়।

কংগ্রেসের একগুঁয়েমি ও হঠকারিতার কারণে কোন আপোস মীমাংসা না হওয়ায় ৬ই ডিসেম্বর বৃটিশ সরকার এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। বিবৃতির শেষ

অনুচ্ছেদে বলা হয়, সর্বসম্মত কার্যধারার ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত ব্যতীত গণপরিষদের সাফল্য আশা করা যায় না। গণপরিষদ যদি এমন কোন সংবিধান রচনা করে যার রচনাকালে ভারতবাসীর বিরাট সংখ্যক লোকের কোন প্রতিনিধিত্ব নেই, তাহলে বৃটিশ সরকার এ ধরনের কোন সংবিধান অনিচ্ছুক জনগোষ্ঠীর উপর বলপূর্বক চাপিয়ে দিতে পারেনা।

সরকারের উপরোক্ত বিবৃতি এবং কেবিনেট মিশনের ২৫শে মে'র বিবৃতি কংগ্রেসের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়। নেহরু ও বলদেব সিং গণপরিষদে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী আরও কিছুদিন যুক্তরাজ্যে অবস্থান করেন। লন্ডনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জিন্নাহ বলেন, কংগ্রেস যদি ১৬ মে প্রকাশিত বিবৃতির বৃটিশ সরকারের ব্যাখ্যা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মেনে নেয়, তাহলে লীগ কাউন্সিলকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানাব। লন্ডনের এক বক্তৃতায় জিন্নাহ দেখিয়ে দেন যে পাকিস্তানের জনসংখ্যা পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিক। আমরা ভারতের তিন চতুর্থাংশের উপর কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ মেনে নিচ্ছি। পাকিস্তান মেনে নিতে কংগ্রেসের আপত্তি এ জন্যে যে তারা সমগ্র ভারত চায়। তাহলে আমরা আর থাকি কোথায়? এখন সমস্যা এই যে, বৃটিশ সরকার কি তাদের বেয়নেটের বলে হিন্দুসংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চান? তা যদি হয় তাহলে বলব তোমরা তোমাদের মানসম্ভ্রম, ন্যায়পরতা ও সুবিচার ও সাধু আচরণের সর্বশেষ কণাটুকুও হারিয়ে ফেলেছ। [Some Recent Writings of Mr. Jinnah, Vol II— ed. by Jamiluddin Ahmad, (Lahore, Muhammad Ashraf 1947)— pp. 496-508; Chowdhury Mohammad Ali : The Emergence of Pakistan, pp. 91-92)।

একদিকে ভারতে কংগ্রেস তীব্র কণ্ঠে দাবী করতে থাকে যে লীগ গণপরিষদে যোগদান না করলে তাদেরকে অন্তর্বর্তী সরকার থেকে বহিষ্কার করা হোক, অপরদিকে বৃটিশ সরকারের ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণা অদূর ভবিষ্যতে এক নতুন রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ইংগিত বহন করে।

কেবিনেট মিশন সেক্রেটারিয়েটের সাথে সংশ্লিষ্ট ই, ডবলিউ, আর লুম্বী বলেন; বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রথম ঘোষণা যে কেবিনেট মিশন

পরিকল্পনা পরিহার করা হবে। ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবের পর এটাই ছিল প্রথম সরকারী ঘোষণা যার মধ্যে কোন না কোন প্রকারে পাকিস্তানের ইংগিত আভাস ছিল। হাউস অব্ কমন্সে ভাষণ দানকালে ক্রিপ্‌স্ সরকারী ঘোষণার শেষ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, গণপরিষদে যোগদানের জন্যে লীগকে যদি সম্মত করা না যায়, তাহলে দেশের যে সব অঞ্চলে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেগুলোকে কোন সিদ্ধান্ত দ্বারা বাধ্য করা যাবেনা। (E.W.R. Lumby, op. cit, p. 129; I. H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, pp. 184-

এখন একটা প্রশ্ন রইলো এবং তা এই যে কংগ্রেস লীগকে সরকার থেকে বহিষ্কার করে দেয়ার দাবীতে এতো অনমনীয় কেন। এর কারণ কয়েকটি। অন্তর্বর্তী সরকারকে কংগ্রেস জাতীয় সরকার বলে অভিহিত করতো এবং এর দায়িত্ব ছিল সামষ্টিক। নেহরুকে এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনে করা হতো। বৃটেনেও কংগ্রেসপন্থী ও বামপন্থী প্রেসগুলো একই সুরে একই গীত গাইতো। যেমন, দি নিউ ষ্টেট্‌স্ ম্যান—এ সরকারকে সামষ্টিক দায়িত্বসম্পন্ন একটি কেবিনেট বলে অভিহিত করে যার প্রধানমন্ত্রী নেহরু— (7 September 1946)। ভারতে মাউন্ট্ ব্যাটেনের চীফ্ অব ষ্টাফ লর্ড ইস্‌মে নেহরুকে ডেপুটি প্রাইম মিনিষ্টার বলে উল্লেখ করেন— (The Memoirs of General the Lord Ismay, London, 1960, p. 418)। তার এ উক্তি ছিল অত্যন্ত হাস্যকর। কারণ নেহরু Dy. Prime Misnister হলে ভাইসরয় কি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন?

লীগ কাউন্সিলারগণ নেহরুকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেন এমনকি নন-লীগ ব্লকের প্রধানও না। জিন্নাহ বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার ভাইসরয়ের একজেকিউটিভ্ কাউন্সিল ব্যতীত আর কিছু ছিলনা। রাজনৈতিক দিক দিয়ে এটাকে পুনর্গঠিত করা হয়। ভাইসরয় তার বিশেষ ক্ষমতাসহ ছিলেন এর প্রধান। নেহরু শুধুমাত্র কাউন্সিলের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তার কাজ ছিল ভাইসরয়ের অনুপস্থিতিতে শুধুমাত্র সভাপতিত্ব করা। কাউন্সিলারদের অধিক কোন ক্ষমতা ও মর্যাদা তাঁর ছিলনা।

এতে নেহরুর অহমিকা ক্ষতবিক্ষত হয় যার জন্যে লীগকে বহিষ্কারের অন্যায় আবদার করতে থাকেন। (I. H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, pp. 282-283)।

চতুর্দশ অধ্যায়

মাউন্টব্যাটেন মিশন

নতুন বছর, ১৯৪৭-এর প্রারম্ভে ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক পরিস্থিতি এমন ছিল যে কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তী সরকার অথবা ভাইসরয়ের এক্‌জেকিউটিভ্ কাউন্সিল রয়েছে যেখানে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ বিরাট মতপার্থক্যসহ অবস্থান করছে। ৯ই ডিসেম্বর ১৯৪৬ থেকে গণপরিষদের অধিবেশন চলছে যা লীগ বয়কট করে চলেছে। তার ফলে কংগ্রেস লীগকে ভাইসরয়ের কাউন্সিল থেকে বহিষ্কারের দাবী জানাচ্ছে। ১৩ই ফেব্রুয়ারী নেহরু ভাইসরয়কে পত্র দ্বারা লীগকে বহিষ্কারের দাবী জানান। ১৫ই ফেব্রুয়ারী প্যাটেল হুমকি প্রদর্শন করে বলেন, লীগ সরকার থেকে বেরিয়ে না গেলে কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকার ত্যাগ করবে। (The Indian Annual Register 1947, vol. I, p. 35; I. H. Qureshi : The Struggle for Pakistan; p. 287)।

এরূপ উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ প্রধানমন্ত্রী এটলী একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এ ধরনের অনিশ্চিত পরিস্থিতি আর দীর্ঘায়িত হতে দেয়া যায় না। বৃটিশ সরকার পরিষ্কার বলে দিতে চান যে, জুন মাসের ভেতরেই দায়িত্বশীল ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করবে। পূর্ণ প্রতিনিধিত্বশীল গণপরিষদ কর্তৃক সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র এ সময়ের মধ্যে প্রণীত না হলে, সরকার বিবেচনা করবে বৃটিশ ভারতে ক্ষমতা কার কাছে যথাসময়ে হস্তান্তর করা হবে—বৃটিশ ভারতে কোন্ ধরনের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অথবা বর্তমান প্রাদেশিক সরকারের অধীনে কোন্ কোন্ অঞ্চলের হাতে অথবা এমন অন্য কোন্ উপায়ে যা অত্যন্ত যুক্তিসংগত বিবেচিত হবে এবং যা ভারতীয় জনগণের স্বার্থের অনুকূল হবে।

বিবৃতির শেষে এ কথাও ঘোষণা করা হয় যে ওয়াভেলের স্থলে এডমিরাল দি ভাইকাউন্ট ম্যাউন্টব্যাটেনকে ভাইসরয় করা হচ্ছে।

চারদিন পর ভারত সচিব হাউস অব লর্ড্‌স্-এ ঘোষণা করেন যে, এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল ভারতের দায়িত্বশীল মহলের পরামর্শে। আর উদ্দেশ্য ছিল একটি

চাপ সৃষ্টি করা যাতে ভারতীয় দলগুলো একটা সমঝোতায় পৌঁছে।

এখানে ভারতের দায়িত্বশীল মহল বলতে যে গান্ধী নেহরুকে বুঝানো হয়েছে এবং সমঝোতা বলতে কংগ্রেসের দাবী লীগকে মেনে নেয়া বুঝানো হয়েছে তা বুঝতে কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

ভারতের রাজনৈতিক চরম মুহূর্তে লর্ড ওয়াভেলকে কেন অপসারণ করা হলো তা জানার ঔৎসুক্য পাঠকবর্গের অবশ্যই থাকতে পারে। কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল এটলী যতো কথাই বলুন, কংগ্রেসকে বিশেষ করে গান্ধী ও নেহরুকে খুশী করার জন্যই যে ওয়াভেলের শাস্তি হলো, কতিপয় ঘটনা তার সাক্ষ্য বহন করে।

প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলী ও তাঁর কেবিনেটের সাথে লর্ড ওয়াভেলের কি কোন চরম মতপার্থক্য হয়েছিল যার মূল্য ওয়াভেলকে দিতে হয়? এর কোন প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এর কারণ অন্য কিছু। তাই অনুসন্ধান করে দেখা যাক।

উল্লেখ্য যে লর্ড ওয়াভেল প্রথমে কংগ্রেসের অতি প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৪৬ এর জুনে মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে চাইলে ওয়াভেল বাধা দেন। পরে আবার তিনি কংগ্রেসকে সরকার গঠনের অনুমতি দেন লীগকে বাদ দিয়েই। পূর্বে তিনি বেশ দৃঢ়তার সাথে এ কথা বলেন যে ভারতের ভৌগলিক ঐক্য বা অখন্ডতা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। যার জন্য লীগ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে। পরবর্তীকালে ভাইসরয়-কংগ্রেস সম্পর্কে উষ্ণতা হ্রাস পেতে থাকে। কোলকাতার রক্তক্ষয়ী দাংগার পর কংগ্রেস ভাইসরয়কে বলেছিল, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদত্ত অধিকার ক্ষুণ্ন করে হলেও বাংলার লীগ মন্ত্রীসভা ভেঙে দিতে। ভাইসরয় তাতে রাজী হননি। এর ফলে তিনি কংগ্রেসের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। তারপর লীগ কাউন্সিলারদেরকে ভাইসরয়ের Executive Council থেকে বহিষ্কার করার বার বার দাবী জানানোর পরও যখন ভাইসরয় তা মানতে অস্বীকার করলেন তখন সম্পর্কে ভাঙন চূড়ান্তে পৌঁছলো। তারপর ভাইসরয়কে অপসারণের জন্য বৃটিশ সরকারের কাছে গান্ধীর তারবার্তা ও পত্রাদি প্রেরণ এবং একই উদ্দেশ্যে বৃটেনে নেহরুর বন্ধুবান্ধবকে তাঁর পত্র প্রেরণ; ভারত সচিব এ সবকেই বলেছেন 'ভারতের দায়িত্বশীল মহলের

পরামর্শে'। ওয়াভেলের অপসারণে এবং মাউন্টব্যাটেনের ভাইসরয় হিসাবে ভারত আগমনে নেহরু অত্যন্ত আনন্দিত হন।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন ২২শে মার্চ দিল্লী পৌঁছেন। তাঁর নিয়োগ কংগ্রেসকে উল্লসিত করে। পূর্ব থেকেই নেহরুর সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল। ভারতে তিনি কোন অপরিচিত লোক ছিলেন না। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি ছিলেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মিত্র বাহিনীর সুপ্রীম কম্যান্ডার। সে কারণে তাঁকে বার বার ভারতে আসতে হতো যা ছিল যুদ্ধের অপারেশন বেস্ (base for operation)। দুবছর পূর্বে মালয়ে নেহরুর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁরা একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হন। তবে তিনি যে কংগ্রেস ভক্ত ছিলেন তা জানা যায়নি। তাঁর ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতা লর্ড ইস্‌মে ভয় করছিলেন যে— মাউন্টব্যাটেনকে হিন্দুভক্ত এবং মুসলিম লীগ বিদ্বেষী হিসাবে গ্রহণ করা হবে। (Cempbell-Johnson, Allan : Mission with Mountbatten, p. 23; Abdul Hamid : Muslim Separatism in India, p. 239)।

নিয়মমাফিক ভাইসরয় স্টাফের অতিরিক্ত একটি ব্যক্তিগত সেক্রেটারিয়েট গঠনের অনুমতি মাউন্টব্যাটেনকে দেয়া হয়। সেটা ছিল তাঁর 'কিচেন্ কেবিনেট'। তাঁর সাফল্যের মূলে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন ভি. পি. মেনন। ভাইসরয় তাঁকে তাঁর নীতিনির্ধারণী পরিমন্ডলে টেনে এনেছিলেন। ভদ্রলোক ১৯৪২ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সাংবিধানিক পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করে আসছিলেন। তাঁর প্রশাসনিক যোগ্যতার সাথে রাজনৈতিক বিচক্ষণতাও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তিনি ছিলেন প্যাটেলের শরণাগত। তাঁর নিজের লিখিত গ্রন্থ 'The Transfer of Power, Calcutta, 1957' পাঠে পরিষ্কার জানা যায় যে তিনি ভাইসরয়ের ব্যক্তিগত সেক্রেটারিয়েট সংশ্লিষ্ট হওয়ার পূর্বেও সর্বদা লীগের বিরুদ্ধেই তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এখন তিনি শাসনদন্ডের পেছনে এক বিরাট শক্তি হয়ে পড়লেন।

— (Abdul Hamid : Muslim Separatism in India, p. 239)।

মাউন্টব্যাটেন ইংলন্ড থেকে সযত্নে ও সাবধানতা সহকারে তাঁর স্টাফের লোক বেছে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন লর্ড ইসমে যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চার্চিলের ব্যক্তিগত সাধারণ উপদেষ্টা ছিলেন। আরও ছিলেন এরিক সিভিল, লর্ড উইলিংডনের প্রাক্তন প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং ৬ষ্ঠ জর্জের

এসিস্ট্যান্ট প্রাইভেট সেক্রেটারী, এ দুজন ছিলেন ভাইসরয়ের সাধারণ ও বেসামরিক দিকের প্রধান উপদেষ্টা এবং লর্ড ইসমে ছিলেন চীফ্ অব স্টাফ। ভি, পি, মেনন ছিলেন সাংবিধানিক পরামর্শদাতা। প্রায়ই স্টাফের বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো। প্রথমতঃ মাঝে মাঝে মেননকে বৈঠকে ডাকা হতো। পরে প্রত্যেক বৈঠকে তাঁকে ডাকা হতো। ভাইসরয় এবং অন্যান্য সকলের জানা ছিল যে মেনন ছিলেন প্যাটেলের অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক। এর ফলে ভাইসরয়ের কাউন্সিলের আভ্যন্তরীণ সকল গোপন তথ্যই শুধু প্যাটেল জানতেন না, বরঞ্চ তাঁর এ মুখপাত্রকে দিয়ে তিনি ভাইসরয়ের পলিসি প্রভাবিত করতেন। মেননের স্থলে কোন মুসলমান যদি হতেন এবং তিনি জিন্নাহ্র সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন, তাহলে ভাইসরয় এবং কংগ্রেস কারো পক্ষ থেকেই তাঁকে বরদাশত করা হতোনা। এঁদের নিকটে মুসলিম লীগ তথা ভারতের মুসলমান সুবিচার আশা করতে পারতো কি?

তেস্রা জুন পরিকল্পনার ক্রমবিকাশ

কেবিনেট মিশন পরিকল্পনার ভিত্তিতে অখন্ড ভারতের জন্য সর্বসম্মত সমাধান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে মাউন্টব্যাটেনকে ভারতে ভাইসরয় নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ভারতে পৌঁছার পর ঘটনা প্রবাহ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিপরীতমুখী দৃষ্টিভংগী লক্ষ্য করার পর সর্বসম্মত সমাধান এবং অখন্ড ভারতের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। অতএব প্রধানমন্ত্রীর ২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণাকে কেন্দ্র করেই পরিকল্পনা তৈরীর প্রতি ভাইসরয় মনোনিবেশ করেন।

তিনি তাঁর পরামর্শদাতাগণের সাথে পরামর্শের পর ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি পরিকল্পনা তৈরী করেন। তার ভিত্তি হলো প্রদেশগুলোর হাতে, অথবা সেসব প্রদেশগুলোর কনফেডারেশনের হাতে যারা বাস্তবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে দলবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত করবে—তাদের হাতে ক্ষমতা ও অধিকার হস্তান্তর করা হবে। ১১ই এপ্রিল ইস্মে পরিকল্পনার খস্ড়া মেননকে দেন তার সংশোধনীসহ সময়সূচী তৈরীর জন্য। মেনন আদেশ পালন করেন এবং সেই সাথে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, এ একটি মন্দ পরিকল্পনা এবং এ কার্যকর হবে না। গভর্ণরদের সম্মেলনে চূড়ান্ত পরিকল্পনা পেশ করা হয় এবং তা অনুমোদিত হয়। দুসরা মে লর্ড ইস্মে এবং জর্জ এবেল হোয়াইট হলের অনুমোদনের জন্য

পরিকল্পনাটি নিয়ে লন্ডন রওয়ানা হন। ভাইসরয় আশা করছিলেন যে ১০ই মের ভেতরে অনুমোদন পেয়ে যাবেন এবং ১৭ই মে দলীয় নেতাদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য একত্রে মিলিত হওয়ার আবেদন জানাবেন।

অতঃপর মাউন্টব্যাটেন স্যার এরিক সিভিল ও মেননসহ শিমলা গমন করেন। এখানে মেনন ভাইসরয়ের সাথে নিরিবিলি কথা বলার সুযোগ পান এবং লন্ডনে প্রেরিত পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন, এ কার্যকর হবেনা। মেননের সকল যুক্তি শুনার পূর্বে হঠাৎ নেহরু এবং কৃষ্ণ মেনন ভাইসরয়ের সাথে থাকার জন্য ৮ই মে শিমলা পৌঁছেন। ভাইসরয় মেননকে নেহরুর সাথে কথা বলতে বলেন। ৯ই মে মেনন নেহরুকে বলেন, ডমিনিয়ন স্টেটাসের ভিত্তিতে ক্ষমতা দুটি ভারতের কাছে হস্তান্তর করা হবে—প্রদেশগুলো বা তাদের কনফেডারেশনের কাছে নয়। ১০ই মে ভাইসরয় নেহরু, মেনন ও স্যার এরিক সিভিলকে নিয়ে পরিকল্পনাটির উপর আলোচনা করেন যা কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং ভারত সরকারের রেকর্ডের অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়।

ঐদিনই লন্ডন থেকে অনুমোদিত পরিকল্পনা ভাইসরের হস্তগত হয় অবশ্য কিছু সংশোধনীসহ। ডিনারের পর ভাইসরয় নেহরুকে ডেকে পরিকল্পনাটি দেখান যা অনুমোদিত হয়ে এসেছে। পরিকল্পনাটি পড়ার পর নেহেরু ভয়ানক রেগে গিয়ে বলেন, আমি, কংগ্রেস এবং ভারত—কারো কাছেই এ গ্রহণযোগ্য নয়।

মাউন্টব্যাটেন ১১ই মে মেননকে ডেকে নেহরুর প্রতিক্রিয়া তাঁকে জানান এবং বলেন যে এখন কি করা যায়। মেনন বলেন, ৯ই এবং ১০ই মে আমার যে পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল তা গ্রহণ করা উচিত। অনুমোদিত পরিকল্পনা কার্যকর করার ফলে দেশ বহু ইউনিটে বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং আমার পরিকল্পনা ভারতের অত্যাবশ্যক ঐক্য বজায় রাখবে। আর যেসব অঞ্চল ভারতের অংশ হিসাবে থাকতে ইচ্ছুক নয় তাদেরকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে।

তড়িঘড়ি স্টাফ মিটিং আহবান করা হয় এবং নেহরুকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। ভাইসরয় নেহরুকে জিজ্ঞাস করেন যে মেননের পরিকল্পনা তিনি অনুমোদন করেন কিনা। তা দেখার পর নেহরু অনুমোদন করেন।

অতঃপর ভাইসরয় ১৪ই মে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৮ই মে লন্ডন যাত্রা করেন পরিকল্পনাটি অনুমোদনের উদ্দেশ্যে কেবিনেটকে সম্মত করার জন্য। লর্ড ইসমে এবং জর্জ এবেল মেননের পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন। ভাইসরয় জোর দিয়ে বলেন, বৃটিশ সরকার এ পরিকল্পনা অনুমোদন না করলে আমি পদত্যাগ করব। কেবিনেট পরিকল্পনাটির একটি 'কমা' পর্যন্ত পরিবর্তন না করে মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে অনুমোদন করেন। ভাইসরয় বিজয়ীর বেশে ৩১ মে তাঁর দলসহ ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

এখন এ কথা দিবালোকের মতো সত্য যে, যে পরিকল্পনাটি ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ত্বরান্বিত করে এশিয়া ও পৃথিবীর মানচিত্রে একটি পরিবর্তন সূচিত করতে যাচ্ছে, তা তৈরী হলো ভাইসরয়ের একজন কংগ্রেসভক্ত হিন্দু উপদেষ্টার দ্বারা এবং নেহরু ও কৃষ্ণ মেননের সহযোগিতায়। দেশ ও দেশের কয়েক কোটি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের এ পরিকল্পনা নিয়ে ভাইসরয় একমাস যাবত তাঁর মুষ্টিমেয় প্রিয়জন নিয়ে আলাপ আলোচনা করলেন, কিন্তু তার কোন এক পর্যায়ে একটি বারের জন্যও জিন্নাহকে ডাকা হলোনা। এর দ্বারা মাউন্টব্যাটেন তথা বৃটিশ সরকারের অতি সংকীর্ণ ও চরম মুসলিম বিদ্বেষী মানসিকতাই পরিস্ফুট হয়েছে। ইতিহাসের পাতায় তা চিরদিন অংকিত থাকবে।

একটি প্রশ্ন যা মনকে আলোড়িত করে

ভারত বিভাগের পরিকল্পনা বৃটিশ সরকার কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। তেস্রা জুন তা সরকারীভাবে ঘোষণা করা হবে। পরিকল্পনাটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পূর্বেই তার প্রতি নেহরু তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। এখন প্রশ্ন এই যে এটা কি করে সম্ভব হলো? কংগ্রেস, হিন্দুভারত ও তার প্রধান মুখপাত্র গান্ধী, নেহরু ও প্যাটেল কিভাবে ভারতমাতার অংগচ্ছেদে রাজী হলেন? তাঁরা কি অখন্ড ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার বহুদিনের সোনালি স্বপ্ন পরিহার করলেন?

জেনারেল টুকার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু প্রতিহিংসা পরায়ণ মনোভাবের উপর আলোকপাত করে বলেন—

অবশেষে তারা বল্লেন, আচ্ছা, মুসলিম লীগ যদি পাকিস্তান পেতে চায়, তা ঠিক আছে পেতে দাও। আমরা তাদের অঞ্চলের একটি ইঞ্চি কেটে কেটে নিয়ে নেব যাতে মনে হবে যে আর তা টিকে থাকবে না এবং যতোটুক থাকবে তা আর অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চালানো যাবে না। (Sir Francis Tuker : While Memory Serves, London, Cassell, 1950, p. 257; Choudhury Mohammad Ali : The Emergence of Pakistan, p. 123)।

প্যাটেল ১৯৪৯ সালে ভারতের গণপরিষদে যে ভাষণ দেন, তা টুকারের উপরোক্ত মন্তব্যের যথার্থতাই ব্যক্ত করে। প্যাটেল তাঁর ভাষণে বলেন, আমি সর্বশেষ উপায় হিসাবে দেশবিভাগে সম্মত হই, যখন আমরা সব হারিয়ে ফেলেছিলাম। মিঃ জিন্নাহ কাটছাঁট করা পাকিস্তান চাননি কখনো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই তাঁকে গিলতে হলো। (Quoted in Kewnl L. Panjabi, The Indemiable Sardar, Bombay, Bharatiya Vidya Bhaban, 1962, p. 124; Choudhury Mohammad Ali- Ibid, p. 123)।

কংগ্রেসের দেশবিভাগ মেনে নেয়াটা ছিল একটা কৌশলগত পদক্ষেপ। কিন্তু লক্ষ্যস্থল অপরিবর্তিত ছিল: এ লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে প্রয়োজন—

১। হিন্দুস্থান বা ইন্ডিয়ান ইউনিয়নকে ভারতে বৃটিশ সরকারের উত্তরাধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। পাকিস্তানকে মনে করা হবে যে কিছু অঞ্চলসহ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

২। পাকিস্তানের সাথে যেসব এলাকা সংশ্লিষ্ট করা হবে তা হবে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং তা পূর্ব বাংলা, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান নিয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে। সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানের বাইরে থাকবে। ফলে পাকিস্তানকে কৌশলগতভাবে পরিবেষ্টিত করে রাখা হবে।

৩। সময়, উপায় উপাদান, সামরিক-বেসামরিক জনশক্তি ও মাল মশলা থেকে পাকিস্তানকে বঞ্চিত করে চরম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে যাতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে না পারে।

৪। পাকিস্তান যাতে টিকে থাকতে না পারে তার জন্যে যা কিছু করা দরকার তা করা হবে। (কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নিশ্চিত ছিলেন যে পাকিস্তান বেশী দিন টিকে থাকতে পারবেনা। এজন্যে তাঁদের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের অর্থনীতি ধ্বংস করার চেষ্টা করা)।

এসব হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে হিন্দুভারতের প্রয়োজন ছিল বৃটিশের সাহায্য যারা গোটা বেসামরিক প্রশাসন ও সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করতো। বিদায়ের প্রাক্কালে মাউন্ট্‌ব্যাটেন-র‍্যাড্‌ক্লিফ্ সহ গোটা প্রশাসন হিন্দুভারতের স্বার্থে কাজ করেছে যা পরে উল্লেখ করা হবে।

— (Choudhury Mohammad Ali : The Emergence of Pakistan, pp. 123-24)।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া

ভারতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। বাংলার এবং পাঞ্জাবের প্রাদেশিক আইনসভাকে নির্দেশ দেয়া হয় যেন তারা প্রত্যেকে দুই দুই ভাগে মিলিত হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোকে নিয়ে এক ভাগ এবং অবশিষ্ট আর এক ভাগ। প্রত্যেক আইনসভার দুটি অংশের সদস্যগণ পৃথক পৃথকভাবে বসবেন এবং তাঁদেরকে এ অধিকার দেয়া হবে যে, তাঁর প্রদেশের বিভাগ চান কি চান না। যে কোন অংশের সরল সংখ্যাগুরু (Simple majority) যদি বিভাগের সপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহলে বিভাগ কার্যকর হবে। বিভাগের সিদ্ধান্তের পর আইনসভার প্রত্যেক অংশ যে এলাকার প্রতিনিধিত্ব করে তাদের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেবে যে তারা বর্তমান গণপরিষদে যোগদান করবে, না নতুন গণপরিষদে। এ সিদ্ধান্ত হওয়ার পর গভর্ণর জেনারেল একটি 'বাউন্ডারী কমিশন' নিয়োগ করবেন পাঞ্জাবের দু'অংশের সীমানা চিহ্নিত করার জন্য। তা করা হবে মুসলিম ও অমুসলিমদের একত্রে লাগানো (Contiguous) সংখ্যাগুরু এলাকা নির্ণয়ের ভিত্তিতে। কমিশনকে অন্যান্য কারণ বিবেচনারও পরামর্শ দেয়া হয়। অনুরূপ নির্দেশ বেঙ্গল বাউন্ডারী কমিশনকেও দেয়া হয়।

সিন্ধু আইনসভার ইউরোপিয়ান সদস্যগণ ব্যতীত অন্যান্যগণ একত্রে বসে সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁরা বর্তমান গণপরিষদে— না নতুন পরিষদে যোগদান করবেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গণভোট গ্রহণ করা হবে যে, সেদেশের ভোটারগণ কোন্ গণপরিষদে যোগদান করবে।

এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ বেলুচিস্তানকেও দেয়া হবে। বাংলা প্রদেশ বিভাগের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আসামের সিলেট জেলায় গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। এর ফলে সিদ্ধান্ত হবে যে তারা আসামের অংশ হিসাবে সিলেটকে পেতে চায়, না পূর্ব বাংলার সাথে মিলিত হতে চায়। নতুন প্রদেশের সাথে মিলিত হতে চাইলে 'বাউন্ডারী কমিশন' সীমানা চিহ্নিত করবে।

পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে নিম্নলিখিত ভিত্তিতে গণপরিষদের নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ঃ

প্রদেশ	সাধারণ আসন	মুসলিম	শিখ	মোট
সিলেট জেলা	১	২	০	৩
পশ্চিম বংগ	১৫	৪	০	১৯
পূর্ব বংগ	১২	২৯	০	৪১
পশ্চিম পাঞ্জাব	৩	১২	২	১৭
পূর্ব পাঞ্জাব	৬	৪	২	১২

বৃটিশ সরকার জুন ১৯৪৮ এর পূর্বেই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ইচ্ছুক বিধায় পার্লামেন্টের চলতি অধিবেশনেই আইন পাশ করা হবে যাতে এ বছরেই 'ডমিনিয়ন স্টেটাস'-এর ভিত্তিতে একটি বা দুটি কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায়।

ভাইসরয় দুস্‌রা জুন সাত নেতার এক আলোচনা সভা আহবান করেন। তাঁরা হলেন নেহরু, প্যাটেল, কৃপালনী, জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, আবদুর রব নিশ্‌তার এবং বলদেব সিং। পরিকল্পনাটি তাঁদের কাছে পেশ করা হয় এবং তা অনুমোদিত হয়। মাউন্টব্যাটেন গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে একথা ব'লে তাঁকে সম্মত করার চেষ্টা করেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিকল্পনাটি অতি উত্তম। যদিও গান্ধী পরিকল্পনাটি বৃটেনে প্রেরণের পূর্বেই সমর্থন করেন, এখন তিনি বিরোধিতা করছেন— শুধু পৃথিবী এবং লীগকে ধোকা দেয়ার জন্যে।

তেস্‌রা জুন পরিকল্পনাটি সারা দুনিয়ার সামনে প্রকাশ করা হয়। ভাইসরয় ৪ঠা জুন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে প্রতিটি পর্যায়ে ও মুহূর্তে তিনি নেতৃবৃন্দের হাত ধরাধরি করে কাজ করেছেন। সেজন্য পরিকল্পনাটি তাঁদের ক্ষোভ অথবা বিস্ময়ের কারণ হয়নি।

বিশ্ববাসীকে ধোকা দেয়ার জন্য এমন নিরেট মিথ্যা কথা বলতে তাঁর মতো দায়িত্বশীলের বিবেকে বাধেনি। পরিকল্পনাটি তাঁর স্টাফ সদস্যবৃন্দ, পরিকল্পনা প্রণেতা ভিপি মেনন এবং নেহরু ব্যতীত আর কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতেন না। লীগের কাছেও তা গোপন রাখা হয়েছিল।

যাহোক উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় যে, ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭, ক্ষমতা হস্তান্তরের পরীক্ষামূলক তারিখ নির্ধারিত হয়।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ১৪ই জুন মিলিত হয় এবং পরিকল্পনা মেনে নেয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করে। সেই সাথে ভারত বিভাগ সম্পর্কে জোর দিয়ে একথা বলে যে, ভূগোল, পর্বতমালা ও সমুদ্র ভারতের যে আকার আকৃতি নির্মাণ করে দিয়েছে, যেমনটি সে আছে, কোন মানবীয় সংস্থা তা পরিবর্তন করতে পারেনা এবং তার চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ণয়ের পথে প্রতিবন্ধক হতে পারেনা। কমিটি বিশ্বাস করে যে যখন বর্তমান ভাবাবেগ প্রশমিত হবে, তখন ভারতের সমস্যাসমূহ তার যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতেই বিবেচিত হবে এবং দ্বিজাতিত্বের ভ্রান্ত মতবাদ কলংকিত ও পরিত্যক্ত হবে। আবুল কালাম আজাদ বলেন, আমি নিশ্চিত যে বিভাগটি হবে ক্ষণস্থায়ী। হিন্দু মহাসভা বলে, ভারত এক ও অবিভাজ্য এবং যতোক্ষণ না বিচ্ছিন্ন এলাকাসমূহ ভারত ইউনিয়নের সাথে সংযুক্ত করা হবে, ততোক্ষণ কোন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না।

ভবিষ্যতে ভারত এক ও অখন্ড হবে এ আশা বিভিন্ন হিন্দু নেতা, গ্রন্থকার এবং পত্রপত্রিকা পোষণ করতেন এবং বিভাগের পূর্বে, বিভাগের সময়ে এবং পরে সে আশা ব্যক্ত করেছেন। ১৫ই আগস্ট গান্ধী বলেন, আমি নিশ্চিত যে এমন এক সময় আসবে যখন এ বিভাগ পরিত্যক্ত হবে। কংগ্রেস মুখপত্র 'দি হিন্দুস্তান টাইমস্'ও তার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে উক্তরূপ আশা ব্যক্ত করে। বিভাগ পরিকল্পনা প্রণেতা মেনন স্বয়ং বলেন, আগস্ট ১৯৪৭ এর উদ্দেশ্য এ ছিলনা যে, দেড় শতাধিক বছর যাবত যে বন্ধনে ভারত বাঁধা আছে তা ছিন্ন করা হবে। হিন্দুদের মধ্যে এ এক সাধারণ বিশ্বাস ছিল যে পাকিস্তান বেশী দিন টিকে থাকবেনা এবং কংগ্রেসের অধীনে ভারত পুনরায় একটি অখন্ড ভারতে পরিণত হবে— (Economist, 17 May 1947; Sunday Times 1 June 1947; Manchester Guardian 15 Aug. 1947, Round Table Sept. 1947, p. 370; Guy Wint : The British in Asia- p. 179; I.H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, pp, 195-96)।

এসব বক্তব্য ও প্রতিক্রিয়া থেকে এ কথাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, হিন্দু ভারত মনে প্রাণে পাকিস্তানের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারেনি। শুধু তাই নয়, ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ থেকে এ কথা লেখার সময় পর্যন্ত (অক্টোবর ১৯৯৩) হিন্দুভারত

সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান নামের সমগ্র ভূখন্ড গ্রাস করে অখন্ড ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। ১৯৪৭-পূর্ব ভারতের ভৌগলিক অবস্থা পুনরুদ্ধার করার কথা এখন বিভিন্ন সেমিনার জনসভায় প্রকাশ্যে বলা হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে ভারতের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন অত্যন্ত জোরদার করা হয়েছে।

বড়োলাটগিরি নিয়ে ক্যানভাসিং ও বিতর্ক

ভারতের এ উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ও ভাইসরয় কুঠির প্রত্যেকেই এ ধারণা পোষণ করতেন যে দুটি নতুন ডমিনিয়নের গভর্ণর জেনারেল একই ব্যক্তি হবেন এবং তিনি মাউন্টব্যাটেন।

কয়েকদিন পূর্বে জিন্নাহ বলেছিলেন, দুটি ডমিনিয়নের গভর্ণর জেনারেলের উপরে একজন সুপার গভর্ণর জেনারেল হওয়া উচিত। এ ধারণা সম্ভবতএ জন্যে করা হয়েছিল যে বিভাগ সম্পর্কিত প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগীসহ সহজে সম্পন্ন করা হবে। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন এর বিরোধিতা করেন এবং হোয়াইট হল মাউন্টব্যাটেনকে সমর্থন করে।

নেহরু যখন মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের গভর্ণর জেনারেল হওয়ার প্রস্তাব দেন তখন তিনি নেহরু ও প্যাটেলকে বলেন যে তিনি অনুরূপ প্রস্তাবের আশা মুসলিম লীগ থেকেও করেন।

মাউন্টব্যাটেন বহু চেষ্টা তদবির করেও জিন্নাহকে সম্মত করাতে পারলেন না। দুসরা জুলাই জিন্নাহ তাঁকে জানিয়ে দেন যে তিনি স্বয়ং পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হওয়ার সিদ্ধান্ত করেছেন। তারপরও মাউন্টব্যাটেন আশা ত্যাগ করেন নি। তিনি ভূপালের নবাবকে দিয়েও চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। মাউন্টব্যাটেন এতে তাঁর আত্মসম্মানে বিরাট আঘাত পান। তবে এ কথা সত্য যে মাউন্টব্যাটেনকে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল করা হলে তিনি হতেন পাকিস্তানের ভারতীয় গভর্ণর জেনারেল। জিন্নাহ দেশকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। (I. H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, pp. 296-300)।

জুন ৩ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

বেঙ্গল আইনসভার অধিবেশন ২০শে জুলাই অনুষ্ঠিত হয় এবং ১২৬-৯০ ভোটে নতুন গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর অমুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকার সদস্যগণ ৫৮-২১ ভোটে প্রদেশ বিভাগের এবং বর্তমান গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত করেন। পূর্ব বাংলা মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকার সদস্যগণ ১০৬-৩৫ ভোটে প্রদেশ বিভাগের বিরুদ্ধে এবং সেই সাথে নতুন গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত করেন। অতঃপর সিলেটকে পূর্ব বাংলা প্রদেশের সাথে সংযুক্ত করার প্রস্তাব করেন। পাঞ্জাব আইনসভা ৯১-২৭ ভোটে নতুন গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত করে। অতঃপর প্রদেশের মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকার সদস্যগণ ৬৯-২৭ ভোটে প্রদেশ বিভাগের বিরুদ্ধে রায় দান করেন। পক্ষান্তরে হিন্দু সংখ্যাগুরু এলাকার সদস্যগণ ৫০-২২ ভোটে বিভাগের পক্ষে এবং ভারতীয় গণপরিষদে যোগদানের পক্ষে রায় দান করেন।

সিন্ধু আইনসভা ২৬শে জুন মিলিত হয় এবং ৩০-২০ ভোটে নতুন গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত করে। বেলুচিস্তানে শাহী জির্গা এবং কোয়েটা পৌরসভার বেসরকারী সদস্যগণ মিলিত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে নতুন গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত করেন।

অপরদিকে জুলাইয়ের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত সিলেটের গণভোটে বিপুল সংখ্যাগুরু ভোটার আসাম থেকে পৃথক হয়ে পূর্ব বাংলায় যোগদানের সপক্ষে ভোটদান করেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গণভোটের শর্ত ছিল এই যে, ভোটারগণ ভারতীয় গণপরিষদে যোগদানের অথবা নতুন গণপরিষদে যোগদানের সপক্ষে ভোট দেবেন। আবদুল গাফফার খান দাবী করেন যে, ভোটারদের স্বাধীন পাখতুনিস্তানের সপক্ষে ভোটদানের সুযোগ দেয়া হোক। গান্ধী ও নেহরু আবদুল গাফ্ফার খানের দাবী সমর্থন করেন। তাইসরয় এই বলে দাবীটি নাকচ্ করেন যে ৩ জুন পরিকল্পনায় যে কার্যবিধি সন্নিবেশিত করা হয়েছে তা উভয় দলের সম্মতি ব্যতিরেকে পরিবর্তন করা যাবেনা। জিন্নাহ এ পরিবর্তন মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। গাফ্ফার খান তাঁর অনুসারীদের ভোটদানে বিরত থাকার নির্দেশ দেন।

তার পরেও ২৮৯, ২৪৪ ভোট নতুন গণপরিষদের পক্ষে এবং মাত্র ২৮৭৪ ভোট ভারতীয় গণপরিষদের পক্ষে প্রদত্ত হয়।

প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী ভারত স্বাধীনতা বিল হাউস্ অব কমন্সে ৪ঠা জুলাই পেশ করেন। ১৫ই জুলাই হাউস অব কমন্সে এবং ১৬ই জুলাই হাউস অব লর্ডসে তা গৃহীত হয়। বিলটি ১৮ই জুলাই রাজকীয় সম্মতি লাভ করে। অতঃপর ভারত ও পাকিস্তানের জন্য ২০শে জুলাই পৃথক পৃথক দুটি প্রভিশনাল গভর্ণমেন্ট কায়েম হয়।

বিগত সাত বছরের সংগ্রামের ফসল হিসাবে পাকিস্তান নামে একটি নতুন স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো। এ ধরনের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা দুনিয়ার ইতিহাসে এই প্রথম।

পাকিস্তান কায়েম হলো বটে, কিন্তু কংগ্রেস, হিন্দুভারত ও বৃটিশ সরকার এর চরম বিরোধিতা করে যখন ব্যর্থ হয়, তখন হঠাৎ করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কাটছাঁট করা (Truncated Pakistan) এক পাকিস্তানে সম্মত হয়। ক্ষমতা হস্তান্তর পরিকল্পনাটি তৈরী হয় একজন কংগ্রেসপন্থী হিন্দু অফিসার কর্তৃক। এ বিষয়ে জিন্নাহকে একেবারে অন্ধকারে রাখা হয়। ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে হস্তান্তরের মাত্র আড়াই মাস পূর্বে পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয় যেন মুসলিম লীগ কোন চিন্তাভাবনা করার কোন অবকাশ না পায়। এটা ঠিক যেন ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ শত্রু শিবির আক্রমণ করার মতো। কাটছাঁট করা পাকিস্তানকে আরও সংকুচিত করে বাউন্ডারী কমিশন। পাকিস্তানের ন্যায্য প্রাপ্য অনেক মুসলিম মেজরিটি এলাকা বলপূর্বক ভারতভুক্ত করা হয়। উপরন্তু বিভাগের পর পাকিস্তানের ন্যায্য প্রাপ্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকেও তাকে ষোল আনা বঞ্চিত করা হয়। সম্ভবতঃ এটা ছিল পাকিস্তান দাবী করার অপরাধের আর্থিক দন্ড। কংগ্রেস ও বৃটিশের ষড়যন্ত্রে এসব এজন্য করা হয়েছিল যাতে পাকিস্তান কিছু সময়ের জন্যও টিকে থাকতে না পারে।

তারপর পাকিস্তান দাবীর মূল কারণ ছিল এই যে হিন্দু সংখ্যাগুরুর কাছে ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তর করলে মুসলমানদের জানমাল ইজ্জৎ আবরুই বিপন্ন হবে না, তাদের জাতিসত্তাকেই নির্মূল করা হবে। চল্লিশের পূর্বে হিন্দু সংখ্যাগুরু

প্রদেশগুলোতে আড়াই বছরের কংগ্রেসী শাসন তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

কিন্তু ভারত বিভাগের পরও ভারতে মুসলিম নিধনযজ্ঞ বন্ধ করা হয়নি। খুনের দরিয়া সাঁতার দিয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলিম নরনারী, শিশু সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানে আশ্রয় নেয়।

পাকিস্তান সরকারের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী জনাব আলতাফ গওহর বলেন—

দিল্লীতে হত্যাকান্ড শুরু হওয়ার পূর্বেই আমি করাচী পৌঁছে যাই। ··· সীমান্ত অতিক্রম করে আগমনকারী মজলুম আশ্রয় প্রার্থীদের সংখ্যা বেড়েই চলছিল এবং ব্যাপক গণহত্যার লোমহর্ষক কাহিনী প্রত্যেককে অধিকতর জাতীয় খেদমতে বাধ্য করছিল। (পাকিস্তানের একটি দৈনিক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ)।

আলতাফ গওহর ভারতের রাজধানী স্বয়ং দিল্লীতে হত্যাকান্ডের ইংগিত করেছেন। দিল্লীর বিভিন্ন স্থানে লোমহর্ষক হত্যাকান্ড বন্ধের উদ্দেশ্যে মিঃ গান্ধী অনশন ব্রত পালন করতে থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জীবন দিয়েও তা বন্ধ করতে পারেন নি।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন ঃ

গান্ধীজি তাঁর অনশন ভাঙার শর্তগুলো বলতে থাকেন। তা হলো ঃ

১। হিন্দু ও শিখদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের আক্রমণ করা এক্ষুণি বন্ধ করতে হবে। তাদেরকে এ নিশ্চয়তা দিতে হবে যে তারা ভাইয়ের মতো একত্রে বাস করতে পারবে।

২। হিন্দু ও শিখকে এ নিশ্চয়তা দানে সকল চেষ্টা করতে হবে যেন কোন একজন মুসলমানও জানমালের নিরাপত্তার অভাবে ভারত থেকে চলে না যায়।

৩। চলন্ত রেলগাড়িতে মুসলমানদের উপর যে হামলা করা হচ্ছে তা বন্ধ করতে হবে এবং যে সকল হিন্দু ও শিখ হামলা চালাচ্ছে তাদেরকে অচিরেই বিরত রাখতে হবে।

৪। যেসব মুসলমান নিজামুদ্দীন আউলিয়া, খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী এবং নাসিরুদ্দীন চেরাগ দেহলীর দরগার আশে পাশে বসবাস করতো তাঁরা বাতিঘর ছেড়ে চলে গেছেন, তাঁদেরকে তাদের বস্তীসমূহে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসিত করতে হবে।

৫। কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর দরগাহ ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। অবশ্যি সরকার এসব মেরামত করে দিতে পারে। কিন্তু হিন্দু এবং শিখদেরকেই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এ কাজ করতে হবে।

৬। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো এই যে মনের পরিবর্তন দরকার। শর্তগুলো পূরণ অপেক্ষা এর গুরুত্ব অধিক। হিন্দু ও শিখ নেতাদেরকে এ নিশ্চয়তা দিতে হবে যাতে এ কারণে আর অনশন করতে না হয়। অতঃপর গান্ধীজি বলেন— এটা আমার শেষ অনশন হোক। (Abul Kalam Azad : India Wins Freedom, p. 238)।

মাওলানা আজাদ বলেন ঃ

দেশ বিভাগের পর পরিস্থিতি চরমে পৌঁছে। এক শ্রেণীর হিন্দু হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবা সংঘের নেতৃত্বে প্রকাশ্যে বলা শুরু করে যে গান্ধীজি হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করছেন। · · · এ বিষয়ে প্রচার পত্রও বিতরণ করা হয়। একটি প্রচার পত্রে বলা হয়, গান্ধীজি যদি তাঁর নীতি পরিবর্তন না করেন, তাহলে তাঁকে হত্যা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। (Abul Kalam Azad : India Wins Freedom, pp. 240-41)।

অবশেষে গান্ধীকে ৩০শে জানুয়ারী ১৯৪৮ জীবন দিতে হলো। মাওলানা আজাদ বলেন, আমি পুনরায় বিড়লা হাউসে গেলাম এবং ফটক বন্ধ দেখে অবাক হলাম। হাজার হাজার লোক ভিড় করে আছে দেখলাম। আমি বুঝলাম ব্যাপার কি। গাড়ি থেকে নেমে তাঁর ঘরের দরজা পর্যন্ত হেঁটে গেলাম। ঘরের দরজাও ভেতর থেকে বন্ধ দেখলাম। একজন কাঁচের জানালা দিয়ে আমাকে দেখে ভেতরে নিয়ে গেলেন। একজন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বল্লেন, গান্ধীজি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। দেখলাম তিনি মেঝের উপর শায়িত। চেহারা বিবর্ণ, চক্ষু বন্ধ তাঁর দুই পৌত্র তাঁর পা ধরে কাঁদছে। আমি স্বপ্নের মতো শুনলাম গান্ধীজি মৃত। (Abul Kalam Azad : India Wins Freedom, pp. 141-42)।

দেশ বিভাগের পর কয়েক যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে লক্ষাধিক মুসলিম স্বাধীন ভারতে নিহত, তাদের বহু মসজিদ ও ধর্মীয় স্থান ধ্বংস করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে কাউকে অনশন করতে দেখা যায়নি। তবে কেউ এ সাহস করলে তাঁকে গান্ধীজির ভাগ্যই বরণ করতে হতো। স্বাধীন ভারতে মুসলমানদের সপক্ষে কথা বলাকে বিরাট অপরাধ মনে করা হয়। হত্যাকান্ডে শতসহস্র মুসলমান নরনারী ও শিশু নিহত হয়, তাদের দোকানপাট, বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং ধনসম্পদ লুণ্ঠন করা হয়। কিন্তু হত্যাকারী খুঁজে বের করে তাদের শাস্তির কোন ব্যবস্থা সরকার করেন না, বা করতে পারেন না। ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংস করার পর অপরাধীদের শাস্তি দেয়া ত দূরের কথা, তাদের হাতেই ভারত সরকারকে জিম্মী হয়ে থাকতে হয়েছে। এসব যে হবে তা নিশ্চিত বুঝতে পেরেই মুসলমানদের পৃথক ও স্বাধীন আবাসভূমির দাবী করতে হয়। বস্তুতঃ হিন্দুজাতি ও নেতৃবৃন্দের চরম মুসলিম বিদ্বেষই পাকিস্তানের জন্ম দিয়েছে।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

উপসংহার

এ ইতিহাসের শেষ ভাগে সংক্ষেপে পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাসও লিখতে হয়েছে। কারণ এ আন্দোলনের সাথে বাংলার মুসলমান ওতপ্রোত সম্পৃক্ত ছিলেন। তদুপরি ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব তথা পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করার মর্যাদা লাভ করেন অবিভক্ত বাংলার মুসলিম দরদী কৃতি সন্তান ও বাংলার প্রধানমন্ত্রী মওলভী আবুল কাসেম ফজলুল হক (শেরে বাংলা)। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্বে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ থাকলেও এ আন্দোলনে বাংলার মুসলমানদের অবদান ছিল সর্বাধিক।

উনিশ শ' পাঁচ সালের ২০শে জুলাই বংগবিভাগের ঘোষণা এবং ১৬ই অক্টোবর থেকে তা কার্যকর করণ বাংলা এবং সমগ্র ভারতের হিন্দুজাতিকে অতিশয় ক্ষিপ্ত করে তোলে এবং বংগভংগ রদের তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে এক নবচেতনার জোয়ার সৃষ্টি করে এবং তাদের মধ্যে স্বতন্ত্র মুসলিম জাতিসত্তার প্রেরণা জাগ্রত করে। এর ফলে ১৯০৬ সালে ঢাকায় উপমহাদেশের মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগের জন্ম হয়। এ সালের ১লা অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে ৩৬ জন মুসলমানের একটি প্রতিনিধি দল শিমলায় বড়োলাটের সাথে সাক্ষাৎ ক'রে— মুসলমানগণ একটি স্বতন্ত্র জাতি বিধায় তাদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রচলনের দাবী জানালে তা মেনে নেয়া হয়। ১৯০৯ সালে সম্পাদিত মর্লে'মিন্টু রিফরমসে পৃথক নির্বাচন প্রথার প্রতি স্বীকৃতি দান করা হয়। ফলে এ এক সাংবিধানিক ডকুমেন্টে পরিণত হয়।

দেশ বিভাগের পর কোন কোন মহল থেকে এ প্রশ্ন উথাপিত হয় যে, পাকিস্তান দাবীর পশ্চাতে কি শুধু সাময়িক ভাবাবেগ সক্রিয় ছিল, না এর কারণ ছিল শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। অথবা হিন্দু কংগ্রেসের বৈরিসুলভ আচরণের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মুসলমানগণ পাকিস্তান দাবী করেন?

এর কোন একটিও পাকিস্তান আন্দোলনের মূল কারণ ছিলনা। ভাবাবেগ ত অবশ্যই ছিল। এ ভাবাবেগই মানুষকে লক্ষ্যে পৌছার জন্য জীবন বিলিয়ে দিতে

উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু এ ভাবাবেগ কোন সাময়িক ও অর্থহীন ভাবাবেগ ছিলনা। নিছক ভাবাবেগ এতোবড়ো ঐতিহাসিক বিপ্লব ঘটাতে পারেনা। গান্ধী, অনেক হিন্দুনেতা ও পত্রপত্রিকা এ ধরনের মন্তব্য করেছেন যে মুসলমানদের এ সাময়িক ভাবাবেগ প্রশমিত হলে পুনরায় তারা অখন্ড ভারতভুক্ত হয়ে যাবেন। চার যুগের অধিক কাল অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন পাকিস্তানকামী মুসলমানদের ভাবাবেগ কণামাত্র প্রশমিত হয়নি, তখন একথা সত্য যে তাদের ভাবাবেগ কোন সাময়িক বস্তু ছিলনা। এ ভাবাবেগ সৃষ্টির পেছনে একটা মহৎ উদ্দেশ্য ছিল।

যে মহান উদ্দেশ্যে পাকিস্তান দাবী ও আন্দোলন করা হয়, কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ মার্চ ১৯৪০ এ অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন ঃ

It is extremely difficult why our Hidnu friends fail to understand the real nature of Islam and Hinduism. They are not religious in strict sense of the word, but are, in fact, different and distinct social orders. It is a dream that the Hindus and Muslims can ever evolve a common nationality, and this misconception of one Indian nation has gone far beyond the limits, and will lead India to destruction, if we fail to revise our nations in time. The Hindus and Muslims belong to two different religious philosophies, social customs and literature. They neither intermarry nor interdine together, and indeed they belong to two different civilizations, which are based mainly on conflicting ideas and conceptions. Their aspect on life and of life are different. It is quite clear that Hindus and Mussalmans derive their aspirations from different sources of history. They have different epics, their heroes are different and they have different episodes. Very often the hero of one is a foe of the other and like wise their victories and defeats overlap. To yoke together two such nations under a singh state, one as a numerical minority and the other as a majority, must lead to growing discontent and the

final destruction of any fabric that may be built up for the government of such a state —(Ideological Foundations of Pakistan by Dr. Waheed Quraishy, pp. 96-97)।

কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর ভাষণে এ সত্যটিই তুলে ধরেছেন যে, হিন্দু ও মুসলমান বহু দিক দিয়ে দুটি পৃথক ও স্বতন্ত্র জাতি এবং তাদেরকে একত্রে বেঁধে দিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন অসম্ভব ও অবাস্তব। এ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতেই ভারত বিভক্ত হয়েছে।

কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ও বিপরীতমুখী জাতিসত্তা—এ তত্ত্ব কি জিন্নাহ বা মুসলমানদের কোন নতুন আবিষ্কার? এর সঠিক জবাবের উপরই এ কথা নির্ভর করবে যে পাকিস্তান কোন্ ভাবাবেগ ও উত্তেজনা বশে অথবা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে দাবী করা হয়েছিল।

ইসলামী জীবনব্যবস্থা

উপরোক্ত প্রশ্নের সঠিক জবাব পেতে হলে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের প্রয়োজন। আল্লাহতায়ালা ও তাঁর নবী-রসূলগণ ইসলামের যে সঠিক ধারণা পেশ করেছেন, তা এই যে, ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় শুধুমাত্র কতিপয় আচার অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়। ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর নাযিল করা মহাগ্রন্থ আল্ কুরআন এবং নবী মুহাম্মদ (সা) এর সুন্নাতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পূর্ণাংগ জীবন বিধান।

ধর্ম সম্পর্কে যে ধারণা বর্তমানকালে দুনিয়ায় প্রচলিত সেদিক দিয়ে ইসলাম একটি ধর্ম থেকে অনেক বেশী কিছু। এ নিছক স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যে সম্পর্কের নাম নয়। ইসলামের ধর্মীয় ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। ঈমান আকীদাহ থেকে শুরু করে এবাদত এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগের উপর এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতি আছে, ইতিহাস ঐতিহ্য আছে, নিজস্ব নৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে। আছে আইন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, পারিবারিক ও শিক্ষাব্যবস্থা, আছে নিজস্ব যুদ্ধ ও সন্ধিনীতি এবং বৈদেশিক ব্যবস্থা। একটি বৃক্ষের মূল, শাখাপ্রশাখা, পত্র পল্লব ও ফুলফলের মধ্যে যেমন অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক, তেমনি এসব ব্যবস্থাও পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ও ওতপ্রোত জড়িত।

প্রকৃত পক্ষে ইসলাম মানব জাতির জন্যে দুনিয়ায় সার্থক জীবন যাপন করার এক পূর্ণাংগ জীবন বিধান। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে সার্থক জীবনযাপনের পদ্ধতি ইসলাম শিক্ষা দেয়। এ কারণে ইসলামের ধর্মীয় ধারণা অন্যান্য ধর্মের ধারণা থেকে একেবারে পৃথক।

ইসলামের ঐতিহাসিক ধারণা অনুযায়ী এ সত্য দ্বীন (ইসলাম) সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ) এর উপর আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে নাযিল হয়। আর হযরত আদম (আ) ছিলেন প্রথম মানুষ। তাঁর থেকেই মানব বংশ দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন থেকেই এ দ্বীনে হক—ইসলাম দুনিয়ায় প্রচলিত। তাঁর পর যুগে যুগে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে নবী-রসূল আগমন করে দ্বীনে হকের দাওয়াত পেশ করতে থাকেন। সর্বশেষে নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) দ্বারা ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করে।

ইসলামে জাতীয়তার ধারণা

এ দ্বীন ও ব্যবস্থাকে যারা মনেপ্রাণে মেনে নেয় তাদেরকে 'মুমেন' বলা হয়, আর যারা একে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে 'কাফের' বলা হয়। মুমেন ও কাফের উভয়ে কখনো এক হতে পারেনা। প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হযরত আদম (আ) কে দুনিয়ায় পাঠাবার সময় আল্লাহতায়ালা যে নির্দেশ দেন তা এই ঃ

"আমি বল্লাম, তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। তারপর আমার নিকট থেকে যে জীবন বিধান তোমাদের নিকট পৌঁছাবে, যারা আমার সে বিধান মেনে চলবে তাদের জন্যে চিন্তাভাবনার কোন কারণ থাকবেনা। আর যারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে এবং আমার বাণী ও আদেশ-নিষেধ প্রত্যাখ্যান করবে তারা হবে নিশ্চিতরূপে জাহান্নামী এবং সেখানে তারা থাকবে চিরকাল (সূরা বাকারাহ্ ঃ ৩৮-৩৯)।

কুরআন পাকের উপরোক্ত আয়াত থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, হেদায়েতে ইলাহী মানুষকে দুটি দলে বা দুটি জাতিতে বিভক্ত করে দিয়েছে—একটি মুমেন, অন্যটি কাফের। এ বিভক্তি দুনিয়ায় মানব জীবনের প্রথম দিনেই করে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক নবী তাঁর যুগে এ বিভক্তি অক্ষুণ্ন রাখেন। হযরত শুয়াইব (আ) এ দুটি দলকে দুটি পৃথক পৃথক মিল্লাত বা জাতি বলে ব্যাখ্যা করেন। যেমনঃ

'তাদের সরদার মাতব্বরগণ যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের গর্বে গর্বিত ছিল তাকে বল্লো, হে শুয়াইব! আমরা তোমাকে ও তোমার প্রতি ঈমানদার লোকদেরকে এ জনপদ থেকে বের করে দেব—অন্যথায় তোমাদেরকে আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসতে হবে। শুয়াইব জবাব দিল, আমাদেরকে কি জোর করে ফিরিয়ে আনাহবে—আমরা যদি রাজী নাও হই?

আমরা খোদার প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হবো যদি তোমাদের মিল্লাতে ফিরে আসি যখন আল্লাহ এর থেকে আমাদেরকে মুক্তি দান করেছেন।'

—(সূরা আ'রাফ : ৮৯–৮৯)

এ আয়াত থেকেও এ কথা সুস্পষ্ট যে, হযরত শুয়াইব (আ) এর যুগেও মুসলমানদের মিল্লাত পৃথক ছিল এবং কাফেরদের মিল্লাত পৃথক। এই বিভক্তিকরণ এবং এই পরিভাষা উম্মতে মুহাম্মদীতেও প্রচলিত আছে এবং আজ পর্যন্ত তা ব্যবহৃত হচ্ছে।

ইসলামে জাতীয়তার ধারণা বিশ্বজনীন। যে কোন দেশ ও জাতির কোন ব্যক্তি কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করার পর দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করে এবং ইসলামী জাতীয়তার সমান অংশীদার হয়ে যায়। ইসলামে ঈমান আকীদার প্রতি স্বীকৃতিই জাতীয়তা অর্জনের জন্য যথেষ্ট। জাতীয়তা লাভের ব্যাপারে দুনিয়ার অন্যান্য জাতির পন্থাপদ্ধতি থেকে ইসলামের পন্থাপদ্ধতি ভিন্নতর। ইহুদী জাতীয়তা লাভের জন্য ইহুদী আকীদার সাথে ইহুদী বংশোদ্ভূত হওয়া জরুরী। হিন্দু জাতীয়তা লাভের জন্য হিন্দু পূজাঅর্চনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণই যথেষ্ট।

স্বাধীন সমাজ ব্যবস্থা

ইসলামের সর্বব্যাপী জীবন বিধান ও স্বতন্ত্র জাতীয়তার যুক্তিসংগত দাবী এই যে, এর জন্য একটা স্বাধীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হতে হবে—যেখানে ইসলামের আদেশ নিষেধগুলো মেনে চলা যাবে। কিন্তু পরাধীনতার জীবনযাপন করতে হলে সেখানে অধিকাংশ হুকুম পালন সম্ভব নয়।

তের বছর মক্কায় মুশরিকদের নিয়ন্ত্রিত সমাজে জীবনযাপন করার পর নবী আকরাম (সা) যখন মদীনার অনুকূল পরিবেশে পৌঁছেন, তখন সেখানে তিনি

ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্র কায়েম করেন। তিনি ছিলেন এ রাষ্ট্রের পরিচালক। সেখানে তিনি পরিপূর্ণ রূপে ইসলামী বিধান জারী করেন। তারপর আল্লাহতায়ালা নিম্নের আয়াত নাযিল করেন ঃ

'তোমাদের জন্যে দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম।'

দ্বীন তার পরিপূর্ণতা লাভ করলো তখন যখন তার পরিপূর্ণতা, বাস্তবায়ন ও প্রচার প্রসারের জন্য একটা পৃথক আবাসভূমি পাওয়া গেল এবং একটা স্বাধীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলো।

'পাকিস্তান' শব্দটি কোন ভৌগলিক অঞ্চল অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, এ ব্যবহৃত হয়েছে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র অর্থে। এই অর্থেই আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রকে 'প্রথম পাকিস্তান' বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন ঃ

আল্লাহতায়ালা কুদরাতের হস্ত অবশেষে রসূল মকবুল (সা) এর ঐতিহাসিক হিজরতের মাধ্যমে মদীনায় এক ধরনের 'পাকিস্তান' কায়েম করে দেয়।

(খুৎবাতে ওসমানী, আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী, পৃঃ ১৪০; তারিখে নযরিয়ায়ে পাকিস্তান, অধ্যাপক মুহাম্মদ সালিম, পৃ: ৩১)।

লাহোর প্রস্তাবে যে একটি স্বাধীন আবাসভূমির দাবী করা হয়েছিল তার নাম পাকিস্তান বলা হয়নি। এ নামটি চৌধুরী রহমত আলী পছন্দ করেন। তিনি সর্বপ্রথম ১৯১৫ সালে 'বজমে শিবলী' অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন—উত্তর ভারত 'মুসলিম' এবং একে আমরা 'মুসলিম' রাখব। শুধু তাই নয়। একে আমরা একটি মুসলিম রাষ্ট্র বানাবো। এ আমরা তখনই করতে পারব যখন আমরা এবং আমাদের এ উত্তরাঞ্চল ভারতীয় হওয়া থেকে বিরত থাকব। এ হচ্ছে তার পূর্বশর্ত। যতো শীগগির আমরা ভারতীয়তাবাদ পরিহার করব ততোই ভালো আমাদের এবং ইসলামের জন্য (Choudhury Rahmat Ali : p. 172; I. H. Qureshi : The Struggle for Pakistan, pp. 115-116)।

চৌধুরী রহমত আলীও প্রথমে পাকিস্তান নাম ব্যবহার করেননি। তিনি মুসলিম বা ইসলামী রাষ্ট্রের কথাই বলেছেন।

ইতিহাস আলোচনা করলে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে, পাকিস্তান আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল হিজরী ৯৩, রজব মাসে (৭১২ খৃঃ) যখন ইমাদুদ্দীন

মুহাম্মদ বিন কাসিম, সতেরো বছরের সিপাহসালার দেবল বন্দরে (বর্তমান করাচী) অবতরণ করেন, রাজা দাহিরের কারাগার থেকে মজলুম মুসলমান নারীশিশুদের মুক্ত করেন এবং সেখানে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। কায়েদে আজম বলেন, পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হয় তখন, যখন প্রথম মুসলমান সিন্ধুর মাটিতে পদার্পণ করেন যা ছিল ভারতে ইসলামের প্রবেশদ্বার।

দেবলের পর নিরন (বর্তমান হায়দরাবাদ) এবং তারপর সেহওয়ান ইসলামী পতাকার কাছে মাথানত করে। ১০ই রমজান রাওর দুর্গ দখল করা হয় এবং যুদ্ধে রাজা দাহির পরাজিত ও নিহত হন। পরে ব্রাহ্মণাবাদ (বর্তমান সংঘর) এবং আলাওয়ার বিজিত হয়। ৯৬ হিজরী সনে মুলতান আত্মসমর্পণ করে এবং উত্তর ভারত স্বেচ্ছায় মুহাম্মদ বিন কাসিমের বশ্যতা স্বীকারে প্রস্তুত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মুহাম্মদ বিন কাসিমকে দামেশ্‌কে ডেকে পাঠানো হয়। তিনি তাঁর অধীন অঞ্চলগুলোতে সত্যিকার ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। এ ব্যবস্থা হিন্দু এবং বৌদ্ধদেরকে এতোটা মুগ্ধ করে যে, তাদের বিরাট সংখ্যক লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে (Justice Syed Shameem Husain Kadri : Creation of Pakistan, pp. 1-2)।

ইসলামের সহজাত বৈশিষ্ট্য

ইসলামের সহজাত বৈশিষ্ট্য এই যে মুসলমান এক ও লা শারীক আল্লাহ ব্যতীত আর কারো বশ্যতা, প্রভুত্ব কর্তৃত্ব, আইন শাসন মানতে পারেনা। ইসলাম একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান এবং এর মূলনীতি মানব জীবনের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক দিক পরিবেষ্টন করে রাখে। রাষ্ট্র ও ধর্মকে একে অপর থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কালেমায়ে তাইয়েবার মাধ্যমে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও রসূলের (সা) নেতৃত্ব মেনে নেয়া হয়েছে।

উপমহাদেশে ইসলামী আইন–শাসন প্রতিষ্ঠা

মুহাম্মদ বিন কাসিম শুধু এ উপমহাদেশে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না। বরঞ্চ তিনি ছিলেন ইসলামী সভ্যতা–সংস্কৃতির অগ্রদূত। যে সভ্যতা–সংস্কৃতির বৃক্ষ তিনি রোপণ করেন তা কালক্রমে বর্ধিত ও বিকশিত হতে থাকে এবং সমগ্র ভারত উপমহাদেশে ইসলামী পতাকা উড্ডীয়মান হয়। মুসলমান

বিজয়ীর বেশে ভারতে আগমন করতে থাকেন। তাঁদের সাথে আসেন সৈনিক, কবি, সাহিত্যিক, আধ্যাত্মিক নেতা, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী। এসব শাসকদের মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনে অনেকেই ভালো মুসলমান ছিলেন না, এবং অনেক দরবেশ প্রকৃতির লোকও ছিলেন। তবে মুসলিম শাসন আমলে আগাগোড়া দেশে ইসলামী আইন প্রচলিত ছিল।

কিন্তু মুসলিম শাসনের অবসানের পর ইসলামী আইনের স্থলে প্রবর্তিত হলো পাশ্চাত্যের মানব রচিত আইন; ইন্ডিয়ান সিভিল এন্ড্ ক্রিমিনাল কোড্‌স্ অব্ প্রসিজিয়র এবং ইন্ডিয়ান পেনাল কোড্ প্রবর্তন করা হলো। এভাবে মুসলমানগণ শুধু রাজ্যহারাই হলেননা, ইসলামী তথা আল্লাহর আইনের পরিবর্তে তাদের উপর কুফরী আইন চাপিয়ে দেয়া হলো। কিভাবে তাদের জীবন জীবিকার সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হলো, তাদের বহু লাখেরাজ ভূসম্পদ কেড়ে নেয়া হলো, তাদেরকে পথের ভিখারীতে পরিণত করা হলো—এ গ্রন্থে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

রেডিও পাকিস্তানের সাথে এক সাক্ষাৎকারে মাওলানা মওদূদী পাকিস্তানের আদর্শিক পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

যদি আমাদের আলোচনাকে 'পাকিস্তান আন্দোলন' শব্দগুলো এবং পরিভাষা পর্যন্ত সীমিত রেখে কথা বলি, তাহলে এ বিষয়টির প্রতি মোটেই সুবিচার করা হবেনা। কারণ একটা জিনিস হলো পাকিস্তানের শব্দ ও পরিভাষা এবং অন্যটি হলো এমন এক উদ্দেশ্য যা এ উপমহাদেশের মুসলমানদের সামনে সুদীর্ঘ কাল থেকে ছিল এবং মুসলমানগণ অবশেষে তাকে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিল যাতে তারা এ পরিভাষার সাথে একটা দেশও লাভ করার সংগ্রাম করতে পারে। এ লক্ষ্য তখনই ভারতীয় মুসলমানদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যখন এ উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের পতন ঘটে। তারা তখন অনুভব করেছিল যে, যেহেতু তারা জগত এবং জীবন সম্পর্কে এক বিশেষ দৃষ্টিভংগি পোষণ করে এবং তারা একটা বিশেষ সভ্যতার অনুসারী, সেজন্য নিজেদের জাতীয় সত্তা তারা তখনই অক্ষুণ্ন রাখতে পারে, যখন শাসন ক্ষমতা তাদের হাতে থাকবে। শাসন ক্ষমতা অমুসলমানদের হাতে চলে গেলে তারা এ দেশে মুসলমানের জীবন যাপন করতে পারবেনা এবং মুসলমান হিসাবে তাদের কোন জীবনই থাকবে না। এ অনুভূতি ভারতে মুসলিম শাসনের পতনের পরই তাদের মধ্যেই সৃষ্টি হতে থাকে। আর এ

অনুভূতি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।

কখনো এ অনুভূতি এভাবে আত্মপ্রকাশ করে যে, হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভী এবং হযরত শাহ ইসমাইল শহীদ এক জিহাদী আন্দোলন নিয়ে আবির্ভূত হন। তাঁরা ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের জন্য নিজেদের জীবন অকাতরে বিলিয়ে দেন। এ অনুভূতি আবার কখনো এ রূপ ধারণ করে যে, স্থানে স্থানে দ্বীনী মাদ্রাসা কায়েম করা হয় যাতে মুসলমানগণ তাদের দ্বীন ভুলে গিয়ে ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত খোদাহীন সভ্যতা এবং ধর্মহীন চিন্তাধারা ও মতবাদের প্রবল প্লাবনে ভেসে না যায়।

তারপর দ্বিতীয় পর্যায় এভাবে শুরু হয় যে, ইংরেজ শাসন এখানে পাকাপোক্ত হয়ে পড়ে এবং এদেশে ক্রমশঃ ঐ ধরনের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কাজ তারা শুরু করে, যে ধরনে তাদের আপন দেশে শাসন ব্যবস্থা চলছিল। তাদের জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের ধারণা ছিল এই যে, ইংলন্ডের সকল অধিবাসী এক জাতি এবং তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সরকার গঠনের অধিকার স্বীকৃত। এ গণতান্ত্রিক মূলনীতি ইংরেজরা ভারতেও চালু করতে চায়। তাদের মতে ভারতের সকল অধিবাসীও এক জাতি এবং তাদের মধ্যেও সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসননীতি চলতে পারে। এটাই মুসলমানদের মধ্যে এ অনুভূতির সঞ্চার করে যে, যদি এখানে সংখ্যাগুরু দলের সরকার কায়েম হয় তাহলে এখানে মুসলমানদেরকে চিরদিন সংখ্যালঘু হয়ে থাকতে হবে এবং তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জাতীয় সত্তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কারণ সে সরকারের অধীনে মুসলমানগণ তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন আইন রচনা করতে পারবেনা। সরকারের ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে তাদের কোন অধিকার থাকবেনা। অন্য কথায়, মুসলমানগণ তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জীবন দর্শন বাস্তবায়িত করতে পারবেনা। বরঞ্চ একটা অনৈসলামী সভ্যতা ও জীবনদর্শন তাদের উপর বলপূর্বক চাপিয়ে দেয়া হবে।

মাওলানা বলেন, এ ছিল সেই অবস্থা যা ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এক প্রশ্ন বা চ্যালেঞ্জের রূপ নিয়ে মুসলমানদের সামনে দেখা দেয়। এর জবাব পেতে মুসলমানদের সুদীর্ঘ সময় কেটে যায়। সুদীর্ঘকাল ধরে তারা এ কঠিন প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করতে থাকে যে, এমন এক শাসন ব্যবস্থায় যেখানে ভারতের অধিবাসীদেরকে এক জাতি ধরে নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার গঠন

পদ্ধতি চালু করা হবে, সেখানে সংখ্যালঘু হিসাবে মুসলমানদের জন্য রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার কি রূপ হতে পারে। এ নিরাপত্তা লাভের ধরন এবং তা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের মূল্যায়ন করা হয়। এক পর্যায়ে এ উদ্দেশ্যে পৃথক নির্বাচন প্রথার দাবী করা হয় (শিমলা প্রতিনিধি, ১৯০৬)। তারপর তার ভিত্তিতে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতা হয় (লাখনো চুক্তি, ১৯১৬)। পরবর্তীকালেও বিভিন্ন প্রস্তাবাদি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হয়। ক্রমশঃ মুসলমানগণ বুঝতে পারে যে, এ ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন আইনগত নিরাপত্তা তাদের কোনই কাজে আসবে না। এ কথা তারা স্পষ্ট অনুভব করলো তখন, যখন ১৯৩৭ সালে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে কংগ্রেসের শাসন কায়েম হয়। সে সময়ে মুসলমানদের এ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয় যে, এ উপমহাদেশে সংখ্যাগুরু দলের সরকার হওয়া এবং তাদের অধীনে মুসলমানদের সংখ্যালঘু হিসাবে বসবাস করার অর্থ এই যে, ক্রমশঃ তাদের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দেয়া। এ অভিজ্ঞতা লাভের পর মুসলমানগণ এভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করেন যে, এখন পর্যন্ত এ সমস্যাটির যেদিক দিয়ে সমাধান করার চেষ্টা চলে আসছিল তা অর্থহীন ও অবাস্তব।

মাওলানা বলেন, সে সময়ে মুসলমানদেরকে বার বার এ নিশ্চয়তা দেয়া হচ্ছিল যে ভারতের মুসলিম-অমুসলিম মিলে এক জাতি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তারা কোন দিন এক জাতি ছিল না এবং হতেও পারেনা। মুসলমান যখন থেকে এ দেশে এসে বসবাস করতে থাকে তখন থেকে তাঁরা অমুসলিমদের সাথে কখনো এক জাতি হিসাবে বসবাস করেনি। ... এক জাতি হলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এ ছুতমার্গ ব্যাধি কোথা থেকে এলো? তাদের জাতীয় নায়ক (National heroes) আলাদা আলাদা কেন? তাদের অনুপ্রেরণা ও আবেগ অনুভূতির উৎস বিভিন্ন কেন? এক জাতি হলে হিন্দুদের থেকে পৃথক জাতি হয়ে তারা কি করে বাস করতে পারতো? অতএব এ এক পরম সত্য যে, তারা এক জাতি কখনো ছিল না এবং কোন সময়ের জন্য হতেও পারেনা। এখন একটা অবাস্তব কল্পনা (Hypothesis) বলপূর্বক মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলে। এ যে কার্যকর ও ফলদায়ক হতে পারেনা তা কংগ্রেসের কয়েকটি প্রদেশে সরকার কায়েম হওয়ার পর (১৯৩৭-৩৯) দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে গেল। যারা হিন্দু মুসলমান মিলে এক জাতির ঘোষণা দিচ্ছিল তারা স্বয়ং

তাদের কার্যকলাপ দ্বারা একথা প্রমাণ করলো যে, হিন্দু মুসলিম এক জাতি নয়। বরঞ্চ এ ছিল একটা বিরাট রাজনৈতিক প্রতারণা যার দ্বারা তারা মুসলমানদেরকে এক গোলাম জাতিতে পরিণত করে রাখতে চেয়েছিল।

মাওলানা বলেন ঃ

এ ছিল এমন এক সময় যখন আমি ১৯৩৭ সালে আমার সে প্রবন্ধগুলো লেখা শুরু করি যার দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে এ অনুভূতির সঞ্চার করি যে, আপনারা একটি অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অধীনে থেকে ··· নিজের জাতীয় অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন না। ··· তখন আমি গভীরভাবে অনুভব করলাম যে, কোন প্রকার আইনানুগ নিশ্চয়তা দান মুসলমানদেরকে বাঁচাতে পারবেনা। এ জন্যে এ ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, এ উপমহাদেশে মুসলমানদের নিরাপত্তার অন্য উপায় চিন্তা করতে হবে। আমার নিকটে বিকল্প পন্থা এই ছিল এবং তা আমি সুস্পষ্ট করে পেশ করলাম যে, সর্বপ্রথম মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় স্বাতন্ত্রবোধ পরিপূর্ণরূপে জাগ্রত করা হোক যার দ্বারা তারা তাদের আপন পরিচয় জানতে পারবে। তারা জানতে পারবে তাদের জীবনের মূলনীতি কি, তারা কিভাবে অন্য জাতি থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র জাতি বরঞ্চ এক মিল্লাত এবং তাদের এ জাতীয় স্বাতন্ত্রবোধ জাগ্রত রাখার পন্থা কি। সে সময়ে পাকিস্তান আন্দোলনের সূচনাও হয়নি। সে সময়ে সর্বপ্রথম করার কাজ এই ছিল যে, যেমন আমি বলেছি, মুসলমানদেরকে সেই এক জাতীয়তার বেড়াজাল থেকে কি করে বাঁচানো যায় যা তাদের চারদিকে ছড়ানো হচ্ছিল।*

মাওলানা আরও বলেন, যখন মুসলমানদের মধ্যে পৃথক জাতীয়তার ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে, তাদের মধ্যে এ প্রয়োজনের অনুভূতিও বাড়তে থাকে যে, যেসব অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগুরু সেসব অঞ্চল নিয়ে মুসলমানদের একটা পৃথক রাষ্ট্র কায়েম করা হোক। এভাবে পাকিস্তান আন্দোলন এক রীতিমত ও সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে। এ পরিস্থিতিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দেয়। এক এই যে, যেসব অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগুরু তাদের একটি অপরটি থেকে বহুদূরে অবস্থিত। কোন্ বস্তু তাদেরকে একত্রে আবদ্ধ রাখতে পারে? তার সহজ জবাব এই যে, এ বস্তু ইসলাম ছাড়া আর কিছু নয় এবং হতেও পারেনা। দ্বিতীয় প্রশ্ন

* মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয়তা প্রমাণ করে মাওলানা 'মাসয়ালায়ে কাওমিয়াত' নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তার ফলে মুসলমানদের মধ্যে পৃথক জাতীয়তার ধারণা বদ্ধমূল হয়।

এই ছিল যে, ভারতের বৃহৎ অংশে মুসলমান সংখ্যালঘু। যদি গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম হয় তাহলে অনিবার্যরূপে সেখানে মুসলমানদেরকে সংখ্যাগুরুর গোলামি বরণ করতে হবে। এ অবস্থায় তাদের নিরাপত্তার কি উপায় হবে? এ প্রশ্নের কোন সুস্পষ্ট জবাব ছিল না। কিন্তু এর থেকে এ সত্য সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, শেষ পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানদেরকে যে ধ্যান–ধারণা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে তা কোন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবাবেগ ছিলনা। বরঞ্চ তা ছিল একটা নির্ভেজাল দ্বীনী আবেগ অনুরাগ। নতুবা মাদ্রাজ, বোম্বাই, সিপি, ইউ,পি প্রভৃতি অঞ্চলের মুসলমানদের পাকিস্তান হাসিলের জন্য সংগ্রাম করার কোনই কারণ থাকতে পারেনা। তারা কখনো এ আশা করতে পারেনি যে, তাদের এলাকা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রকৃত ঘটনা এই যে, পরবর্তীকালে যেসব অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো সেসব অঞ্চলে পাকিস্তান আন্দোলন এতোটা জোরদার হয়নি যতোটা হয়েছে মুসলিম সংখ্যালঘু অঞ্চলগুলোতে। এর কারণ এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, একমাত্র ইসলামী আবেগ অনুভূতিই ছিল এ আন্দোলনের প্রেরণাদায়ক শক্তি। মুসলমানদের এ পূর্ণ অনুভূতি ছিল যে, তাদের পরিণাম যা কিছুই হোক না কেন, তাদের কুরবানী দ্বারা অন্ততঃপক্ষে ইসলামের নামে একটা রাষ্ট্র ত অস্তিত্ব লাভ করবে যেখানে ইসলামের বাণী সমুন্নত হবে এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বাস্তবে কায়েম হবে। এটাই ছিল সেই আবেগ অনুরাগ যা এ শ্লোগানে রূপায়িত হয়েছিল— "পাকিস্তানের উৎস কি– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।"

এ এমন এক শ্লোগান ছিল যা শুনে মুসলিম পতংগের মতো পাকিস্তান আন্দোলনের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর এমন বিরাট সংখ্যক লোক পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করে যে, বড়োজোর শতকরা দু'একজন মুসলমান মাত্র দ্বিমত পোষণ করে। আমার নিকটে পাকিস্তান আন্দোলনের দুটি মাত্র বুনিয়াদ ছিল। একটি এই যে, আমরা দুনিয়ার অন্য কোন জাতির অংশ নই, বরঞ্চ একটি স্বতন্ত্র জাতি। আর অন্য কোন জাতির সাথে মিলিত হয়ে কোন মিশ্র জাতীয়তাও বানাতে পারিনা। দ্বিতীয়তঃ আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি আমাদের দ্বীন। এ ছাড়া আমাদের জাতীয়তার অন্য কোন ভিত্তি নেই। আমার কাছে পাকিস্তান দর্শনের এই একমাত্র অর্থ।

—(একটি ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার। রেডিও পাকিস্তান এ সাক্ষাৎ টেপ করে এবং পাঁচ বছর পর ১৯৮০ সালে তা লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত হয়।)

এখন এ কথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে, নিছক কোন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে অথবা সাময়িক ভাবাবেগে পরিচালিত হয়ে পাকিস্তান আন্দোলন করা হয়নি। আন্দোলনের ভাবাবেগ ত অবশ্যই ছিল। কিন্তু সে ভাবাবেগের উৎস ছিল মুসলমানদের ঈমান ও আকীদাহ বিশ্বাস যার সূচনা হয়েছিল মানব জাতির সৃষ্টির সাথে সাথেই।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর দ্বিজাতিতত্ত্ব ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে বলে জোরেসোরে প্রচার করা হচ্ছে। প্রচারকগণ এতোটা কল্পনাবিলাসী যে, দ্বিজাতিতত্ত্ব ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে ধরে নিয়ে উপমহাদেশকে ১৯৪৭ পূর্ব ভৌগলিক অবস্থায় রূপান্তরিত করার আন্দোলন করছে।

একদিকে ভারতে ও কাশ্মীরে মুসলিম নিধনযজ্ঞ পূর্ণমাত্রায় চলছে, মসজিদ ধ্বংস করে মন্দির নির্মাণ করা হচ্ছে, অপরদিকে একজাতীয়তার মিথ্যা ও প্রতারণামূলক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। তবে অতীতেও যেমন তাদের এ ধরনের প্রচারণা কোন কাজে লাগেনি, ভবিষ্যতেও লাগবেনা।

বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, হিন্দুগণ উপমহাদেশে মুসলমানদের কয়েক শ' বছরের শাসনের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে তাদেরকে তাদের গোলাম বানিয়ে রেখে অথবা নির্মূল করে। তার জন্য ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে এভাবে যে মুসলিম শাসন আমলে হিন্দুদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে, তাদেরকে বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে, তাদের নারীজাতিকে অবাধে ভোগ করা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। হিন্দু সাহিত্যিকগণ তাঁদের সাহিত্যের মাধ্যমে মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার করে হিন্দুদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তুলেছেন। এ ব্যাপারে হিন্দুজাতি ও বৃটিশ সরকার একে অপরের পূর্ণ সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, হিন্দুদের সক্রিয় সাহায্য সহযোগিতা ব্যতীত এ দেশে যেমন ইংরেজদের মসনদ পাকাপোক্ত হতে পারতো না ঠিক তেমনি ইংরেজদের আশীর্বাদ ব্যতীত হিন্দুগণ মুসলমানদের প্রতি অমানবিক ও পৈশাচিক আচরণ করতে পারতো না। সর্বশেষে ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া

মুসলমানদেরকে অন্ধকারে রেখে যেভাবে তড়িঘড়ি প্রণয়ন করা হলো, পাঞ্জাব ও বাংলা বিভক্ত করে পাকিস্তানকে ক্ষুদ্রতর ও সংকুচিত করা হলো এবং যেভাবে সীমানা চিহ্নিতকরণে মুসলমানদের প্রতি চরম অবিচার করা হলো, এর দ্বারা হিন্দুদেরকে খুশী করে বৃটিশ সরকার মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের বহুদিনের পুঞ্জিভূত বিদ্বেষের প্রতিশোধ নিলেন। উপরন্তু পাকিস্তানের ন্যায্য প্রাপ্য গুরুদাসপুর জেলাকে হঠাৎ দুদিন পর ভারতভুক্ত করে দিয়ে কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে এক চিরন্তন দ্বন্দ্ব সংঘাতের বীজ বপন করা হলো। বিভক্ত বাংলার সীমানা নির্ধারণেও অনুরূপ অবিচার করা হয়েছে।

এ ইতিহাস এখানেই শেষ হচ্ছে। যে প্রেক্ষাপটে এবং যে দৃষ্টিকোণ থেকে এ ইতিহাস লেখা হয়েছে, আমার বিশ্বাস অধিকতর সুন্দর করে লেখার যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের অভাব সমাজে নেই। নতুন প্রজন্মকে তাদের অতীত ইতিহাসের সঠিক জ্ঞানদান করে মুসলিম জাতিসত্তার মধ্যে নতুন জীবনীশক্তি সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে—চিন্তাশীলগণ এগিয়ে আসবেন এ আবেদন রেখে আমার লেখার ইতি টানছি।

—o—

তথ্যসূত্র ঃ

১। মুসলিম বংগের সামাজিক ইতিহাস, মাওলানা আকরাম খাঁ।
২। তোহ্ফাতুল মুজাহেদীন, শেখ যয়নুদ্দিন।
৩। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক গেজেটিয়ার, চট্টগ্রাম। নীল কমিশন রিপোর্ট-১৮৬১।
৪। রিয়াযুস সালাতীন, গোলাম হোসেন সলিমী। তাবাকাতে নাসিরী।
৫। Hostory of Bengal , স্যার যদুনাথ সরকার।
৬। বাংলার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়।
৭। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশ চন্দ্র সেন।
৮। বাংলা সাহিত্যের কথা, মাওলানা আকরাম খাঁ।
৯। Husain Shahi Bengal, M.R. Tarafdar.
১০। British Policy and the Muslims in Bengal, A.R. Mallick.
১১। মহানির্বাণতন্ত্র, ৪র্থ ও ৫ম উল্লাস।
১২। সিরাজউদ্দৌলার পতন, ডঃ মোহর আলী।
১৩। Census of India Report, 1911 A.D., হিন্দের ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড।
১৪। মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, আবদুল মওদুদ।
১৫। Muslim Struggle for Freedom in India, Muinuddin Ahmad Khan.
১৬। Calcutta Review, 1850, 1913 এবং বিভিন্ন ইস্যু।
১৭। The Indian Mussalmans, W.W. Huter, Bangladesh Edition 1975.
১৮। The History, Antiquities, Topography & Statistics of Eastern India, M. Martin, London-1838, Vol.-II.
১৯। Calcutta Christian Observer, July 1832, November 1855.
২০। The Discovery of India, Pandit Jawaherlal Nehru.
২১। Oxford History of India.
২২। The Life of Charles Lord Metcalfe.
২৩। বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, রমেশচন্দ্র মজুমদার।
২৪। রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবার্ষিকী সংস্করণ।
২৫। The Great Divide, H.V. Hodson.
২৬। Survey of Indian History, কে এম পান্নিকর।
২৭। বড়বাবু, সৈয়দ মুজতবা আলী।
২৮। শতাব্দী পরিক্রমা, ডঃ হাসান জামান সম্পাদিত।
২৯। Bengali Muslim Public Opinion as reflected in the Bengali Press 1901-1930, Mustafa Nurul Islam.
৩০। রাজসিংহ; কপাল কুণ্ডলা; আনন্দমঠ, –বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৩১। বঙ্কিম রচনাবলী, ষষ্ঠ প্রকাশ, ১৩৮২। নবযুগের বাংলা, বিপিনচন্দ্র পাল।
৩২। মাসিক 'ইসলাম প্রচারক', জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩১৪।
৩৩। Times of India, July 1925, July & December 1938.
৩৪। সাপ্তাহিক 'সুলতান', রিয়াজুদ্দীন আহমদ ও মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সম্পাদিত, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা,(১৯২৩)
৩৫। Indian Sedition Committee Report 1918.
৩৬। The Indian Middle Class : Their Growth, B.B. Misra.
৩৭। Jinnah and Gandhi, S.K. Majumdar.
৩৮। Muslim Separatism in India, A. Hamid.
৩৯। 'মালাবারে স্বরাজ', সেক্রেটারি, মালাবার হিন্দু সহায়ক সভা কর্তৃক প্রকাশিত, অগ্রহায়ণ, ১৯২২' 'মালাবার কি খুনী সম্প্রদায়' পুস্তিকা।
৪০। Political India, Cumming.
৪১। শিক্ষাক্ষেত্রে বিচিত্রা, মুহম্মদ আইদ মুনেমী।
৪২। The Bengali Muslims & English Education, M. Fazlur Rahman.
৪৩। Appendix to Chahar Darvesh, L.F. Smith.
৪৪। Education in Muslim India, S.M. Jaffar, 1935.
৪৫। Promotion of Learning in India during Muhammadan Rule, N.N. Law
৪৬। Economic History of India, R.C. Dutt.
৪৭। On the Education of the People of India, C.E. Trevelyan.
৪৮। Review of Buchanan's Treaties, Sharp.
৪৯। Report of Bengal Provincial Committee, Education Commission.
৫০। Life of Mahatma Raja Rammohan Roy, N. Chatterjee.
৫১। Vernacular Education in Bengal, H.A. Stark.
৫২। Macaulay's Minutes on Education in India, Woodrow, 1862.
৫৩। Life and Leters of Lord Macaulay, Trevelyan, vol-I.
৫৪। Select Committee Report, House of Commons, 1831-32.
৫৫। An Advanced History of India, John Marshall.
৫৬। Board's Colection 909, এবং বিভিন্ন ইস্যু।
৫৭। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, সজনীকান্ত দাস।
৫৮। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রী শ্রী কুমার বন্দোপাধ্যায়।
৫৯। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, আবু জাফর।
৬০। Journal of Asiatic Society of Bengal, Dr. James Wise, vol-LXIII, 18
৬১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।
৬২। Encyclopaedia of Islam, vol-II.
৬৩। শহীদ তিতুমীর, আবদুল গফুর সিদ্দিকী।
৬৪। Bengal Criminal Judicial Consultations, 1832.
৬৫। Colvin's Report, J.R. Colvin.
৬৬। ওহাবী আন্দোলন, আবদুল মওদুদ।
৬৭। সাইয়েদ আহমদ শহীদ, গোলাম রসুল মেহের।
৬৮। তাওয়ারিখ–ই–আজীব, ('আন্দামান বন্দীর আত্মকাহিনী') মওলানা জাফর থানেশ্বরী।
৬৯। সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকা, আবদুল মওদুদ।
৭০। Modern Religious Movment in India, Farquhar.
৭১। আমাদের মুক্তিসংগ্রাম, মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ।
৭২। Some Personal Experience, Sir Fuller Bampfylde.
৭৩। Indian Politics Since the Mutiny, C.Y. Chintamoni.
৭৪। History of the Indian Mutiny, Col. J.B. Malleson.
৭৫। Partition of Bengal, A.R. Mallik.
৭৬। বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ডঃ এম, এ, রহিম।
৭৭। India of Today, Sardar Ali Khan, Bombay, 1908.
৭৮। Iqbal : Selected Writings and Speeches.
৭৯। বংগভংগের ইতিহাস, ইকবাল রাহমান।